প্রথম সংস্করণ

বৈশাখ ১৩৬১

প্রকাশক

দিলীপকুমার গুপ্ত

সিগনেট প্রেস

১০।২ এলগিন রোড

কলকাতা ২০

প্রচ্ছদপট

সত্যজিৎ রায়

মুদ্রক

প্রভাতচন্দ্র রায়

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিঃ

৫ চিন্তামণি দাস লেন

প্রচ্ছদপট মুদ্রক

গসেন এণ্ড কোম্পানি

৭।১ গ্রাণ্ট লেন

বাঁধিয়েছেন

বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

৬১।১ মির্জাপুর ষ্ট্রীট

সূচীপত্র

১

রামায়ণ .. ৯

মাইকেল .. ২৮

বাংলা শিশুসাহিত্য .. ৪৭

২

বাংলা ছন্দ .. ৮৫

রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক .. ১৩৫

রবীন্দ্র-জীবনী ও রবীন্দ্র-সমালোচনা ১৫২

৩

সাংবাদিকতা, ইতিহাস, সাহিত্য ১৬৭

শিল্পীর স্বাধীনতা .. ১৮৬

রামায়ণ

ছন্দের আনন্দ, কবিতার উন্মাদনা জীবনে প্রথম যে-বইতে আমি জেনেছিলাম, সেটি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'ছোট্ট রামায়ণ'। ছোট্ট, সচিত্র, বিচিত্র-মধুর, সে-বই ছিলো আমার প্রিয়তম সঙ্গী : যোগীন্দ্রনাথ সরকারের পদলালিত্যের আদর খেতুম, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের 'শিশু' পত্রিকার পাতাবাহারে চোখ জুড়োতো—কিন্তু এমন নেশা ধরতো না আর-কিছুতেই। বার-বার পড়তে-পড়তে সমস্ত বইখানা আমার রসনাগ্রে অবতীর্ণ হয়েছিলো,—কিন্তু শুধু পদাবলী আউড়িয়ে আমার তৃপ্তি নেই, রাম-লীলার অভিনয়ও করা চাই। বাঁশের তীর-ধনুক হাতে নিয়ে বাড়ির উঠোনের রঙ্গমঞ্চে আমার লম্ফঝম্প : আমিই রাম এবং আমিই লক্ষ্মণ, আর ঐ যে মাচার লাউ-কুমড়ো ফোঁটা-ফোঁটা শিশিরে সেজে আছে—ঐ হ'লো তাড়কা রাক্ষসী। সীতাকে না-হ'লেও তখন আমার চলতো, এমনকি, রাবণকে না-হ'লেও—কেননা রাম-লক্ষ্মণের বনবাসের অমন অপরূপ ফূর্তিটা মাটি হ'লো তো সীতা-রাবণের জন্যই। কী ভালো আমার লাগতো সে-সব নদী, বন, পাহাড়—পম্পা, পঞ্চবটী, চিত্রকূট—ছবির মতো এক-একটি নাম—ছবির মতো, গানের মতো, মন্ত্রের সম্মোহনের মতো উপেন্দ্রকিশোরের মুখবন্ধ :

> বাল্মীকির তপোবন তমসার তীরে,
> ছায়া তায় মধুময়, বায়ু বহে ধীরে।
> খড়ের কুটিরখানি গাছের ছায়ায়,
> চঞ্চল হরিণ খেলে তার আঙিনায়।
> রামায়ণ লিখিলেন সেথায় বসিয়া,
> সে বড়ো সুন্দর কথা, শোনো মন দিয়া।

'চঞ্চল'-এর যুক্তবর্ণ নিয়ে আমার রসনা সুখাদ্যের মতো খেলা করতো, তার অনুপ্রাসের অনুরণনে বুক কাঁপতো আমার। যোগীন্দ্র সরকার পদ্য

পড়িয়েছিলেন অনেক, কিন্তু কবিতার জাদুবিদ্যার সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়।

কৃত্তিবাসের সঙ্গে পরিচয় হ'লো আরো একটু বড়ো হয়ে। কৃত্তিবাস আমাকে কাঁদালেন, বোধহয় দুই অর্থেই—কেননা যদিও মনে পড়ে সীতার দুঃখে চোখে জল এসেছে, তবু সে-রকম অসম্ভব ভালো লাগার কোনো স্মৃতি মনে আনতে পারি না। বয়স যখন কৈশোরের কাছাকাছি তখন একখানা মূল বাল্মীকি উপহার পেয়েছিলুম—তার পাতা ওল্টাবার মতো উৎসাহ যখন আমার হ'তে পারতো তার আগেই বইখানা হারিয়ে গেলো। আর তারপর এই এত বছর কাটলো। এর মধ্যে অনেকবার মনে হয়েছে বাল্মীকি প'ড়ে দেখবো—অন্তত চেখে দেখবো—কিন্তু এই অপব্যয়িত জীবনের অনেক সাধু সংকল্পের মতো এটিও বিলীন হয়ে গেছে ইচ্ছার মায়ালোকে। কালীপ্রসন্ন সিংহের কল্যাণে মূল মহাভারতের স্বাদে আমার মতো অবিদ্বানও বঞ্চিত নয়, কিন্তু বাল্মীকি আর বাঙালির মধ্যে দেবভাষার ব্যবধান উনিশ-শতকী উদ্দীপনার দিনে কেন ঘোচানো হয়নি জানি না। হয়তো কৃত্তিবাসের অত্যধিক লোকপ্রিয়তাই তার কারণ। বলা বাহুল্য, কৃত্তিবাস বাল্মীকির বাংলা অনুবাদক নন, তিনি রামায়ণের বাংলা রূপকার ; তাঁর কাব্যে রাম লক্ষ্মণ সীতা শুধু নন, দেব দানব রাক্ষসেরা সুদ্ধু বাঙালি চরিত্র, গ্রন্থটির প্রাকৃতিক এবং মানসিক আবহাওয়া একান্তই বাংলার। এ-কাব্য বাঙালির মনের মতো হ'তে পারে, এমনকি বাংলা সাহিত্যে পুরাণের পুনর্জন্মের প্রথম উদাহরণ ব'লেও গণ্য হ'তে পারে, কিন্তু এর আত্মার সঙ্গে বাল্মীকির আত্মার প্রভেদ রবীন্দ্রনাথের 'কচ ও দেবযানী'র সঙ্গে মহাভারতের দেবযানী-উপাখ্যানের প্রভেদের মতোই, মাপে ঠিক ততটা না-হ'লেও জাতে তা-ই। আমাদের আধুনিক কবি-ঠাকুরদের প্রশংসায় আমরা কখনো ক্লান্ত হবো না, কিন্তু সেই সঙ্গে এ-কথাও মনে রাখবো যে আদিকবিদের চারিত্রলক্ষণ জানতে হ'লে আদিকবিদেরই শরণাগত হ'তে হবে। ভুল করবো, মারাত্মক ভুল, যদি মনে করি কৃত্তিবাসের রম্য কাননে আদিকবির, মহাকাব্যের, ধ্রুপদী সাহিত্যের, ফল কুড়োনো সম্ভব। বাল্মীকিতে রামের বনবাসের খবর পেয়ে লক্ষ্মণ খাঁটি

গোঁয়ারের মতো বলছেন, 'ঐ কৈকেয়ী-ভজা বুড়ো বাপকে আমি বধ করবো'; বনবাসের উদ্যোগের সময় রাম সীতাকে বলছেন, 'ভরতের সামনে আমার প্রশংসা কোরো না, কেননা ঋদ্ধিশালী পুরুষ অন্যের প্রশংসা সইতে পারে না'; এবং লঙ্কাকাণ্ডে যুদ্ধের পরে সীতাকে যখন রাম পরিত্যাগ করলেন, তখন সীতা তাঁকে বললেন প্রাকৃতজন; অর্থাৎ ছোটোলোক;—এই সমস্তই, সতীত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও পুত্রত্বের আদর্শরক্ষার খাতিরে বর্জন করেছেন ব'লে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কৃত্তিবাসকে তারিফ করেছেন। হয়তো তারিফ করাটা ঠিকই হয়েছে, হয়তো এর ঐতিহাসিক কারণ ছিলো, তৎকালীন বঙ্গসমাজের পটভূমিকায় এর সমর্থনও হয়তো খুঁজে পাওয়া সম্ভব—কিন্তু সে-সব যা-ই হোক, এই বর্জনে আদিকবির আত্মা যে উবে গেলো তাতে সন্দেহ নেই। আদিকবির লক্ষণ, পৃথিবীর আদি মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য আমি যা বুঝেছি, তার নাম দিতে পারি বাস্তবিকতা, সে-বাস্তবিকতা এমন সম্পূর্ণ, নিরাসক্ত ও নির্মম যে তার তুলনায় আধুনিক পাশ্চাত্ত্য রিয়ালিজম-এর চরম নমুনাও মনে হয় দয়ার্দ্র। অল্ডস হক্সলি যাকে বলেছেন সম্পূর্ণ সত্য, মহাকাব্য তারই নির্বিকার দর্পণ; মহাকাব্যে ট্র্যাজেডির মত্ততা নেই, কমেডির উচ্ছলতা নেই; তাতে গলা কখনো কাঁপে না, গলা কখনো চড়ে না; বড়ো ঘটনা আর ছোটো ঘটনায় ভেদ নেই—সমস্তই সমান, আগাগোড়াই সমতল—এবং সমস্তটা ঈষৎমাত্রায় ক্লান্তিকর। বস্তুত, মহাকাব্য তো পৃথিবীর সেই কিশোর বয়সের সৃষ্টি, যখন পর্যন্ত সাহিত্য একটি সচেতন শিল্পকর্মরূপে মানুষের মনে প্রতিভাত হয়নি; এবং পরবর্তী কালে সাহিত্যকলার বিচিত্র ঐশ্বর্য যুগ-যুগ ধ'রে অবিরাম উদ্‌ভাসিত হ'তে পারতোই না, যদি আদি-কাব্যের সেই কৈশোর-সরলতাকে, সেই অচেতন সত্যনিষ্ঠাকে মানুষ চিরকালের মতো পরিত্যাগ না-করতো। মহাকাব্যের বাস্তবিকতা এমনই নির্ভীক যে সংগতিরক্ষার দায় পর্যন্ত তার নেই; তুচ্ছ আর প্রধানকে সে পাশাপাশি বসায়, কিছু লুকোয় না, কিছু ঘুরিয়ে বলে না, বড়ো-বড়ো ব্যাপার দু-তিন কথায় সারে, এবং সবচেয়ে বড়ো ব্যাপারে কিছুই হয়তো বলে না। মানবস্বভাবের কোনো মন্দেই তার চোখের পাতা যেমন পড়ে

না, তেমনি ভালোর অসম্ভব আদর্শকেও নিতান্ত সহজে সে চালিয়ে দেয়। সেইজন্য মহাভারতে দেখতে পাই চিরকালের সমস্ত মানবজীবনের প্রতিবিম্ব : তাতে এমন মন্দেরও সন্ধান পাই যাতে এই ঘোর কলিতে আমরা আঁৎকে উঠি, আবার ভালোও অপরিসীম, অনির্বচনীয়রূপে ভালো ; জীবনের এমন-কোনো দিক নেই, মনের এমন-কোনো মহল নেই, দৃষ্টির এমন কোনো ভঙ্গি নেই, যার সঙ্গে মহাভারত আমাদের পরিচয় করিয়ে না দেয়। শুধু পৃষ্ঠাসংখ্যায় নয়, জীবনদর্শনের ব্যাপ্তিতেও রামায়ণ অনেকটা ছোটো ; কিন্তু কাব্য হিশেবে—এবং কাহিনী হিশেবেও—তাতে ঐক্য বেশি, এবং আমরা যাকে কবিত্ব বলি তাতে রামায়ণ সম্ভবত সমৃদ্ধতর। এটা ভালোই, যদি আধুনিক সাহিত্যের ঐশ্বর্য-জটিল বিশাল প্রাসাদ ছেড়ে আমরা কখনো-কখনো বেরিয়ে পড়ি বাল্মীকির তপোবনে, পৃথিবীর কৈশোর-সারল্যে, মানবজাতির শৈশবের স্বতঃ-স্ফূর্তিতায়।

২

ভালো নিশ্চয়ই, কিন্তু যাতায়াতের পথ বিঘ্নবহুল। সে-পথ সম্প্রতি সুগম ক'রে দিলো শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসুর বাল্মীকি-রামায়ণের সারানুবাদ। হাস্যরসিক আর ফলিত-বিজ্ঞানীর, ভাষাবিজ্ঞানী আর ভাষাশিল্পীর যে-সমন্বয় বসু-মহাশয়ে ঘটেছে, এই বিশেষীকরণের যুগে তা রীতিমতোই বিরল ; এবং অধুনা তাঁর রঙ্গস্রোত প্রায় রুদ্ধ ব'লে আমরা যতই না আক্ষেপ করি, সেই সঙ্গে এ-কথাও বলতে হয় যে তাঁর অবিশ্রাম সক্রিয়তাই আমাদের সৌভাগ্য। বিশেষত এইরকম সময়ে, যখন দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর রুশ মার্কিন লেখকদের বঙ্গানুবাদে বাঙালির লেখনী এবং দুর্লভ কাগজ ও মুদ্রাযন্ত্র ভূরিপরিমাণে ক্ষয়িত হচ্ছে, তখনো যে বাল্মীকি অনুবাদ করবার মতো মানুষ দেশে পাওয়া গেলো, উপরন্তু সে-গ্রন্থের প্রকাশকও জুটলো, তাতে এমন আশা করবারও সাহস হয় যে বইখানা কেউ-কেউ প'ড়েও দেখবেন। অন্তত, বসু-মহাশয় সাধারণ পাঠকের পথে একটি কাঁটাও প'ড়ে থাকতে দেননি : সংক্ষেপীকরণের নৈপুণ্যদ্বারা গ্রন্থের

কলেবর সাধারণের পক্ষে সহনীয় করেছেন, অনুবাদ করেছেন গদ্যে, সহজ সরল বাংলায়, অপরিহার্য অল্প কিছু ফুটনোট শুধু দিয়েছেন, ভূমিকা যেটুকু লিখেছেন তাতেও পাণ্ডিত্যের ভার চাপাননি। বস্তুত, বইখানা উপন্যাসের মতো আরামে প'ড়ে ওঠার কোনো বাধা যদি থাকে, সে শুধু মাঝে-মাঝে উদ্ধৃত বাল্মীকির মূল শ্লোকাবলী ; আর সেগুলিও, বসু-মহাশয় ভূমিকায় ব'লেই দিয়েছেন (বোধহয় আমাদের শ্রমবিমুখতাকে ঠাট্টা ক'রেই), পাঠক ইচ্ছা করলে 'অগ্রাহ্য করতে পারেন'। কিন্তু কোনো অর্থেই গ্রহণের অযোগ্য নয় সেগুলি ; সংস্কৃতের সঙ্গে অল্পস্বল্প মুখচেনা যাঁদের আছে, এমন পাঠকেরও একটু খোঁচাতেই সন্ধি-সমাসের ফাঁকে-ফাঁকে রস ঝরবে, কেননা, সৌভাগ্যক্রমে বাল্মীকির সংস্কৃত খুব সহজ। রাজশেখর বসুকে ধন্যবাদ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বর্ষা ও শরৎঋতুর মধুর বর্ণনাটুকু বাল্মীকির মুখেই তিনি আমাদের শুনিয়েছেন—এ-বর্ণনা কৃত্তিবাস বেমালুম বাদ দিয়েছেন ব'লে তাঁকে প্রশংসা করা যায় না, কেননা কবিত্ব, নাটকীয়তা এবং চরিত্রণ—তিন দিক থেকেই এই ঋতু-বিলাস সুসংগত ও সুন্দর। ঘনজটিল বনের মধ্যে চলতে-চলতে হঠাৎ যেন একটি স্বচ্ছ-নীল হ্রদের ধারে এলাম, সেখানে নৌকো আমাদের তুলে নিয়ে জলের গান শোনাতে লাগলো : ওপারে জটিলতর পথ, কুটিলতম কাঁটা—কিন্তু এই অবসরটুকু এমন মনোহরণ তো সেইজন্যই। বনবাসের দুঃখ, সীতা-হারানোর দুঃখ, বালীবধের উত্তেজনা ও অবসাদ—সমস্ত শেষ হয়েছে, সামনে প'ড়ে আছে মহাযুদ্ধের বীভৎসতা : দুই ব্যস্ততার মাঝখানে একটু শান্তি, সৌন্দর্য-সম্ভোগের বিশুদ্ধ একটু আনন্দ। এই বিরতির প্রয়োজন ছিলো সকলেরই—কাব্যের, কবির এবং পাঠকের, আর সবচেয়ে বেশি রামের। বর্ণনার শ্লোকগুলি রামের মুখে বসিয়ে বাল্মীকি সুতীক্ষ্ণ নাট্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন। বালস্বভাব লক্ষ্মণের সীতা-উদ্ধারের চিন্তা ছাড়া আর-কিছুতে মন নেই ; শান্ত, শুদ্ধশীল রাম তাকে ডেকে এনে দেখাচ্ছেন বর্ষার বৈচিত্র্য, শরতের শ্রীলতা। বিরহী রামের সঙ্গে বিরহী যক্ষের তুলনা করলেই আমরা আদিকাব্যের সঙ্গে উত্তরকাব্যের চারিত্রিক প্রভেদ বুঝতে পারবো : আদিকাব্যে সম্পূর্ণ সত্যের নিরঞ্জন প্রশান্তি,

• উত্তরকাব্যে খণ্ডিত সত্যের উজ্জ্বল বর্ণবিলাস। সীতার বিরহে রাম ক্লিষ্ট, কিন্তু অভিভূত নন; যদিও মুখে তিনি দু-চারবার আক্ষেপ করছেন, আসলে সীতার অভাব তাঁর প্রকৃতিসম্ভোগের অন্তরায় হ'লো না; আবার মেঘ দেখেই কালো চুল কিংবা চাঁদ দেখেই চাঁদমুখ স্মরণ ক'রে আকুল হলেন না তিনি। অথচ যক্ষের বিরহের চাইতে রামের বিরহ অনেক নিষ্ঠুর, রামের দুঃখ লক্ষ্মণের শতগুণ। সীতা কাছে নেই ব'লে প্রকৃতির সৌন্দর্যের উপর রাগ করলেন না রাম, তার গলা জড়িয়েও কাঁদলেন না; সৌন্দর্যে তাঁর নিষ্কাম নৈর্ব্যক্তিক আনন্দ, যেমন শিল্পীর। এর আগে এবং পরে নিসর্গ-বর্ণনার আরো অনেক সুযোগ ছিলো, কিন্তু বাল্মীকি সে-সমস্তই উপেক্ষা ক'রে গেছেন, কেননা এর আগে এবং পরে রাম নিরন্তর কর্মজালে জড়িত—এইখানেই, এই যুদ্ধযাত্রার পূর্বাহ্নে রামের একটু সময় হ'লো: ভাবখানা এইরকম যেন নিরিবিলি ব'সে ঘাস, গাছ, আকাশ দেখতে তাঁর ভালোই লাগছে; যেন দীর্ঘ, হিংস্র, অর্থহীন যুদ্ধ আসন্ন জেনেই এই বিরল অবসরটুকুতে সীতার কথা তিনি ভাবছেন না, রাবণ বা সুগ্রীবের কথাও না—কিছু ভাবতে গেলেই যুদ্ধের কথা ভাবতে হয়, তাই কিছুই ভাবছেন না তিনি, মনকে শুধু ছড়িয়ে দিচ্ছেন সেই সবুজ, সহজ বনে, যে-বনভূমি

> ক্বচিৎ প্রগীতা ইব ষট্পদৌঘৈ
> ক্বচিৎ প্রনৃত্তা ইব নীলকণ্ঠৈঃ।
> ক্বচিৎ প্রমত্তা ইব বারণেন্দ্রৈঃ…*

* 'কোথাও ভ্রমরকুল গুঞ্জন করছে, কোথাও ময়ূর নাচছে, কোথাও গজেন্দ্র প্রমত্ত হ'য়ে রয়েছে।' বসু-মহাশয়ের এই ভাষান্তরে সাধারণ পাঠককে একটু বেশি খাতির করা হ'য়ে গেছে; বাংলা যথাসম্ভব সরল হয়েছে, কিন্তু মূলের জোরটুকু গেছে হারিয়ে। বনভূমি ভ্রমরকুলদ্বারা প্রগীত, ময়ূরদলদ্বারা প্রনৃত্ত এবং গজযূথদ্বারা প্রমত্ত—ভাষার এই বিশেষ ভঙ্গিতেই এর সরসতা। বিভক্তিহীন বাংলা ভাষায় এর যথাযথ অনুবাদ অবশ্য সম্ভব নয়, তবে কোনো বাঙালি কবিকে যদি কথাটা বলতে হ'তো তাহ'লে তিনি বোধহয় এইরকম কিছু বলতেন—কোথাও ভ্রমর তাকে গাওয়াচ্ছে, কোথাও ময়ূর তাকে নাচাচ্ছে, কোথাও তাকে পাগল ক'রে দিচ্ছে হাতির পাল।

৩

আরো একটি কারণে কৃত্তিবাস যথেষ্ট নন, বাল্মীকির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় আমাদের প্রয়োজন। সে-কারণ কী, এই গ্রন্থের ভূমিকাতেই তা বলা আছে, এবং বইখানা প'ড়ে আমরা শুধু সকৌতুকে নয়, সহর্ষেও জানি যে রাম-লক্ষ্মণেরা প্রচুর মাংস খেতেন, সব রকম মাংস খেতেন, গোসাপের মাংসও বাদ যেতো না— এমনকি অমাংসভোজনকে তাঁরা বলতেন উপবাস। সুরাতেও বিমুখ ছিলেন না তাঁরা—রাম নিজের হাতে সীতাকে মৈরেয় মদ্য পান করাচ্ছেন ; আর হনুমান সীতার খবর নিয়ে লঙ্কা থেকে ফেরবার পর বানরদল যে-মাতলামিটা করলো, রাম সেটার শাসন করলেন কিন্তু নিন্দা করলেন না। এই মধুবনের বৃত্তান্তটা—বোধহয় ভোক্তারা বানর ব'লেই কৃত্তিবাস গোপন করেননি ; কিন্তু রামান্বেষী ভরতের সৈন্যদলকে ভরদ্বাজ যে-রকম আপ্যায়ন করলেন, সেটা কৃত্তিবাসের সহ্য হ'লো না। পাশাপাশি দুটি অংশ তুলে দেখালেই আমার বক্তব্য বোঝা যাবে :

এমন সময় ব্রহ্মা ও কুবের কর্তৃক প্রেরিত বহু সহস্র স্ত্রী দিব্য আভরণে ভূষিত হয়ে উপস্থিত হ'ল। তারা যে পুরুষকে গ্রহণ করে তারা উন্মাদের তুল্য হয়। কাননের বৃক্ষসকল প্রমদার রূপ ধারণ ক'রে বলতে লাগল,

—সুরাপায়িগণ সুরা পান কর, বুভুক্ষিতগণ পায়স ও সুসংস্কৃত মাংস যা ইচ্ছা খাও।

এক এক জন পুরুষকে সাত আট জন সুন্দরী স্ত্রী নদীতীরে নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে অঙ্গসংবাহন ক'রে মদ্যপান করাতে লাগল। পানভোজনে এবং অপ্সরাদের সহবাসে পরিতৃপ্ত সৈন্যগণ রক্তচন্দনে চর্চিত হয়ে বললে,

—আমরা অযোধ্যায় যাব না, দণ্ডকারণ্যেও যাব না, ভরতের মঙ্গল হ'ক, রাম সুখে থাকুন।

যারা একবার খেয়েছে, উৎকৃষ্ট খাদ্য দেখে আবার তাদের খেতে ইচ্ছা হ'ল। সকলে বিস্মিত হয়ে আতিথ্যের উপকরণসম্ভার দেখতে লাগল—স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে শুভ্র অন্ন, ফলরসের সহিত পক্ব সুগন্ধ সূপ, উত্তম ব্যঞ্জন

৪

রামায়ণের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা রাম-চরিত্র। যে-রামের নাম করলে ভূত ভাগে, সেই রাম নিষ্ঠুর অন্যায় করেছেন একাধিকবার। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে রামকে 'অন্য সমালোচনার আদর্শে' বিচার করাই চলবে না, ভেবে দেখতে হবে, যুগ-যুগ ধ'রে ভারতীয় মনে কোন মূর্তিটি তাঁর গ'ড়ে উঠেছে। রামচন্দ্রের এই প্রতিপত্তির মূল কোথায় তা-ও রবীন্দ্রনাথ বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন: রাম বালীবধ ক'রে সুগ্রীবকে রাজা করলেন, রাবণ-বধ ক'রে বিভীষণকে; কোনো রাজত্বই নিজে নিলেন না; মিতালি করলেন চণ্ডালের সঙ্গে, বানরের সঙ্গে; এই উপায়ে, অভ্রান্ত কূটনীতির দ্বারা, আর্য-অনার্যে সম্পূর্ণ মিলন ঘটিয়ে বিশাল ভারতের ঐক্যসাধন করলেন, ভারতীয় ইতিহাসে সম্ভবত প্রথমতম সেই ঐক্যসাধন। কালক্রমে তাঁর আদি কাহিনীর 'মুখে-মুখে রূপান্তর ও ভাবান্তর' হ'তে লাগলো; গণমানসে তিনি প্রতিভাত হলেন লোকোত্তর পুরুষরূপে, এমনকি অবতার-রূপে। রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা অনুসরণ ক'রে বলা যায় যে আদি রামের মহিমা অনেকটা জুলিয়স সীজারের অনুরূপ; যে রাম-রাজ্য আর সাম্রাজ্য আসলে অভিন্ন; যে সাম্রাজ্যবাদের উচ্চতম আদর্শের মহত্তম ব্যঞ্জনা যেমন সীজার-জীবনে, তেমনি রাম-চরিতে। তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ কূটনীতিজ্ঞ. বাল্মীকি প'ড়ে তা ভালোই জানা যায়; শ্রেষ্ঠ এই কারণে যে কূটনীতির সঙ্গে ধর্মনীতিকে মোটের উপর মেলাতে পেরেছেন, যদিও মুমূর্ষু বালীর কানে তার নিধনের সমর্থনে যে-কথাগুলি তিনি জপলেন তাতে প্রকারান্তরে এই কথাই বলা হ'লো যে রাজনীতির ক্ষেত্রে নামলে অন্যায় থেকে অবতারেরও ত্রাণ নেই।···কিন্তু এইজন্যই কি রাম এত বড়ো? মস্ত বীর, মস্ত রাজা ব'লে? সাম্রাজ্যের অতুলনীয় স্থপতি ব'লে?

অনেকটা রবীন্দ্রনাথের কথাই মেনে নিয়ে বসু-মহাশয়ও ভূমিকায় বলেছেন যে আধুনিক যুগের সংস্কার নিয়ে রামায়ণ বিচার সম্ভব নয়। যেমন, তিনি যুক্তি দিয়েছেন, রাজ্যের খাতিরে ভার্যাত্যাগ আমাদের কাছে দুঃসহ, তেমনি রামচন্দ্রের আজীবন একপত্নীত্ব যে সেই হারেমবিলাসী যুগে কত

বড়ো আদর্শের প্রতিরূপ, সেটাও আমাদের উপলব্ধির বহির্ভূত।···কিন্তু রামচন্দ্রকে কি আমরা বিচার করবো শুধু তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থা অনুসারে? তাঁর মধ্যে মনুষ্যত্বের চিরকালের আদর্শই যদি দেখতে না-পেলাম, তবে তিনি রাম কিসের। একটি বই স্ত্রী তাঁর ছিলো না, সেই জন্যই কি তিনি বড়ো? না কি আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ বন্ধু, আদর্শ শত্রু ব'লে? শুধু এইটুকুর জন্যই, কিংবা এই সমস্ত-কিছুর জন্যই, কি রামচন্দ্রের মহিমা?

আধুনিক পাঠকের চোখে রাম রীতিমতো অরাম হ'য়ে ওঠেন তাঁর সীতাবর্জনের সময়। অগ্নিপরীক্ষা তো সীতার নয়, রামের, আর সে-পরীক্ষার বিচারক আমরা। যুদ্ধ শেষ হ'লো; রাবণ মরলো; রাম বিভীষণকে বললেন, সীতাকে নিয়ে এসো আমার কাছে, সে স্নান ক'রে শুদ্ধ হ'য়ে আসুক। সীতা বললেন, স্নান? তাতে দেরি হবে—আমাকে এখুনি নিয়ে চলো। কিন্তু স্নান তাঁকে করতে হ'লো, সাজতেও হ'লো, পালকি থেকে নামলেন রামের সভায়, বানর রাক্ষস ভল্লুকের ভিড়ে। কতকাল পরে দেখা! কত দুঃখের পরে! 'লজ্জায় যেন নিজের দেহে লীন হ'য়ে' স্বামীর মুখের উপর চোখ রাখলেন সীতা, আর তখন, তখনই, সেই রাক্ষস বানর ভল্লুকের ভিড়ে এত দুঃখে ফিরে-পাওয়া সীতাকে প্রথম দেখে কী-কথা বললেন রাম? বললেন:

আমি শত্রু জয় ক'রে তোমাকে উদ্ধার করেছি, পৌরুষ দ্বারা যা করা যায় তা আমি করেছি। আমার ক্রোধ ও শত্রুকৃত অপমান দূর হয়েছে, প্রতিজ্ঞা পালিত হয়েছে। আমার অনুপস্থিতিতে তুমি চপলমতি রাক্ষস কর্তৃক অপহৃত হয়েছিলে তা দৈবকৃত দোষ, আমি মানুষ হ'য়ে তা ক্ষালন করেছি।···তোমার মঙ্গল হোক। তুমি জেনো এই রণপরিশ্রম—সুহৃদ্‌গণের বাহুবলে যা থেকে মুক্ত হয়েছি—এ তোমার জন্য করা হয়নি। নিজের চরিত্র রক্ষা, সর্বত্র অপবাদ খণ্ডন, এবং আমার বিখ্যাত বংশের গ্লানি দূর করবার জন্যই এই কার্য করেছি। তোমার চরিত্রে আমার সন্দেহ হয়েছে, নেত্ররোগীর সম্মুখে যেমন দীপশিখা, আমার পক্ষে তুমি সেইরূপ কষ্টকর।

তুমি রাবণের অঙ্কে নিপীড়িত হয়েছ, সে তোমাকে দুষ্ট চোখে দেখেছে, এখন যদি তোমাকে পুনর্গ্রহণ করি তবে কি ক'রে নিজের মহৎ বংশের পরিচয় দেব ? যে উদ্দেশ্যে তোমার উদ্ধার করেছি তা সিদ্ধ হয়েছে, এখন আর তোমার প্রতি আমার আসক্তি নেই, তুমি যেখানে ইচ্ছা যাও। আমি মতি স্থির ক'রে বলছি লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন সুগ্রীব বা রাক্ষস বিভীষণ, যাঁকে ইচ্ছা কর তাঁর সঙ্গে যাও, অথবা তোমার যা অভিরুচি কর। সীতা, তুমি দিব্যরূপা-মনোরমা, তোমাকে স্বগৃহে পেয়ে রাবণ অধিককাল ধৈর্যাবলম্বন করেনি।...

(রাজশেখর বসুর অনুবাদ)

ছী-ছি—আমাদের সমস্ত অন্তরাত্মা কলরোল ক'রে ব'লে ওঠে—ছী-ছি! বিশেষ ক'রে ঐ শেষের কথাটা—লক্ষ্মণ ভরত সুগ্রীব বিভীষণ যার কাছে ইচ্ছা যাও—কী ক'রে রামচন্দ্র মুখে আনতে পারলেন, ভাবতেই বা পেরেছিলেন কী ক'রে! এ তো শুধু হৃদয়হীন নয়, রুচিহীন ; 'নীচ ব্যক্তি নীচ স্ত্রীলোককে যেমন বলে,' এ তো তেমনি, সীতার এই উত্তর আমাদের সকলেরই মনের কথা। আর এখানেই শেষ নয় ; অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের পর আবার সীতা-বিসর্জন ; যদিও রামচন্দ্রের অন্তরাত্মা জানে যে সীতা শুদ্ধশীলা, তবু বাজে লোকেদের বাজে কথা কানে তুলে সীতাকে তিনি নির্বাসনে পাঠালেন—পাঠালেন ফাঁকি দিয়ে, যেন সীতার আশ্রমদর্শনের ইচ্ছা পূর্ণ করছেন, এই রকম ভান ক'রে। আবার বিরহ! কিন্তু রামের বিরহদুঃখের কোনো কথাই এবার আমরা শুনলাম না ; রাজকার্যে নিবিষ্ট দেখলাম তাঁকে ; যতদিন না অশ্বমেধ-যজ্ঞসভায় লবকুশকে দেখে তাঁর হৃদয় উদ্বেল হ'লো। তাঁর আহ্বানে স্বয়ং বাল্মীকি এলেন সীতাকে নিয়ে সেই সভায়। সেবার লঙ্কায় দর্শক ছিলো শুধু রাক্ষস বানর ভল্লুকের দল ; এবার রাজসভায়, যজ্ঞভূমিতে, সকল গুরুজনেরা উপস্থিত, শ্রেষ্ঠ মুনিগণ উপবিষ্ট, রাক্ষস বানর এবং 'বহু সহস্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র কৌতূহলী হ'য়ে এল,' শেষ পর্যন্ত স্বর্গের দেবতারাও না-এসে পারলেন না। ত্রিলোকের অধিবাসীর সামনে আবার সীতার পরীক্ষা—কিন্তু এ-পরীক্ষাও রামচন্দ্রের,

আর বিচারক আমরা। সীতা মুখ নিচু ক'রে নিঃশব্দ, তাঁর হ'য়ে কথা বললেন বাল্মীকি। উত্তরে রাম বললেন :

…ধর্মজ্ঞ, আপনি যা বললেন সমস্তই বিশ্বাস করি।…লোকাপবাদ বড় প্রবল, তার ভয়েই এঁকে অপাপা জেনেও পুনর্বার ত্যাগ করেছিলাম, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।…জগতের সমক্ষে শুদ্ধস্বভাবা মৈথিলীর প্রতি আমার প্রীতি উৎপন্ন হ'ক।

রাম সীতাকে গ্রহণ করবেন, সে-জন্য অনুমতি চাচ্ছেন জগতের! এত দুঃখ সইতে পেরেছেন যে-সীতা, এ-দুঃখ তাঁর সইলো না,

…রাম ভিন্ন আর কাকেও জানি না—এই কথা যদি আমি সত্য ব'লে থাকি তবে মাধবী দেবী বিদীর্ণ হ'য়ে আমাকে আশ্রয় দিন—

এই ব'লে পৃথিবীর বিবরে তিনি প্রবেশ করলেন।

সীতার দুঃখে পুরুষানুক্রমে আমরা কেঁদে আসছি। শ্রীযুক্ত বসুও তাঁর ভূমিকায় প্রশ্ন করেছেন : 'দু-দুবার সীতাকে নিগৃহীত করবার কী দরকার ছিল?' উত্তরকাণ্ড বাল্মীকির রচনা নয়, এই পণ্ডিতপোষিত অনুমানে সান্ত্বনা খুঁজেছেন তিনি। কিন্তু উত্তরকাণ্ড না-থাকলে রামায়ণ এতো বড়ো কাব্যই তো হ'তো না। লঙ্কায় অগ্নিপরীক্ষার পর সীতা লক্ষ্মী মেয়ের মতো রামের কোলে ব'সে পুষ্পকে চ'ড়ে অযোধ্যায় এলেন, আর তারপর ঘরকন্না ক'রে বাকি জীবন সুখে কাটালেন—এই যদি রামায়ণের শেষ হ'তো, তাহ'লে কি সমগ্র ভারতীয় জীবনে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে রামায়ণের প্রভাব এমন ব্যাপক, এমন গভীর হ'তে পারতো? বাল্মীকি যদি উত্তরকাণ্ড না-লিখে থাকেন, তবে সেইটুকু বাল্মীকিত্বে তিনি ন্যূন। উত্তরকাণ্ড যে-কবির রচনা তিনি বাল্মীকি না হোন, বাল্মীকিপ্রতিম নিশ্চয়ই : বস্তুত, রামায়ণকে অমর কাব্যে পরিণত করলেন তিনিই। যে-সীতার জন্য এত দুঃখ, এত যুদ্ধ, এমন সুদীর্ঘ, সুতীব্র উদ্যম, সেই সীতাকে পেয়েও হারাতে হ'লো, ছাড়তে

হ'লো স্বেচ্ছায়, এই কথাটাই তো রামায়ণের আসল কথা। যে-রাজ্য নিয়ে অত বড়ো কুরুক্ষেত্র ঘ'টে গেলো, সে-রাজ্য কি পাণ্ডবেরা ভোগ করেছিলেন? যে-মুহূর্তে সব পেলেন সে-মুহূর্তে সব ছাড়লেন তাঁরা, বেরিয়ে পড়লেন মহাপ্রস্থানের মহানির্জনে। যুদ্ধে জয় যখনই হ'লো, রামও তখনই সীতাকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত।..কর্মে তোমার অধিকার, কিন্তু ফলে নয়।...রামের যুদ্ধ, পাণ্ডবের যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধ বলেছে তো এইজন্যই। তা না-হ'লে লোভীর সঙ্গে লোভীর যে-সব দ্বন্দ্ব মানুষের ইতিহাসে চিরকাল ধরে ঘ'টে আসছে, তার সঙ্গে এ-সবের প্রভেদ থাকতো কোথায়। লোভীর বিরুদ্ধে যে অস্ত্র ধরে, সে নিজেও লোভী ব'লে আধুনিক যুদ্ধে শুধু বীভৎসতা, শুধু হত্যার বীভৎসতা; কিন্তু পাণ্ডবের যুদ্ধে, রামের যুদ্ধে ফলে অধিকার নেই, অধিকার শুধু কর্মে—আর তাই তার শেষ ফল চিত্তশুদ্ধি।

৫

রাম তাঁর কর্মকে মেনে নিয়েছেন। পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে কোন ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ তা তিনি জানেন, আর জীবনের প্রত্যেক অবস্থায়, সুখে এবং দুঃখে, সম্পদে এবং সংকটে সেই ভূমিকাটি সুসম্পন্ন করতে যথাসাধ্য তিনি সচেষ্ট। তাই তিনি অধৈর্যহীন, অক্লিষ্টকর্মা, শান্ত, শ্যামল, নিষ্কাম। বিপদে তিনি বিচলিত, কিন্তু বিহ্বল নন, সৌভাগ্যে তিনি প্রমত্ত নন, যদিও প্রীত। স্বর্ণমৃগ যখন মৃত্যুকালে স্বরূপ ধারণ করলো, তখনও, রাক্ষসের মায়া বুঝতে পেরেও, রাম খুব বেশি ব্যস্ত হলেন না, 'অন্য মৃগ বধ ক'রে মাংস নিয়ে' তবে বাড়ি ফিরলেন। সীতা-উদ্ধারের উদ্যোগ আরম্ভ হবার আগেই বর্ষা নামল মাল্যবান পর্বতে, এই নিদারুণ সংকটে চার মাস চুপ ক'রে ব'সে থাকতে হবে ব'লে মুহূর্তের জন্যও চঞ্চল হলেন না; বরং এই অনভিপ্রেত নিষ্ক্রিয়তাকে বর্ষা-শরতের লীলাক্ষেত্র ক'রে তুললেন, আর শরতের শেষে যুদ্ধারম্ভের জন্য লক্ষ্মণকেই দেখা গেলো বেশি উদ্‌গ্রীব। রাম অধৈর্যহীন, বৈক্লব্যহীন, রাম ধীর স্নিগ্ধ গম্ভীর; যা করতে হবে সব করেন, কিন্তু এটা কখনো ভোলেন না যে এ-সমস্তই রঙ্গমঞ্চে তাঁর নির্দিষ্ট ভূমিকার

অংশ মাত্র। বালীর মৃত্যুশয্যায় রাম নিজের সমর্থনের যে-চেষ্টা করলেন তা একেবারেই অনর্থক হ'তো, যদি-না তার মধ্যে এ-কথাটি থাকতো: 'তোমাকে আমি ক্রোধবশে বধ করিনি, বধ ক'রে আমার মনস্তাপও হয়নি।' এই পবিত্র অপার্থিবতা, এই ঐশ্বরিক উদাসীনতার মুখোমুখি আবার আমরা দাঁড়ালাম যুদ্ধকাণ্ডের শেষে, রাম যখন সীতাকে বললেন: 'তোমার মঙ্গল হোক। তুমি জেনো এই রণপরিশ্রম…এ তোমার জন্য করা হয় নি।' তোমার জন্য করিনি, তার মানে, আমার নিজের জন্য করিনি, শুধু করতে হবে ব'লেই করেছি। শুধু একবার, শেষবারের মতো সীতা যখন অন্তর্হিত হলেন, সেই একবার তিনি 'মৈথিলীর জন্য উন্মত্ত' হলেন, 'জগৎ শূন্যময় দেখতে লাগলেন, কিছুতেই মনে শান্তি পেলেন না।' তবু তো তার পরেও—যদিও, যেহেতু তিনি নররূপী বিষ্ণু, স্বর্গে সীতার সঙ্গে তাঁর পুনর্মিলন তিনি ইচ্ছা করলে তখনই হ'তে পারতো—তার পরেও রাজত্ব করলেন 'দশ সহস্র বৎসর', সকল রকম ধর্মানুষ্ঠান করলেন, ভরত লক্ষ্মণের পুত্রদের রাজত্ব দিলেন, আর সর্বশেষে (এ-ঘটনাটা সর্বসাধারণে তেমন সুবিদিত নয়) প্রাণাধিক লক্ষ্মণকে ত্যাগ করলেন প্রতিজ্ঞারক্ষার জন্য। 'সৌমিত্রি, তোমাকে বিসর্জন দিলাম,' রামকে এ-কথাও বলতে হ'লো নিজের মুখে। প্রতিজ্ঞাপালন তো উপলক্ষ্য মাত্র; আসল কথাটা এই যে, যেমন সীতাকে, তেমনি লক্ষ্মণকেও, স্বেচ্ছায় ছাড়তে হবে—নয়তো মর্ত্যের বন্ধন থেকে রাম মুক্ত হবেন কেমন ক'রে। স্বর্গারোহণের পথে যুধিষ্ঠিরকেও একে-একে ছাড়তে হ'লো নকুল সহদেব অর্জুন ভীম আর প্রিয়তমা পাঞ্চালীকে। স্বর্গের পথ নির্জন।

বাল্মীকিতে এ-কথাটা একটু জোর দিয়েই বার-বার বলা হয়েছে যে রাম অবতার হ'লেও মানুষ, নিতান্তই মানুষ। মনুষ্যত্বের মহত্তম আদর্শের প্রতিভূ তিনি, বিশেষ-কোনো একটি দেশের বা যুগের নয়, সর্বদেশের, সর্ব-কালের। দেহধারী মানুষ হ'য়ে, স্থানে ও কালে সীমিত হ'য়ে, যতটা মুক্ত, শুদ্ধ, সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব, রামচন্দ্র তা-ই। যদি তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণই হবেন, তবে মারীচের রাক্ষসী মায়ায় মজবেন কেন। মানুষ তিনি, নিতান্তই মানুষ, এবং সম্পূর্ণ মানুষ, তাই মানুষের দুঃখ সম্পূর্ণ তাঁকে জানতে হবে,

এমনকি মনুষ্যত্বের অবমাননা থেকেও তাঁর নিস্তার নেই। তাই তো তাঁকে স্বীকার করে নিতে হ'লো বালীহত্যার হীনতা, সীতাবর্জনের কলঙ্ক, শম্বুক-বধের অপরাধ।* যদি এ-সব না-ঘটতো, যদি তিনি জীবনে একটিও অন্যায় না করতেন, তবে তাঁর নরজন্ম সার্থক হ'তো না, মনুষ্যত্ব অসম্পূর্ণ থাকতো, তবে তিনি হতেন নিয়তির অতীত, প্রকৃতির অতীত, অর্থাৎ আমরা তাঁকে আমাদের একাত্ম ব'লে মনে করতে পারতাম না—আর তাহ'লে রামায়ণের কাব্যগৌরব কতটুকু থাকতো? রাম করুণাময়, পতিতপাবন, তিনি পা ছোঁওয়ালে অহল্যা বাঁচে, রাবণ সুদ্ধু তাঁর হাতে মরতে পেরে ধন্য, তবু তো কারোরই—কোনো অন্ধ ভক্তেরও—বুদ্ধ বা যীশুর মতো লাগে না তাঁকে। আদিকবির নির্ভুল বাস্তবিকতা স্পষ্টই বুঝিয়ে দিয়েছে যে মহামানব তিনি নন, কিন্তু তিনি-যে মানব, এই সত্যটাই মহান।

রামায়ণের ঘটনাচক্র এই মনুষ্যত্বের বহুলবিচিত্র ব্যঞ্জনার উপলক্ষ্য মাত্র। 'মাইকেল' প্রবন্ধে আমি প্রশ্ন উত্থাপন করেছি: রাবণ সীতাহরণ করেছিলেন কেন। শ্রীযুক্ত বসুর বইখানাতে এ-প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করলাম; যে-উত্তর আমার মন চেয়েছিলো, তা সে পেলো না। আমার মনে হয় যে রামের দিক থেকে সমস্তটাই ছল; সমস্তটাই লীলা। রাম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ মুখস্থ ক'রেই রঙ্গমঞ্চে নেমেছেন, কিসের পর কী তা তিনি সবই জানেন, তবু যেন জানেন না; মহৎ অভিনেতার মতো আমাদের মনে এই মোহ জন্মাচ্ছেন যে ঘটনাবলী তাঁর অপ্রত্যাশিত, নিয়তি তাঁর কাছেও স্বৈরিণী, যেন এটা অভিনয় নয়, জীবন। জটায়ুকে পরাস্ত ক'রে রাবণ যখন সীতাকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, তখন 'দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিগণ রাবণবধের সূচনায় তুষ্ট হলেন': সীতাহরণটা আর-কিছু নয়, শুধু রাবণবধের ছল। আর রাবণবধও আর-কিছু নয়, শুধু রামের কর্ম-উদ্‌যাপনের উপলক্ষ্য।

* রামচন্দ্রের বিবিধ অন্যায়ের মধ্যে এই শম্বুকবধটাই আধুনিক দৃষ্টিতে সবচেয়ে অক্ষম্য। রবীন্দ্রনাথ একে প্রক্ষিপ্ত বলেছেন; কিন্তু রামায়ণকে যদি কাব্যহিশেবে দেখি, তাহ'লে বলতে হয় এর শিল্পগত প্রয়োজন ছিলো। রামচন্দ্রকে এতটা নিচে নামতে হয়েছিলো ব'লে তাঁর মানবিক স্বরূপ আমরা উপলব্ধি করতে পারি।

সীতা-উদ্ধারের জন্য এত পরিশ্রমই বা কেন, ইচ্ছে করলে রাম কী না পারেন। কিন্তু ঐ ইচ্ছে করাটা তাঁর ভূমিকায় নেই, কোনো অসম্ভবকে সম্ভব করেন না তিনি, তাঁকে মেনে নিতে হয় বর্ষার বাধা, সমুদ্রের ব্যবধান, ঘটনার দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিকূলতা ; বালীকে মেরে সুগ্রীবকে রাজত্ব দিয়ে সংগ্রহ করতে হয় বানর-সেনা, যে-বানর মানুষেরও অধম ; দীন, দুর্বল, বর্বর সৈন্যদল নিয়ে এগোতে হয় চতুর, সুসংবদ্ধ, যন্ত্রনিপুণ দানবের বিরুদ্ধে। কেন ? না, এটাই মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণতার উপায়। হনুমান অনায়াসেই সীতাকে পিঠে ক'রে নিয়ে আসতে পারতেন, তা তিনি চেয়েওছিলেন, যুদ্ধে তাহ'লে প্রয়োজনই হ'তো না,—কিন্তু সে তো হ'তে পারে না, তাতে রামের পূর্ণতার হানি হয়। সীতা-উদ্ধার হ'লেই তো হ'লো না, সেটা ত্যাগের, দুঃখের দীর্ঘতম পথে হওয়া চাই : কেননা সীতা-উদ্ধার তো উপলক্ষ্য, লক্ষ্য হ'লো রামের সর্বাঙ্গীণ মনত্ব-ভোগ। তাই হনুমানের প্রস্তাবে আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন না সীতা, প্রত্যাখ্যান ক'রে বললেন :

…সমস্ত রাক্ষসদের বধ ক'রে যদি তুমি জয়ী হও, তাতে রামের যশোহানি হবে। রামের সঙ্গে তুমি এখানে এস, তাতেই মহৎ ফল হবে। যদি রাম এখানে এসে দশানন ও অন্য রাক্ষসদের বধ ক'রে আমাকে এখান থেকে নিয়ে যান তবেই তাঁর যোগ্য কাজ হবে।…তুমি একাই কার্য সাধন করতে পার তা জানি, কিন্তু রাম যদি সসৈন্যে এসে রাবণকে যুদ্ধে পরাজিত ক'রে আমাকে উদ্ধার করেন তবেই তাঁর উচিত কার্য করা হবে।

রামায়ণের চরিত্র সাধারণত পুনরুক্তি করে না, কিন্তু সীতা হনুমানকে এই কথাটি দু-বার বলছেন। তাঁর এ-আগ্রহ কি উদ্ধারের জন্য ? তা যদি হ'তো তবে তো তিনি তৎক্ষণাৎ হনুমানের পৃষ্ঠারূঢ় হ'তেন। না, আগ্রহ এইজন্য যাতে রামচন্দ্রের পূর্ণিমতা অবরুদ্ধ না হয় ; আর সে-আগ্রহ শুধু সীতার নয়, কাব্যের স্রষ্টার, কাব্যের ভোক্তার।

৬

রামায়ণে অসংগতি অসংখ্য। অনেক ক্ষেত্রেই কবি আমাদের সম্ভাব্য কৌতূহলকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে গেছেন। উপেক্ষিতা উর্মিলাকে বিখ্যাত করেছেন রবীন্দ্রনাথ; শ্রীযুক্ত বসুও ভূমিকায় কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। আদিকবির অবহেলার তালিকা ক্ষুদ্র নয়, তুচ্ছও নয়। উদাহরণত, বালীপত্নী তারাকে তিনি এমন ক'রে এঁকেছেন যেটা রীতিমতো মর্মঘাতী। পতির মৃত্যুতে চীৎকার করে কাঁদতে শুনলাম তাঁকে, আর তার পরেই দেখা গেলো ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণের সামনে তিনি বেরিয়ে এলেন সেই অন্তঃপুর থেকে, যেখানে 'সুগ্রীব প্রমদাগণে বেষ্টিত হ'য়ে রুমাকে আলিঙ্গন ক'রে স্বর্ণাসনে ব'সে আছেন,' 'মদবিহ্বলা' তিনি, স্খলিতগমনা, এসে লক্ষ্মণের কাছে তৈলাক্ত ওকালতি করলেন সেই সুগ্রীবকে নিয়ে, যে-সুগ্রীব যথার্থ বালীহন্তা। আমাদের অবাক লাগে বইকি।...কিন্তু আদিকবি উদাসীন, আধুনিক কালের সচেতন শিল্পী তিনি নন: শিশুর শিল্পহীনতার পরম শিল্পে তিনি অধিকার করেন আমাদের, কত বাদ দিয়ে যান, কত ভুলে যান, কত এলোমেলো, কত অতিরঞ্জন, অবান্তরতা; কোনো কৌশল জানেন না তিনি, সাজাতে শেখেননি; আমাদের ধ'রে রাখে শুধু তাঁর সত্যদৃষ্টি, তাঁর মৌল, সহজ, সামগ্রিক সত্যদৃষ্টি। তাঁর বাস্তবিকতা এতই বিরাট ও সর্বংসহ যে একদিকে যেমন ঘটনাবর্ণনে কি চরিত্রচিত্রণে নিছক বাস্তবসদৃশতার জন্য তিনি ব্যস্ত নন, তেমনি ডিকেন্স বা বঙ্কিমচন্দ্রের মতো প্রত্যেকটি পাত্রপাত্রীর শেষ পর্যন্ত কী হ'লো, তা জানাবার দায় থেকেও তিনি মুক্ত। যে-রকম একটি সুযোগ পেলে আমরা আধুনিক লেখকরা ব'র্তে যাই, সে-রকম কত সুযোগ হেলায় হারিয়েছেন—সেগুলি কোনোরকম সুযোগ ব'লেই মনে হয়নি তাঁর। শুধু-যে উর্মিলাকে একেবারে ভুলে গেছেন তা নয়, লক্ষ্মণকেও ভুলেছেন, কেননা একবার একটি দীর্ঘশ্বাস পড়লো না লক্ষ্মণের, বনবাসযাত্রার সময় স্ত্রীর কাছে একটু বিদায় পর্যন্ত নিলেন না। আর কৈকেয়ীকেও বলতে গেলে সেই একবারই আমরা দেখলাম; কিন্তু পরে কি তাঁর অনুশোচনা হয়নি? আমাদের এ-সব

জিজ্ঞাসার উত্তর বইতে নেই, আছে আমাদেরই হৃদয়ে। সেই হৃদয়লিপির রচয়িতাও রামায়ণের কবি। আমরা-যে উর্মিলার কথা ভাবি, লক্ষ্মণের হ'য়ে আমাদের যে মন-কেমন করে, কৈকেয়ীর হ'য়ে আমরা যে অনুশোচনা করি—এ-সমস্তই কি বাল্মীকিরই ব'লে দেয়া নয়? আদিকবির শিল্প-হীনতার চরম রহস্য এইখানেই যে আমরা তাঁর পাঠক শুধু নই, তাঁর সহকর্মী, তিনি নিজে যা বলতে ভোলেন, সে-কথা রচনা করিয়ে নেন আমাদের দিয়ে। কেউ হয়তো বলবেন যে রাম ছাড়া অন্য সকলেই তাঁর কাছে উপেক্ষিত : অন্য সব চরিত্রই খণ্ডিত, মাত্র একটি লক্ষণসম্পন্ন ; লক্ষ্মণ শুধুই ভাই, হনুমান শুধুই সেবক, রাবণ শুধুই শক্তিশালী—একমাত্র রাম সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ। কিন্তু রামের সম্বন্ধেই কবির উপেক্ষা কি কম! রাম প্রেমিক, রাম-সীতার জীবন দাম্পত্যের মহৎ আদর্শ, কিন্তু তাঁদের যুগল-জীবনের পরিধি কতটুকু! বলতে গেলে সারা জীবনই তো রামকে সীতাবিরহে কাটাতে হ'লো। এ-বিরহে সীতার প্রতি কবির করুণা প্রচুর, কিন্তু রাম সম্বন্ধে তাঁর মুখে বেশি কথা নেই। যখন সীতাহরণ, যখন পুনর্জিতার প্রত্যাখ্যান, যখন গণরঞ্জনী সীতাবর্জন—এই তিনবারের একবারও রামকে তেমন শোকার্ত আমরা দেখলাম না ; মনে-মনে বললাম, রাজধর্মের তাগিদে না-হয় বাধাই হয়েছিলেন, তাই ব'লে দুঃখও কি পেতে নেই! ···কিন্তু রামের উদাসীনতায়, কিংবা রামের প্রতি কবির উদাসীনতায়, আমাদের মনে যে-দুঃখ, সেই দুঃখই তো রামের ; যে-রাম সীতার জন্য কাঁদছেন সে-রাম আমরাই তো। নাটক রঙ্গমঞ্চে আরম্ভ হ'য়ে শেষ হ'লো প্রেক্ষাগৃহে, কিংবা রঙ্গমঞ্চে শেষ হবার পর প্রেক্ষাগৃহে চলতে লাগলো ; রঙ্গমঞ্চে একজন রাম যা করলেন, তার জন্য প্রেক্ষাগৃহের লক্ষ-লক্ষ রামের কান্না আর ফুরোয় না। হয়তো উদাসীনতাই অভিনিবেশের চরম ; হয়তো উপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ নিরীক্ষা ; হয়তো শিল্পহীনতার অচেতনেই শিল্পশক্তির এমন একটি অব্যর্থ সন্ধান ছিলো, যা ফিরে পেতে হ'লে সমস্ত সভ্যতা লুপ্ত ক'রে দিয়ে মানব-জাতিকে আবার নতুন ক'রে প্রথম থেকে আরম্ভ করতে হবে।

১৯৪৭

মাইকেল

মাইকেলের খ্যাতির সঙ্গে মাইকেলের কীর্তির সুমাত্রা-সূত্রের সম্বন্ধ নয়। যদিও পণ্ডিতেরা পক্ষপাতী ছিলেন না, এবং স্বয়ং বিদ্যাসাগর ঠোঁট বেঁকিয়েছিলেন, তবু সমসাময়িক পাঠকসমাজে মাইকেলের আধিপত্য সূচিত হয়েছিলো মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশিত হবার আগেই। আর তার পর থেকে আজ প্রায় একশো বছর ধ'রে আমরা অবিশ্রান্ত শুনে আসছি যে মাইকেল মহাকবি, বাংলা সাহিত্যের ত্রাতা এবং বাংলা কাব্যের মুক্তিদাতা। তাঁর ঘটনাবহুল নাটকীয় জীবন, জীবনের শোকাবহ সমাপ্তি তাঁর প্রতিষ্ঠার সহায়তা করেছে; এবং সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে ও রঙ্গমঞ্চে পুনরুজ্জীবিত মাইকেলের যে-ছবি ফুটেছে তার দিকে ভালো ক'রে তাকালে এ-কথা মনে না-ক'রে পারা যায় না যে বাঙালি আসলে তাঁর কবিকর্ম সম্বন্ধে ততটা উৎসাহী নয়, যতটা তাঁর জীবনীর অসামান্য চিত্রলতা সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসী।

সত্যি বলতে, মাইকেলের মহিমা বাংলা সাহিত্যের প্রসিদ্ধতম কিংবদন্তী, দুর্মরতম কুসংস্কার। কর্মফল তাঁকে পৌঁছিয়ে দিয়েছে সেই ভুল স্বর্গে, যেখানে মহত্ত্ব নিতান্তই ধ'রে নেয়া হয়, পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না। এ-অবস্থা কবির পক্ষে সুখের নয়, পাঠকের পক্ষে মারাত্মক। আধুনিক বাঙালি পাঠক মাইকেলের রচনাবলী প'ড়ে এ-মীমাংসায় আসতে বাধ্য যে তাঁর নাটকাবলী অপাঠ্য এবং যে-কোনো শ্রেণীর রঙ্গালয়ে অভিনয়ের অযোগ্য, মেঘনাদবধ কাব্য নিষ্প্রাণ, তিনটি কি চারটি বাদ দিয়ে চতুর্দশ-পদাবলী বাগাড়ম্বর মাত্র, এমনকি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বীরাঙ্গনাকাব্যেও জীবনের কিঞ্চিৎ লক্ষণ দেখা যায় একমাত্র তারার উক্তিতে। ভাবতে অবাকই লাগে যে মাইকেলের ইংরেজি পত্রাবলীতে প্রাণশক্তির যে-প্রাচুর্য দেখি, যে তার সংক্রমণ প্রহসন দুটিতে ছাড়া আর-কোনো রচনাতেই নেই—এবং প্রহসন দুটিও সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ নাটক নয়, নবিশের কাঁচা হাতের কৃশাঙ্গ নকশা মাত্র, অনেকটাই তার ছেলেমানুষি। কিন্তু এ-সব কথা মুখ ফুটে কেউ কি কখনো বলেছে? কখনোই বলেনি, এত বড়ো অপবাদ বাঙালির ধীশক্তিকে দেবো

না, রবীন্দ্রনাথের একুশ বছর বয়সে লেখা মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা স্মরণীয়। ঐ প্রবন্ধের চিন্তাবিন্যাসে অপরিণত মনের পরিচয় আছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সত্য কথাই যে বলা হয়েছিলো তাতেও সন্দেহ নেই। অথচ রবীন্দ্রনাথও পরবর্তী জীবনে সে-প্রবন্ধ প্রত্যাহরণ ক'রে অন্য কোনো সুযোগে মাইকেলের স্তুতি করেছিলেন, বোধ করি পূর্বসূরীর প্রতি সৌজন্য প্রকাশের প্রথা অনুসারেই। রবীন্দ্রনাথের যৌবনের সমালোচনার বক্তব্য ছিলো এই যে মেঘনাদবধ কাব্য কবিত্বের কেরানিগিরি মাত্র, মাইকেল স্রেফ নকলনবিশি ছাড়া আর-কিছুই করেননি, এপিকের বিভিন্ন লক্ষণ প্রাচীন সাহিত্য থেকে জেনে নিয়ে অন্ধ অধ্যবসায়ে তার প্রত্যেকটি প্রয়োগ করেছেন : ভাবখানা এইরকম যেন 'এসো একটা এপিক লেখা যাক' ব'লে সরস্বতীর সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রে এপিক লিখতে ব'সে গেলেন।

বলা বাহুল্য, এ-সমালোচনা অক্ষরে-অক্ষরে সত্য। উত্তর-রবীন্দ্রের ভাষায় বলতে গেলে, মেঘনাদবধ কাব্য হ'য়ে-ওঠা পদার্থ নয়, একটা বানিয়ে-তোলা জিনিশ। আয়োজনের, আড়ম্বরের অভাব নেই, সাজসজ্জার ঘটাও খুব, কিন্তু সমস্ত জিনিশটা আগাগোড়াই মৃত, কোথাও আমাদের প্রাণে নাড়া দেয় না, হৃদয়ে আন্দোলন তোলে না। পুরোপুরি নয় না হোক, অন্তত পাঁচটা-ছ'টা রস মেপে-মেপে পরিবেশন করেছেন কবি, কিন্তু তাঁর বীর রসে উদ্দীপনা নেই, আদি রসে হৃৎস্পন্দন নেই ; তাঁর করুণ রসে দীর্ঘশ্বাস পড়ে না, এবং বীভৎস রস শুধুই বীভৎসতা। মহাকাব্যের কানুন সবই মেনেছেন তিনি, বড্ড বেশি মেনেছেন ; কখনো মিল্টন, কখনো বা হোমরকে স্মরণ ক'রে নিয়মরক্ষার জন্য তাঁর অবিরাম ব্যস্ততা : ফলে সমগ্র কাব্যটি হয়েছে যেন ছাঁচে-ঢালা কলে-তৈরি নির্দোষ নিষ্প্রাণ সামগ্রী ; দোকানের জানলার শোভা, ড্রয়িংরুমের অলংকরণ, কিন্তু অন্তঃপুরে অনধিকারী ; কিঞ্চিদধিক ছয় সহস্র পংক্তির মধ্যে দুটি চারটির বেশি খুঁজে পাওয়া যায় না, যা প'ড়ে মনে হয় কবি শুধু নিয়মমাফিক চলতে চাননি, কিছু বলতে চেয়েছিলেন।

তারুণ্যের সত্যভাষণ 'ভারতী'তে প্রকাশিত হবার পঁচিশ বছর পরে রবীন্দ্রনাথ অগ্রজ-নিন্দার প্রায়শ্চিত্তের চেষ্টা করলেন 'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধে।

ভারতীয় চিত্তবৃত্তির সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য চিন্তার শুভপ্রসূ মিলনের উদাহরণরূপে তিনি যে মেঘনাদবধ কাব্যকেই নির্বাচন করেছিলেন তার প্রকৃত কারণ কি এই নয় যে 'মানসী' বা 'সোনার তরী' বা 'কাহিনী'র উল্লেখ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিলো ?

মেঘনাদবধ কাব্যে কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনাপ্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই। এ পরিবর্তন আত্মবিস্মৃত নহে। ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে। কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙিয়াছেন এবং রামরাবণের সম্বন্ধে অনেকদিন হইতে আমাদের মনে যে একটা বাঁধাবাঁধি ভাব চলিয়া আসিয়াছে স্পর্ধাপূর্বক তাহারও শাসন ভাঙিয়াছেন। এই কাব্যে রামলক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ-ইন্দ্রজিৎ বড় হইয়া উঠিয়াছে। যে-ধর্মভীরুতা সর্বদাই কোনটা কতটুকু ভালো ও কতটুকু মন্দ তাহা কেবলই অতি সূক্ষ্মভাবে ওজন করিয়া চলে, তাহার ত্যাগ দৈন্য আত্মনিগ্রহ আধুনিক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির প্রচণ্ড লীলার মধ্যে আনন্দবোধ করিয়াছেন। ···যে-শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে তাহাকে যেন মনে-মনে অবজ্ঞা করিয়া, যে-শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলে পরাইয়া দিল।···

('সাহিত্যসৃষ্টি'—রবীন্দ্রনাথ)

রবীন্দ্রনাথ কি নিজেই জানতেন না যে তাঁর এই মন্তব্যে যাথার্থ্য নেই, আছে শুধু চলতি মতের পুনরুক্তি ? মাইকেল সম্বন্ধে যে-ক'টি প্রবাদ বাঙালির মনে বদ্ধমূল, তার মধ্যে এটাই প্রধান যে বাংলা সাহিত্যের ঝিমিয়ে-পড়া ধমনীতে পাশ্চাত্ত্য রক্ত সঞ্চার ক'রে তাকে উজ্জীবিত করেন তিনিই প্রথম। সত্যই যদি তা-ই হ'তো, তাহ'লে মাইকেলের অনতিপরে এবং তাঁরই প্রভাবে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উৎস খুলে যেতো, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষায় ব'সে থাকতো না। আমাদের আধুনিক সাহিত্যে মাইকেলের প্রভাব যে বলতে গেলে শূন্য, এমনকি মোহিতলালের প্রশংসনীয় উত্তম সত্ত্বেও তাঁর প্রবর্তিত

অমিত্রাক্ষর পর্যন্ত জাদুঘরের মূল্যবান নমুনা হ'য়েই রইলো, পূর্ব-পশ্চিমের মিলনসাধনায় তাঁর ব্যর্থতার এটাই প্রমাণ। বললে হয়তো কালাপাহাড়ি শোনায়, কিন্তু কথাটা একান্তই সত্য যে (বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য ভাব মাইকেল আনতে পারেননি, এনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ;) মাইকেলে আমরা শুধু পাই আকাঁড়া অনুকরণ (যার সবচেয়ে লোমহর্ষক দৃষ্টান্ত অষ্টম সর্গের নরকবর্ণনা), রবীন্দ্রনাথে পাই সসত্ত্ব অনুপ্রাণনা। শুধু জনরব দ্বারা চালিত না-হ'য়ে মনোযোগ দিয়ে মেঘনাদবধ কাব্য পড়লে আজকের দিনের যে-কোনো পাঠক বুঝবেন যে প্রকরণের অভিনবত্ব বাদ দিলে তাতে 'অপূর্ব পরিবর্তন' বা 'বিদ্রোহ' কিছুমাত্র নেই, বরং সে-গ্রন্থ দৃষ্টিহীন গতানুগতির একটি অনবদ্য উদাহরণ। শুধু প্রহসন দুটিতে ছাড়া অন্য সর্বত্রই এই অনম্য গতানুগতা মাইকেলের শক্তিকে পাংশু ক'রে দিয়েছে : নামে, পানাহারে, নিত্যকর্মে ও নিত্যকার ভাষায় প্রতিশ্রুত বিজাতীয় হওয়া সত্ত্বেও, কিংবা সেইজন্যই, তাঁর রচনায় যে-মন প্রকাশ পেয়েছে তা তৎকালীন লোকধর্মের সংকীর্ণ সংস্কারে আবদ্ধ। যদি তিনি ব্যাস-বাল্মীকির নৈষ্ঠিক অনুসরণ করতেন, তাহ'লেও সংস্কার-পাষাণের শাপমুক্তি হ'তো ; কিন্তু মূল পুরাণের কঠোর বাস্তবিকতা, কাশীরাম-কৃত্তিবাসের কৃপায় সেই যে লোকাচার-প্রচারে অধঃপতিত হ'লো, বাঙালির পক্ষে তার প্রভাব এড়ানো আজ পর্যন্ত দুঃসাধ্য, এবং তার নির্জীবক সংক্রাম থেকে মাইকেলের দুর্দান্ত বিলেতিপনাও তাঁকে বাঁচাতে পারেনি (হয়তো আদিকবির বিশ্বব্যাপী অনুকম্পা বর্তমান জগতে সম্ভবই নয়, আর তা-ই যদি হয়, তাহ'লে তো পুরাণের পুনর্জন্মই আধুনিক কবিকৃত্য, (দেশে-দেশে, যুগে-যুগে তা-ই ঘটেছে, (ইংরেজি সাহিত্যে চসার থেকে ইএটস পর্যন্ত, আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ থেকে···কোন পর্যন্ত তা আরো দু-চারশো বছর পরে কোনো সমালোচক বলতে পারবেন।) এখানে অনুধাবনযোগ্য এইটুকু যে আমাদের সাহিত্যে পুরাণের পুনর্জন্ম মাইকেল ঘটাননি, ঘটিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ : পুরাণ বা ইতিহাসের কাহিনীকে বর্তমান জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পারলে তবেই তা নিয়ে কাব্যরচনা সার্থক হয়, এবং এ-কাজ প্রাক্-রবীন্দ্র বাঙালি কবিদের মধ্যে কেউ পারেননি, কোনো-একজন কোনো-একটি রচনাতেও

না। বাংলা সাহিত্যে 'চিত্রাঙ্গদা' যে কত বড়ো যুগান্তকারী গ্রন্থ, সুদ্ধ সেইটে উপলব্ধি করবার জন্য, মাইকেল তো বটেই, উপরন্তু হেম-গিরিশচন্দ্রাদির সঙ্গেও কিছু প্রত্যক্ষ পরিচয় বাঞ্ছনীয়। আর অর্জুন-চিত্রাঙ্গদাই শুধু নয়, কর্ণ, গান্ধারী, দেবযানী, দুর্যোধন প্রত্যেককেই রবীন্দ্রনাথ নতুন ক'রে সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেকের মধ্যে আবিষ্কার করেছেন এমন মনোলোক, আদি-কবির কল্পলোকের ত্রিসীমানায় যা ছিলো না। এরা প্রত্যেকেই বর্তমানের অন্তর্গত, আধুনিক বিশ্ববাসীর স্বজাতি, এদের মুখের কথায় আমাদেরই জীবনের স্পন্দন আমরা শুনি। অসম্ভব হ'তো দুর্যোধনের জয়োল্লাস, গান্ধারীর পতিভর্ৎসনা, দেবযানীর প্রণয়সৌরভ, যদি-না কবি উনিশ শতকী পাশ্চাত্ত্য মনুষ্যধর্মে দীক্ষিত হতেন। রবীন্দ্রনাথের এ-সব কাব্য থেকে এই মহৎ শিক্ষাই আমাদের গ্রহণীয় যে চিরন্তনতা স্থাণুতার নামান্তর নয়, সাহিত্যে তাকেই চিরন্তন বলে যার মধ্যে অব্যক্ত ইঙ্গিতের পরিমণ্ডল সমস্ত ভবিষ্যৎকে আপন গর্ভে ধারণ করে, যুগে-যুগে অজাতের জন্মে, অব্যক্তের ব্যঞ্জনায় যার অপূর্ব রূপান্তর কখনোই শেষ হয় না। এই রূপান্তরের যাঁরা স্রষ্টা, বা যন্ত্র, তাঁরাও মহাকবি, এবং ভারতীয় সাহিত্যে কালিদাসের পরে এ-আখ্যা শুধু রবীন্দ্রনাথেরই প্রাপ্য। পুরাণের চিরন্তন চরিত্রগুলিকে রবীন্দ্রনাথ স্বকালের মুখপাত্র ক'রে তুলেছেন এমনভাবে যে তারা মহাভারতের অপভ্রংশ আর নেই, তাদেরও স্বাধীন সত্তা হয়েছে, তারা স্বতন্ত্ররূপেই জীবন্ত এবং গ্রহণযোগ্য।

আর মাইকেল? রাম-রাবণ সম্বন্ধে আমাদের মনে যে-একটা 'বাঁধাবাঁধি ভাব' আছে, সত্যি কি তার শাসন তিনি ভেঙেছেন? সত্যি কি তাঁর রচনায় রাম-লক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ-ইন্দ্রজিৎ বড়ো? সত্যি কি স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির প্রচণ্ড লীলায় তাঁর আনন্দ? না, এর কোনোটাই না। কেননা মুখে যদিও তিনি সদম্ভে বলেছেন, 'I despise Ram and his rabble', কার্যত তিনি ভীরুতায় তাঁর অবজ্ঞাভাজন রামেরই সমকক্ষ, প্রভেদ শুধু এই (এবং এ-প্রভেদ মাইকেলের পক্ষে সর্বনাশী) যে রাম ধর্মভীরু আর তিনি প্রথাভীরু। মিল্টন সম্বন্ধে একটা কথা আছে যে মনে-মনে তিনি শয়তানেরই সপক্ষে ছিলেন; বোধহয় সেইজন্যই মাইকেল স্থির

করেছিলেন যে রাবণের প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করা তাঁর কর্তব্য। কিন্তু তা তিনি করেছেন শুধু বচনের দ্বারাই, রচনার দ্বারা নয়; মেঘনাদবধ কাব্যের পদে-পদে দেখা যায় যে রাম-সীতার লোকশ্রুত মহিমায় কবি অভিভূত, এবং রাবণের দুশ্চরিত্রতার ধারণাও তাঁর মনে বদ্ধমূল। তা-ই যদি না হ'তো, তাহ'লে ঐ সুদীর্ঘ কাব্যে এই অদ্ভুত রহস্যময় প্রশ্ন উত্থাপিত না-হ'য়েই পারতো না যে রাবণ সীতাহরণ করেছিলেন কেন। সম্ভোগের জন্য? কিন্তু সম্ভোগ কোথায়? সীতাকে লঙ্কায় নিয়ে এসেই রাবণ যে তাঁকে একাকিনী অশোককাননে রেখে দিলেন, রাবণ-চরিত্রের এই মৌল দ্বন্দ্ব কারো চোখেই ধরা পড়েনি, যতদিন-না রবীন্দ্রনাথ সন্দীপের মুখ দিয়ে কথাটা বলিয়েছিলেন। এ-রকম অনুমান করতে বাধা নেই যে রাবণ সত্যিই সীতাকে ভালোবেসেছিলেন, আধুনিক অর্থে ভালোবেসেছিলেন,—তাহ'লেই রাবণের ব্যবহার আমাদের চোখে সংগত লাগে, এবং তাঁর চরিত্রে মহত্ত্বের সম্ভাবনাও আমরা দেখতে পাই। কিন্তু মাইকেলি কল্পনায় এ-অনুমানের আভাস-মাত্রও ছিলো না। বরং তিনি সেই চিরাচরিত জনরবকেই মেনে নিয়েছিলেন যে রাবণের সীতাহরণ তাঁর আত্মহত্যার উপলক্ষ্য এবং উপায় ছাড়া কিছু নয়, মনে-মনে তিনি রামেরই প্রেমিক, রামের হাতে মৃত্যুতেই তাঁর মোক্ষ। সেইজন্য মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রাবণের বীরত্ব একবারও উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটলো না; পৌনঃপুনিক দীর্ঘশ্বাস এবং অশ্রুমোচনের ফাঁকে-ফাঁকে তিনি আস্ফালন করেন বটে, কিন্তু তাঁর মুখ দিয়ে প্রকৃত শক্তিমত্তার এ-রকম কোনো কথা কখনোই বেরোলো না, যেমন:

সুখ চাহি নাই মহারাজ।
জয়, জয় চেয়েছিনু, জয়ী আমি আজ।
ক্ষুদ্র সুখে ভরে নাকো ক্ষত্রিয়ের ক্ষুধা
কুরুপতি,—দীপ্তজ্বালা অগ্নিঢালা সুধা
জয়রস—ঈর্ষাসিন্ধুমন্থনসঞ্জাত—
সদ্য করিয়াছি পান,—সুখী নহি, তাত,
অদ্য আমি জয়ী।

মাইকেলের রাবণ প্রথম থেকেই জানেন যে তাঁর সর্বনাশ অবধারিত, সেটা উদ্দীপনার অনুকূল নয়, তবু সেটাকে আশ্রয় ক'রেই রাবণ সেই মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারতেন, যে-মহিমা ট্র্যাজেডির পুণ্যফল। কিন্তু ট্র্যাজেডির তপস্যা মাইকেলের পক্ষে অসম্ভব ছিলো ব'লে তিনি আমাদের শুনিয়েছেন শুধু রক্ষোরাজের মনস্তাপ, পরাজয় নিশ্চিত জেনেও যে যুদ্ধ ক'রে যাচ্ছে তার মহিমা মূর্ত করতে পারেননি, যা রবীন্দ্রনাথ করেছেন কর্ণের মুখের একটি কথায় :

যে-পক্ষের পরাজয়
সে-পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোরো না আহ্বান।

সত্যি বলতে, রাবণের মহত্ত্বের সম্ভাবনা মাইকেল অন্ধভাবে উপেক্ষা ক'রে গেছেন, আবার প্রতিপক্ষের দুর্বলতাও কিছুমাত্র প্রকাশ করতে পারেননি। শূর্পণখার প্রতি লক্ষ্মণের আচরণ যে অপৌরুষেয়, বালীবধ যে ধিক্কার-যোগ্য, রামচন্দ্র যে কূটনীতিতে শ্রেষ্ঠ ব'লেই রাবণকে হারাতে পারলেন, 'ভিখারী রাঘবে'র বিরুদ্ধে এতগুলি অস্ত্র পেয়েও মাইকেল ব্যবহার করেননি ; এমনকি, মেঘনাদের হত্যাকাণ্ডের নিষ্ঠুর অন্যায়টাকেও অনায়াসে আমাদের মন থেকে মুছে দিলেন স্বর্গের সমস্ত দেবতাদের রামানুরাগ প্রকাশ ক'রে। রবীন্দ্রনাথের এ-কথাও গ্রাহ্য নয় যে নাস্তিক শক্তির স্পর্ধাকেই কাব্যলক্ষ্মী বিদায়কালে মালা পরিয়ে দিলেন ; কেননা শেষ পর্যন্ত আমরা তো এই দেখলাম যে মেঘনাদ-প্রমীলা পাশাপাশি ব'সে রথে চ'ড়ে স্বর্গে গেলেন, আর মৃত্যুর পরে এতই যদি সুখ তাহ'লে আর মৃত ব্যক্তির জন্য শোক করবো কেন, আর রাবণের জন্যই বা দুঃখ কিসের। এদিকে লক্ষ্মণ যখন ম'রেও বাঁচলো, তখনই জানলাম যে রাবণের চিতা জ্বলতে আর দেরি নেই, কিন্তু সেই অনির্বাণ আগুনও আমাদের মনকে ছুঁতে পারলো না, কেননা, ততক্ষণে দেব-দেবীদের কথাবার্তা শুনে আমরা বুঝে নিয়েছি যে রাম ভালোমানুষ আর রাবণটা বদমাশ।

২

রবীন্দ্রনাথের পরে মাইকেল সম্বন্ধে বিচক্ষণ মন্তব্য করেছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। বাঙালি সমালোচকদের মধ্যে তিনিই যেমন এই সুস্পষ্ট সত্যটা সাহস ক'রে উচ্চারণ করেছেন যে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য 'সাধারণত অপাঠ্য', তেমনি এ-কথা বলতেও ভয় পাননি যে মাইকেল 'বাংলা ভাষাকে ভালবাসতেন বটে, কিন্তু তার প্রকৃতি বুঝতেন না ; তাই তিনি বঙ্গভারতীর সেবক মাত্র, তার ত্রাণকর্তা নন।' আমিও একবার বলেছিলুম, মাইকেল বাংলা জানতেন না। বাংলা জানতেন না, এটা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি শোনায়,* সত্য কথাটা এই যে বাংলা মাইকেলের মাতৃভাষা হ'লেও আবাল্য তিনি তাকে অবজ্ঞাই করেছেন, কখনো তার মর্মে প্রবেশ করেননি। সেই অবজ্ঞা হঠাৎ যখন জিগীষায় পরিণত হ'লো, তখন যে আশ্চর্যরকম অত্যল্প সময়ে সেই সংকল্প কার্যত সমাধা ক'রে ফেললেন, এটা নিয়ে তাঁকে আমরা অপরিসীম বাহবা দিয়ে এসেছি। বাহবার যোগ্য কাজ সন্দেহ নেই, রীতিমতো তাক-লাগানো, হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকবার মতো, কিন্তু মাইকেলের এই বঙ্গভাষাবিজয়ে জেদ যতটা ছিলো, সাধনা ততটা ছিলো না, শক্তির দৌরাত্ম্য যতটা ছিলো প্রেমের দৌত্য ততটা ছিলো না। এ যেন রাবণের সীতাহরণের মতোই ব্যাপার, একেবারে ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নেয়া হ'লো বটে, কিন্তু 'একেই কি বলে পাওয়া'? আবাল্য নিরন্তর ব্যবহার এবং অনুশীলনের ফলে ভাষার সঙ্গে যে-অন্তরঙ্গতা জন্মায়, তার অবকাশ মাইকেলের জীবনে ঘটতে পারেনি ; বাংলা ভাষার অবয়বের অধ্যয়নেই কাটলো তাঁর অতি হ্রস্ব সাহিত্যিক জীবন, তার প্রাণের সন্ধান

* এই প্রবন্ধ প্রথম লেখা হবার কয়েক বছর পর আমি জানলাম যে রবীন্দ্রনাথ একবার মৌখিক আলাপে এতটা বলেছিলেন যে মাইকেলি বাংলা বাংলাই নয়।

'"He was nothing of a Bengali scholar," said Rabindranath once, when we were discussing the *Meghanadbadh;* "he just got a dictionary and looked out all the sounding words. He had great power over words. But his style has not been repeated. It isn't Bengali." '—*Rabindranath Tagore by Edward Thompson.* 2nd Ed , 1948, page 16.

পেলেন না, কিংবা প্রাণের প্রান্তে আসতে-আসতেই মৃত্যু দিলো ছেদ টেনে। এইজন্যই তাঁর প্রায় সমস্ত রচনাতে কলাকৌশল যেন কলকজার মতো কাজ করে; এইজন্যই তাঁর অনুপ্রাস শিশুতোষ, উপমা দ্যুতিহীন, পুনরুক্তি ক্লান্তিকর। তাঁর সমস্ত পদ্যরচনার অভিশাপ ভাষার সেই জীবন-বিমুখ সুদূরতা, ইংরেজিতে যাকে বলে পোয়েটিক ডিকশন। মিল্টনের অনুসরণ ছিলো তাঁর প্রতিজ্ঞা, কিন্তু কার্যত তিনি পোপের খপ্পরেই পড়েছিলেন। পোপের রীতিতে প্যারাডাইস লস্ট লেখবার শ্রেষ্ঠ ফল যা হ'তে পারে, অমিত্রাক্ষর সত্ত্বেও মেঘনাদবধকাব্য তা-ই। পোপের যে-সমালোচনা ওঅর্ডস্বর্থ করেছিলেন তার মধ্যে এই কথাটা একেবারেই অকাট্য যে পোপ চোখে দেখে লিখতেন না—"did not write with his eye on the object." মাইকেল সম্বন্ধে হুবহু সেই কথা। মাইকেল শুধু ভাষার আওয়াজ শুনতেন—আর আওয়াজটাও খুব কড়া রকমের হওয়া চাই—তার ছবিটা দেখতেন না, ইঙ্গিতের বিচ্ছুরণ অনুভব করতেন না। সংস্কৃতে একই বস্তুর অনেকগুলি নাম ব্যবহার করবার রীতি ছিলো, অ্যাংলো-স্যাক্সন ভাষাতেও তা-ই, কিন্তু সে-কথাগুলি পরস্পরের অবিকল প্রতিশব্দ নয়, প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র অর্থবহ, প্রত্যেকটিই একটি প্রচ্ছন্ন উপমা। অ্যাংলো-স্যাক্সন কবি সমুদ্রকে বলেছেন তিমি-পথ, বলা বাহুল্য সেটা সমুদ্র কথার প্রতিশব্দ মাত্র নয়, সমুদ্রের বিশেষ-একটি রূপের বর্ণনা। কালিদাসের যক্ষ মেঘকে ডাকছেন কখনো জলদ, কখনো সৌম্য বা সাধু, কখনো বা আয়ুষ্মান; এগুলিও মেঘের ভিন্ন-ভিন্ন রূপের, এবং সেই সঙ্গে মেঘ সম্বন্ধে যক্ষের অনুভূতির অভিজ্ঞান। সংস্কৃতে বিশেষ্য-পদ মাত্রেরই কয়েকটি সেবক দেখতে পাই, যাদের বলা যায় বিশেষ্য-বিশেষণ; সেই শব্দসম্ভারের যে-অংশ লুপ্ত হ'য়ে যায়নি বাংলায় তা এসে পৌঁচেছে নিতান্তই প্রতিশব্দরূপে, আর প্রতিশব্দ মাত্রেই অতিশব্দ; অর্থাৎ হর্যক্ষ শোনামাত্র যদি সিংহের হলুদ চোখ দেখতে না পেলাম, তাহ'লে সিংহকে হর্যক্ষ বলা শুধু অনর্থক নয়, রুগ্নতার লক্ষণ। বিশেষ অর্থটি যেখানে ফুটলো না, কিংবা বিশেষ অর্থটির প্রয়োজনই নেই, সেখানে ঐ সব শব্দ জড়পিণ্ডের মতো কাব্যের কণ্ঠরোধ করে। বারীন্দ্র বা সুধাংশু বললে সমুদ্র বা চাঁদের ছবি আমাদের মনে জেগে

ওঠে না, বরং সঙ্গে-সঙ্গেই বাবু উপাধিধারী বঙ্গীয় ভদ্রলোককে মনে পড়ে। 'যাদঃপতিরোধ যথা চলোর্মি-আঘাতে' আওয়াজ দিচ্ছে জমকালো, কিন্তু এ-ধ্বনির কোনো অনুষঙ্গ নেই, কোনো উদ্বোধনী শক্তি নেই, কোনো স্মৃতি, কোনো স্বপ্ন, কোনো মনোলীন নামহীন অভিজ্ঞতাকে এ ডেকে আনে না, একটু কষ্ট ক'রে শাদা মানেটা বুঝে নিলেই ফুরিয়ে গেলো। মৃত শব্দরাজিতে আকীর্ণ ব'লেই মাইকেলি কলরোল আমাদের কানেই শুধু পৌঁছয়, কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশে না, এবং দেবভাষা তাঁর ক্ষেত্রে ভাষা-দানব হ'য়ে উঠেছিলো ব'লে তিনি তাকে সামলাতেই নিরন্তর ব্যস্ত ছিলেন, কখনোই চোখে দেখে লিখতে পারেননি। মাইকেলের সযত্ন-সজ্জিত সমস্ত বর্ণনা তাই তো কেবল সহস্রাক্ষ ছাপার অক্ষরে মুখের দিকেই তাকিয়ে থাকে, কোনো-একটিও বাসা বাঁধতে পারে না মনের মধ্যে।

শুধু যে বাংলাভাষার প্রকৃতি বোঝেননি তা নয়, সাহিত্যের আদর্শ নির্বাচনেও মাইকেল ভুল করেছিলেন। পাশ্চাত্ত্য ভাষায় পণ্ডিত হ'য়েও এ-কথাটা তাঁর উপলব্ধির অনায়ত্ত ছিলো যে আধুনিক কালে এপিকের জায়গা নিয়েছে গদ্য-উপন্যাস। তরুণ রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধ কাব্যকে পদ্য-উপন্যাস ব'লে তার জাতিনির্ণয় ঠিকই করেছিলেন: তিনি বুঝেছিলেন যে প্রকৃত এপিক পৃথিবীতে দুটি কি তিনটিমাত্র আছে, পরবর্তী কাব্য-কাহিনীগুলি নামত মহাকাব্য হ'লেও আসলে পদ্য-উপন্যাস, রঘুবংশও তা-ই, ক্যান্টরবরি টেলসও তা-ই, এমনকি প্যারাডাইস লস্টও তা-ই। কিন্তু মাইকেলের ধারণায় মহাকবিমাত্রেই মহাকাব্যের লেখক ছিলেন ব'লে তিনি মহাকাব্য লিখতে তো পারলেনই না, উপরন্তু মহৎ পদ্য-উপন্যাস লিখে মহাকবির মর্যাদালাভও সম্ভব হ'লো না তাঁর পক্ষে। যদি তিনি ভেবে দেখতেন, কেন প্যারাডাইস লস্টের পরেই ইংরেজি ভাষার উল্লেখযোগ্য 'মহাকাব্য' পিত্তপ্রবণ 'ডানসিয়াড', যদি ভেবে দেখতেন তাঁর উপাস্য মিল্টন আর উপহাস্য পোপে সত্যিকার প্রভেদটা কোথায়, তাহ'লে হয়তো অনেক পণ্ডশ্রম তাঁর বেঁচে যেতো। যদিও অনেকগুলি ভাষা শিখে-ছিলেন এবং পড়েছিলেন বিস্তর, তবু এ-কথা মনে করতে পারি না যে তিনি ঠিকমতো পড়াশুনো করেছিলেন কিংবা পড়াশুনোকে ঠিকমতো

কাজে লাগাতে পেরেছিলেন। তাঁর পত্রাবলী মিণ্টন-ভজনায় উচ্ছল, কিন্তু শেক্সপিয়র সম্বন্ধে (এমনকি নাটকের প্রসঙ্গেও) তিনি স্বল্পভাষী; বায়রনকে তিনি কিঞ্চিৎ আমল দেন, কিন্তু কীটস, যাঁর সঙ্গে মিণ্টনের আত্মীয়তা সুস্পষ্ট, কীটসের নামও মুখে আনেন না। দান্তে, হ্যুগো, টেনিসনকে লক্ষ্য ক'রে যে-সব সনেট লিখেছেন তাতে উদ্দিষ্ট কবিদের বিশিষ্টতা কিছুই প্রকাশ পায়নি, প্রশস্তির মুখস্থ-পাঠে সকলকেই এক মনে হয়। এ থেকে এমন নিদারুণ সন্দেহও মনে উঁকি দেয় যে মাইকেল বিদ্যার অনুধাবন করলেও রুচি অর্জন করেননি: এবং সেই থেকে মনে এ-চিন্তার উদয় হয় যে বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রভূত শক্তির প্রভূত অপব্যয়ের হেতু কি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যা বলেছেন তা-ই, অর্থাৎ চারিত্রগুণের অনটন, না কি রুচির অনিশ্চয়তা।

তাছাড়া, চারিত্র বা রুচির ন্যূনতা সিদ্ধির অনতিক্রম্য অন্তরায় হয়তো হ'তো না, যদি মাইকেল কোনো বিশ্বাসের বিশ্বস্তর আশ্রয় পেতেন। যে-বিশ্বাসের জোরে দান্তের নরক প্রভাবে অলৌকিক হ'য়েও প্রাকৃতপন্থী উপন্যাসের মতো, এমনকি চলচ্চিত্রের মতো, প্রত্যক্ষ, যে-বিশ্বাসের জোরে মিণ্টন বাইবেলের রূপকথা নিয়ে অন্তত্পক্ষে স্মরণীয় কাব্য বানাতে পেরেছিলেন, তার কিছু অংশও যদি মাইকেলের থাকতো তাহ'লে তাঁর কাব্যের রূপ-প্রতিমায় প্রাণসঞ্চার না-হ'য়েই পারতো না। বাংলা সাহিত্যের এটাই বোধহয় শোচনীয়তম দুর্ঘটনা যে মধুসূদন দত্ত কোনো ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করতে পারলেন না, না স্বজাতীয়, না বিজাতীয়; যখন তিনি রাম-রাবণের যুদ্ধ নিয়ে কাব্যরচনায় লিপ্ত, তখনও এ-কথা ভেবে তাঁর আত্মপ্রসাদ যে তিনি একজন "জলি ক্রিস্টিয়ান ইউথ", হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি সূচ্যগ্র অনুকম্পা তাঁর নেই, ভাবখানা এইরকম যেন লক্ষ্মণ মেঘনাদ সীতা প্রমীলাকে নিয়ে তিনি লেখা-লেখা খেলা করছেন বটে, কিন্তু সত্যি-সত্যি তাঁর জীবনে তারা কিছুই এসে যায় না। পক্ষান্তরে, জন্মদোষে খৃস্টান ঐতিহ্যকে এতখানি শোষণ ক'রে নেবার সম্ভাবনাই তাঁর ছিলো না যাতে কাব্যের প্রেরণা সে-অঞ্চল থেকে আসতে পারে; মুহর্‌রমের কাহিনী নিয়ে কাব্যরচনার কথাও তাঁর মনে এসেছে, কিন্তু কোনো খৃস্টান প্রসঙ্গের উল্লেখ তাঁর পত্রাবলীতে পাওয়া যায় না। ঐতিহ্যকে বাড়াতে কি বদলাতে হ'লে, যতটা আছে তাকে

প্রথমে অধিকার করা চাই, আর ঐতিহ্য যখন বাড়েও না, বদলায়ও না, তখনই তার অধঃপাত ঘটে প্রথার অন্ধকূপে। মাইকেল কোনো ঐতিহ্যকে পাননি ব'লেই তাঁকে অসহায় আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিলো প্রথার হাতে; তাই তাঁর রাম লক্ষ্মণ সীতা, কিংবা রাবণ মেঘনাদ প্রমীলা, কেউ জীবন্ত নয়, তাই এতগুলি কাব্যে ও নাটকে একটিও চরিত্রসৃষ্টি তিনি করতে পারেননি, তাই তাঁর নরকে দুঃখের অগ্নিশুদ্ধি নেই, আছে শুধু ন্যক্কার, স্বর্গে নেই সৌন্দর্যের অমরতা, শুধু আছে হস্তলিপি-পুস্তিকার নীতিকথা। (স্বর্গে সতীদের জন্য শুধু মনোরম প্রমোদ-কানন নয়, অপরিমিত চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয়ের ব্যবস্থা করতেও তিনি ভোলেননি!) বীরাঙ্গনা কাব্য আকারে-প্রকারে অনেকটা অগ্রসর, কিন্তু তারার খেদোক্তির আরম্ভ প'ড়ে মনে যে-আশা জাগে, তা চূর্ণ হ'তে বেশি দেরি হয় না, এবং কাব্যটি আদ্যন্ত প'ড়ে ওঠার আগেই আমরা উপলব্ধি করি যে গ্রন্থটির নামকরণেই ভুল হয়েছে, বীরত্বের কোনো চিহ্ন এতে নেই, নারীত্বের বিদ্রোহী কোনো ধারণা নেই, এই তথাকথিত বীরাঙ্গনারা সকলেই আসলে পতিদেবতার অশ্রুসর্বস্ব সেবাদাসী, শূর্পণখা বা তারাও এর ব্যতিক্রম নয়, কেননা তাদের প্রণয় পরকীয়া হ'লেও মনোভাব প্রেমিকার নয়, শাস্ত্রসম্মত পতিবিরহিণীর। অবশ্য পড়তে-পড়তে আমরা ভুলেই যাই কে তারা আর কে দ্রৌপদী, কে শূর্পণখা আর কে-ই বা শকুন্তলা, সকলেই এক কথা বলছে, এবং সকলের কথাই একই রকম চিরাচরিত প্রথার দ্বারা নির্দিষ্ট। ব্রজাঙ্গনার প্রেমলীলা এবং চতুর্দশপদীর দেশপ্রেম আর প্রকৃতিবর্ণনাও—সেই এক কথাই বলতে হয়—গতানুগতিকতারই পরাকাষ্ঠা, নাটক ক-খানাও তা-ই, উজ্জ্বল প্রহসন দুটির পরিসমাপ্তিও এর ব্যতিক্রম নয়।

৩

তবু এ-কথা মানতেই হবে যে মাইকেল শক্তিধর পুরুষ, বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম প্রধান। কিন্তু তাঁর প্রাধান্যের স্বরূপ বুঝতে হবে, তবে তো তাঁকে আমরা নিজেদের কাজে লাগাতে পারবো। জীবদ্দশায় দেশব্যাপী জয়-

জয়কার সত্ত্বেও তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে কেউ-কেউ বুঝেছিলেন যে বিদ্যাধরমাত্রেই সিদ্ধপুরুষ নন। রাজনারায়ণ বসুর বন্ধুতা বা বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব তাঁদের সমালোচক-দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেনি ; অভিনেতা কেশব গাঙ্গুলি পর্যন্ত দত্তজর নাট্যপ্রতিভা সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু এমন একটি কাণ্ড মাইকেল করেছিলেন যার সামনে কোনো সন্দেহ টিঁকলো না, কোনো আপত্তি দাঁড়াতে পারলো না। সকলেই জানেন যে সেটি তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দের উদ্ভাবনা। এ-উদ্ভাবনা যে ঠিক কী-কারণে মাইকেলকে অক্ষয় যশের অধিকারী করলো তা অবশ্য তাঁর সমসাময়িকেরা স্পষ্ট বোঝেননি, তাঁরা ভেবেছিলেন যে মিল-বর্জনটাই খুব বড়ো কথা। ঐ মিল বস্তুটিকে একটু তলিয়ে দেখলেই এই ভুল ধারণা ভাঙতে পারে। যাকে আমরা মিল বলি আসলে তা তো অনুপ্রাসেরই রকমফের, এবং কোনো-না-কোনো শ্রেণীর অনুপ্রাস পদ্য-গদ্য লিখিত-কথিত সর্বপ্রকার ভাষার মর্মমূলে প্রোথিত। মিলের, অর্থাৎ পদান্ত অনুপ্রাসের অভাব মেটাতে গিয়ে মাইকেল যে-ধরনের বাক্‌বাদনের সাহায্য নিয়েছিলেন তাতে সরস্বতীর হাড়ে বাতাস লাগেনি, ধ্বনিগাম্ভীর্যের তাগিদে জাজ্বল্যমান 'টটলজি'র শরণ নিয়েছিলেন তিনি ; একই শব্দের পুনরুক্তিদোষে তাঁর রচনা ভারাক্রান্ত ; * তাছাড়া 'কড়মড়মড়ে' 'ঝক ঝক ঝকে' ইত্যাদি বালভাষিত

* যেমন :

ভূষিতে মৃণালভুজ সুমৃণালভুজা ;

কোমল কণ্ঠে স্বর্ণকণ্ঠমালা
ব্যথিল কোমল কণ্ঠ !

প্রবল পবন বলে বলীন্দ্র পাবনি

রঞ্জিত রঞ্জনরাগে, কুসুম-অঞ্জলি
আবৃত, পুড়িছে ধূপ ধূমি ধূপদামে ;

ইত্যাদি। 'রঞ্জিত রঞ্জনরাগে,' অর্থাৎ কিনা 'রঙের রঙে রাঙানো !'

পদাবলীরও তাতে অভাব নেই। মিলের কথাটা তাই বড়ো কথা নয় : মাইকেলের যতিস্থাপনের বৈচিত্র্যই বাংলা ছন্দের ভূত-ঝাড়ানো জাদুমন্ত্র। কী অসহ্য ছিলো 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল'-র একঘেয়েমি, আর তার পাশে কী আশ্চর্য মাইকেলের যথেচ্ছ-যতির উর্মিলতা। অবশ্য এ-বিষয়ে সমসাময়িক আলোচনা কম হয়নি; কিন্তু যতিপাতের এই বৈচিত্র্যের সঙ্গে-সঙ্গেই যে ছন্দে প্রবহমাণতা এসে অন্তহীন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিলো এ-কথাটা তৎকালীন অনুসন্ধানীর দৃষ্টিগোচর হয়নি, হেমচন্দ্রের না, মাইকেলের নিজেরও না। প্রকৃতপক্ষে, অন্য কোনো কারণে যদি না-ও হয়, শুধু বাংলা ছন্দে প্রবহমাণতার জনক ব'লেই মাইকেল উত্তরপুরুষের প্রাতঃস্মরণীয়, এবং যদি মিলহীনতার দিকে অত্যন্ত বেশি জোর না-দিয়ে তাঁর সহজীবীরা প্রবহমাণতার তত্ত্বটা আবিষ্কার করতেন, তাহ'লে শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শ বহুপূর্বেই স্বতঃসিদ্ধ হ'তো যে এ-ছন্দের যথার্থ নামকরণ অমিত্রাক্ষর নয়, অমিতাক্ষর।

কিন্তু মাইকেলি অমিত্রাক্ষর বাংলা ছন্দের নবজন্মের যবনিকা-উত্তোলক মাত্র, আসল পালা আরম্ভ হ'লো রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। মাইকেলের যে-কোনো কাব্যের যে-কোনো অংশের সঙ্গে মানসীর 'নিষ্ফল কামনা'র অমিত্রাক্ষরের তুলনা করলে দুয়ের মধ্যে ব্যবধান অন্তত একশো বছরের মনে হয়। কী-উপায়ে রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসকে চৌদুনে চালিয়েছিলেন সে-বিষয়ে নানা মুনির নানা মত হ'তে পারে, কিন্তু এ-কথা নিশ্চিত যে মাইকেলের তাতে কোনো হাত ছিলো না। এটা উল্লেখযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথের কিশোর রচনায় হেমচন্দ্রের প্রভাব পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু মধুচক্রের মক্ষিকাবৃত্তির চিহ্নমাত্র নেই, তাঁর জন্মের অব্যবহিত পূর্বে মধুসূদন যদি যবনিকা উত্তোলন না-ও করতেন, তবু রবীন্দ্রনাথের পালা যখন এবং যে-ভাবে আরম্ভ হবার ঠিক তা-ই হ'তো। আসল কথা, বাংলা ভাষার প্রাণের ছন্দের সঙ্গে মাইকেল তাঁর অমিত্রছন্দকে মেলাতে পারেননি, তাই তাতে শুধু আন্দোলন আছে, স্বাচ্ছন্দ্য নেই; বেগ আছে প্রবল, কিন্তু গতির অনিবার্যতা নেই; এ যেন নদী নয়, আবর্ত, সেখানে নৌকো ভাসালে ডুবে যদি না মরি তাহ'লে নিরাপদেই ঘরে ফিরবো,

কেননা অলক্ষ্যে অসীমের দিকে তা টেনে নিয়ে যায় না। আমি বলতে চাই, মাইকেল পড়বার পর পুরোনো জীবনের নিশ্চিন্ত পুনরাবৃত্তি সম্ভব, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সুর একবার যার প্রাণে লেগেছে, জীবনের মতো অন্য মানুষ হ'য়ে গেছে সে। মাইকেল পড়া না-পড়ায় শিক্ষার তারতম্য ঘটে; রবীন্দ্রনাথ পড়া না-পড়ায় জন্ম-জন্মান্তরের ব্যবধান।

আমি ভুলিনি যে মাইকেল পুরোমাত্রায় সচেতন শিল্পী। শুধু যে বাংলা ছন্দে যুক্তবর্ণের পরম রহস্যের তিনি আবিষ্কর্তা তা নয়; বাংলা স্বর-ব্যঞ্জনের ফলদ প্রয়োগ সম্বন্ধেও অবহিত ছিলেন ব'লেই

আইলা তারাকুন্তলা, শশী সহ হাসি
শর্বরী; বহিল চারি দিকে গন্ধবহ

তাঁকে তৃপ্ত করতে পারেনি,

আইলা সুচারু তারা, শশী সহ হাসি
শর্বরী, সুগন্ধবহ বহিলা চৌদিকে

লিখে সূক্ষ্মতর ধ্বনিসন্ধানের পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু যে-কোনো কাজ সর্বপ্রথম করতে গেলে তাতে আতিশয্য প্রায় অরোধ্য: প্রথম কথা-বলা সিনেমায় যেমন সমস্তটাই ছিলো নিছক চ্যাচামেচি, তেমনি মাইকেলও যুক্তবর্ণের আশ্চর্য যন্ত্রটি প্রথম হাতে পেয়ে হৈ-চৈ আর ধ্বনিসৌষম্যের প্রভেদ ভুলেছিলেন। তা না-হ'লে অমিত্রাক্ষরের এই পূজারি মার্লো শেক্সপিয়র ওএবস্টরকে অবহেলা করতেন না, অন্ততপক্ষে তাঁর উপাস্য মিল্টনের অনুকরণে একই যন্ত্র থেকে তূরী-নির্ঘোষ আর সেতারের মীড় বের করার চেষ্টা করতেন। মাইকেলের ছন্দের প্রধান দোষ এই যে সেটা আগাগোড়াই অত্যন্ত বেশি কড়া, তাতে নিচু গলা কখনো শুনি না, নরম সুর কখনো বাজে না; সেটা কোনোখানেই গান নয়, সমস্তটাই বক্তৃতা। মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গে সীতা সরমার সম্মিলিত ক্রন্দন, আর পঞ্চম সর্গে—

ইন্দ্রাণীর কর-পদ্ম ধরিয়া কৌতুকে
প্রবেশিলা মহা-ইন্দ্র শয়ন-মন্দিরে—
সুখালয়! চিত্রলেখা, উর্বশী, মেনকা,
রম্ভা, নিজ গৃহে সবে পশিলা সত্বরে।
খুলিয়া নূপুর কাঞ্চী, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী
আর যত আভরণ; খুলিয়া কাঁচলি,
শুইলা ফুল-শয়নে সৌর-কর-রাশি-
রূপিণী সুর-সুন্দরী। সুস্বনে বহিল
পরিমলময় বায়ু, কভু বা অলকে,
কভু উচ্চ কুচে, কভু ইন্দু নিভাননে
করি কেলি, মত্ত যথা মধুকর, যবে
প্রফুল্লিত ফুলে অলি পায় বন-স্থলে!

—ইন্দ্র-দম্পতীর বাসরশয্যার এই বর্ণনা, এ-সব অংশ মনে হয় যত অলংকৃত ততই দরিদ্র—এতে আড়ম্বর আছে, আয়োজন প্রচুর, কিন্তু প্রাণ নেই, সাড়া তোলে না। এর কারণ শুধু ওঅর্ডস্বর্থ-উল্লিখিত প্রত্যক্ষদৃষ্টির অভাবই নয়, এর জন্য উপরন্তু দায়ী এই অমিত্রাক্ষরের প্রকৃতি। মাইকেলের ছন্দ ঢাকের বাদ্যির মতো, তাতে জোর আওয়াজ, কিন্তু রেশ নেই। মেঘনাদি ডঙ্কানাদে তাই আগামীর আগমনী বাজলো না, তা নির্বীজ ঐশ্বর্যের উদাহরণ হ'য়েই থাকলো, এবং রবীন্দ্রনাথ যখন আমাদের ভাষা-পাষাণীর ঘুম ভাঙালেন, তখন দেখা গেলো ছন্দের প্রবহমাণতার সঙ্গে মিলের কোনো মৌল বিরোধ নেই, বরং প্রবহমাণতাই সেই শক্তি যাতে পদে-পদে মিল দিয়েও মিল লুকিয়ে রাখা সম্ভব হয়, আর সেই সঙ্গে এ-কথাও আমরা বুঝলাম যে যতিপাতের স্বৈরিতা শ্বাসনালীর চমকপ্রদ ব্যায়াম নয়, তার আসল কাজ কাব্য-ভাষার সঙ্গে কথ্য ভাষার ঘটকালি।

অবশ্য মাইকেলও মনে-মনে অনুভব করেছিলেন যে যতির যদৃচ্ছতা দরজা দিয়ে ঢুকলেই মিলের ঝাঁক জানলা দিয়ে উড়ে পলায় না, শুধু তা-ই নয়, মিল-সংস্থাপনের পাশ্চাত্ত্য বৈচিত্র্য প্রবহমাণতার স্বাধীনতাই দাবি

করে ;—নয়তো সনেট-গুচ্ছ তিনি লিখেছিলেন কেমন ক'রে। উপরন্তু, তাঁর পত্রাবলী প'ড়ে বোঝা যায় যে গদ্যের ভূভারতের সঙ্গে কাব্যের স্বর্ণলঙ্কার সেতুবন্ধই ছিলো তাঁর অচেতন প্রয়াস, এবং সেই অসম্পূর্ণ, অব্যবহার্য, পরিত্যক্ত সেতুরই আমরা নাম দিয়েছি মাইকেলি অমিত্রাক্ষর। যদিও রবীন্দ্রনাথের কোনো কীর্তির পক্ষেই মাইকেলের অগ্রগামিতা অপরিহার্য নয়, তবু এ-কথাও সত্য যে অনুজ যা-কিছু করেছেন তার কোনো-কোনো অংশ অগ্রজকে দিয়েও সাধিত হ'তে পারতো, যদি তিনি সুস্থ মনে দীর্ঘজীবী হতেন। শুধু যে তথাকথিত অমিত্রাক্ষরকে সত্যিকার সফলতায় পৌঁছিয়ে দিতে পারতেন তা নয়, যাকে আমরা আজকাল বলি তিনমাত্রার ছন্দ, বা মাত্রাবৃত্ত, তাও তাঁর মনে উঁকিঝুঁকি দিয়েছিলো, * এবং সবচেয়ে বড়ো কথা, কাব্যে যে-গুণ তাঁর কখনো বর্তায়নি, সেই স্বাচ্ছন্দ্যকে অর্জন করেছিলেন গদ্য-মহাদেশের দুই বিপরীত সীমান্তপ্রদেশে। প্রহসন দুটির প্রাণপূর্ণ সংলাপ প'ড়ে যেমন মনে হয় যে পদ্মাবতী কৃষ্ণকুমারীকে নিয়ে পণ্ডশ্রম না-ক'রে ব্যঙ্গবিদ্রূপের লীলা-খেলায় নামলেই তাঁর প্রতিভার ধর্মরক্ষা হ'তো, তেমনি আবার হেক্টর-বধের উদার, গম্ভীর গদ্য প'ড়ে বলতে লোভ হয় যে দৈবাৎ গদ্যকাহিনীতে হাত দিলে ইনিই হতেন বাংলা উপন্যাসের স্রষ্টা—অন্তত, আদ্যন্ত হোমর অনুবাদ ক'রে উঠতে পারলেও সে-গ্রন্থ যে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের মতোই বাঙালির একটি রত্নখনি হ'তো তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে মাইকেল আমাদের হতভাগ্যতম কবি, ব্যস্ত, উদ্ধত, অব্যবস্থিত উৎসাহে

* যেমন :

কেনে এত ফুল তুলিলি, স্বজনি—
ভরিয়া ডালা ?
মেঘাবৃত হলে পরে কি রজনী
তারার মালা ?
আর কি যতনে কুসুম রতনে
ব্রজের বালা ?

(ব্রজাঙ্গনা। কুসুম)

এই প্রায়-প্রৌঢ় যুবক তাঁর সাহিত্যিক তড়িৎ-যুদ্ধ চালিয়েছেন, এক-এক মাসে এক-একটা নতুন দেশ জয় ক'রে চমক লাগিয়ে দিয়েছেন রাজপুত্র থেকে জুতোওলা পর্যন্ত সকলকে ;—কিন্তু শেষ রক্ষা হ'লো না। তাঁর কর্মসূচীতে দেখতে পাই পরীক্ষার পর পরীক্ষা—পদ্যে ও গদ্যে, নাট্যে ও কাব্যে শুধু পরীক্ষা ; অনেকটা তার নিছক চর্চা, নিতান্তই লিখতে শেখা, প্রাক্-'মানসী' রবীন্দ্র-রচনার সগোত্র, অনেকটাই অবিমিশ্র অপব্যয়, যে-অপব্যয় যে-কোনো সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় অপরিহার্য। দেখতে পাই, যেদিকে তাঁর সহজাত ক্ষমতা সেদিকে যথোচিত মনোযোগ নেই ; যেটা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ, যেন বাজি রেখে সেইটে করার দিকেই ঝোঁক। ট্র্যাজেডি তাঁর ধারণার মধ্যে কোনোকালে আসেনি, অথচ ট্র্যাজেডি লিখতে গেলেন ; পক্ষান্তরে, নাটকের ভাষা পদ্য হওয়া উচিত—এমন পদ্য যা কানে শোনাবে গদ্যের মতো অথচ মনের উপর কবিতার মতো কাজ করবে—এই অত্যন্ত উৎসাহজনক অভিমত ঘোষণা ক'রেও কেন যে কখনো কাব্য-নাট্য

এ-কবিতাটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন কবি অশোকবিজয় রাহা। এ-ছাড়া আরো দুটি রচনা লক্ষণীয় :

কাব্যেকথানি রচিবারে চাহি
কহো কি ছন্দঃ পচন্দ দেবি !
কহো কি ছন্দ মনানন্দ দেবে
মনীষীবৃন্দে এ সুবঙ্গদেশে ?

(দেবদানবীয়ম্)

এখন্ কি আর্ নাগর্ তোমার্
আমার্ প্রতি তেমন্ আছে,
নূতন্ পেয়ে পুরাতনে
তোমার্ সে যতন্ গিয়েছে।

(গান। 'একেই কি বলে সভ্যতা ?')

যুক্তবর্ণের প্রয়োগ আরো একটু স্পষ্ট হ'লেই মাত্রাবৃত্ত ছন্দ মাইকেলি আবিষ্কারের অন্তর্গত হ'তে পারতো, এমনকি 'বেঠিক পথের পথিক'-এর ছন্দও যে তাঁর হাতে ধরা পড়তে-পড়তে ফশকে গেলো, তৃতীয় উদ্ধৃতিটিতে তার প্রমাণ আছে।

লিখলেন না, কিংবা লিরিক প্রেরণাকে আধুনিক কাব্যের বিশল্যকরণী ব'লে অনুভব করা সত্ত্বেও কেন কার্যত তাঁর সে-প্রেরণা আবদ্ধ রইলো শিশুপাঠ্য পদ্যসন্দর্ভে, তা মাইকেলের ভাগ্যবিধাতা ছাড়া সকলেরই অগোচর। তাঁর জয়যাত্রা অত্যন্ত অস্থির ব'লেই উত্তেজক; যে-ভাষার সওয়ার হ'য়ে বেরিয়েছেন সে সর্বদাই সচেষ্ট তাঁকে পিঠ থেকে ফেলে দিতে, যেহেতু তাঁর প্রতিজ্ঞা গায়ের জোরেই তাকে অনভ্যস্ত পথে চালাবেন। যতদিনে ভাষাকে তিনি প্রায় বাগে এনেছেন, চোখের সামনে পথ দেখা যাচ্ছে, যতদিনে নিজের ব্যর্থতার কাছে শিক্ষা নিয়ে-নিয়ে প্রায় প্রস্তুত হয়েছেন সত্যিকার সফলতার জন্য, ততদিনে তাঁর জীবনে যে-দুর্ভাগ্য ঘিরে এলো তার অবসান হ'লো একেবারে মৃত্যুতে। যে-সত্যের আভাস তিনি পেয়েছিলেন তা আভাস হ'য়েই রইলো, সাহিত্যরচনার যে-সব রীতি-নীতি উপলব্ধি করেছিলেন, তার প্রয়োগের অন্তরায় হ'লো ভাষাকে আত্মীকরণের অক্ষমতা; সাহিত্যশক্তির যে-বিভিন্ন উপাদানগুলিকে তিনি স্বতন্ত্রভাবে পরখ ক'রে দেখেছিলেন, যথাযথমাত্রায় সেগুলির সমন্বয়ের সময়ই হ'লো না— তাঁর সমগ্র সাহিত্যিক জীবন বলতে গেলে মাত্রই তো পাঁচ-সাত বছরের। তাই সুধীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত যদিও স্বীকার্য যে 'বাঙালি কবিকে তরজা-ওয়ালার দল থেকে প্রথম অব্যাহতি দিয়েছিলেন তিনিই' এবং এইখানেই তাঁর ঐতিহাসিক প্রাধান্য, তবু আন্তরিক বিচারে তাঁকে অপরিণত অকালমৃত কবির মতোই আমাদের লাগে আজকাল;—তাঁকে মনে হয় এমন কোনো কবি, নিজের শক্তির ব্যবহার যিনি জানেন না, নিজের উদ্দেশ্যকে নিজেই পরাস্ত করেন, যাঁকে আমরা চড়া গলায় প্রশংসা করি, আর তাতেই আমাদের দায়িত্ব ফুরোয় ব'লে যাঁর জন্য আমাদের দুঃখ হয়।

১৯৪৬

বাংলা শিশুসাহিত্য

আমরা ছোটো ছিলুম বাংলা শিশুসাহিত্যের সোনালি যুগে। দুই অর্থেই সোনালি সেই যুগ। প্রথমত সেই আরম্ভ, সূত্রপাত—বলতে গেলে শিশু-সাহিত্যই শিশু তখনো; আমরা এখন যারা সসম্মানে কিংবা যে-কোনো প্রকারে মধ্যবয়সে অবস্থান করছি, বাংলা ভাষার লক্ষণযুক্ত শিশুসাহিত্য আমাদেরই ঠিক সমসাময়িক। দ্বিতীয়ত, গুণের বিচারেও সোনালি, শুদ্ধ, সরল, সুন্দর, স্বচ্ছন্দ—এই অর্থেও সোনালি। এই সমাবেশ সুলভ নয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রথমে যেটা করা হয়, সেটাই সব সময়ে ভালো হয় না। অনেক সময়ই দেখা যায় যে পথিকৃৎগণের ক্রিয়াকলাপ উত্তরকালের কাজে লাগে, আনন্দের আয়োজনে নয়, ইতিহাসের সূত্রসন্ধানে। বাংলা ভাষার শিশুসাহিত্য এ-বিষয়ে উল্লেখ্য ব্যতিক্রম। সেই প্রথম অধ্যায়ে প্রাচুর্য ছিলো না, মন-ভোলানো, অন্তত পক্ষে চোখ-ভোলানো রকমারি ছিলো না এত, কিন্তু যেটুকু ছিলো সেটুকু একেবারেই খাঁটি। বেশি বই ছিলো না, কিন্তু যে-ক'টি ছিলো, তার অধিকাংশেরই আজ পর্যন্ত জুড়ি মেলেনি, তার অধিকাংশই আজকের দিনে ক্লাসিক ব'লে গণ্য হয়েছে। তখনকার শিশু-চিত্তের যাঁরা প্রতিপালক, তাঁরাই যে বাল্যবঙ্গের নিরন্তরভোগ্য মধুচক্র বানিয়েছেন, এই কথাটা আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করি। সংখ্যায় তাঁরা মাত্রই কয়েকজন। প্রাতঃকালীন, প্রাতঃস্মরণীয়, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, নানা-রঙিন রূপকথার দক্ষিণারঞ্জন, আর সেই বিস্ময়কর রায়চৌধুরী পরিবার, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে-একটিমাত্র পরিবারের আসন, মাত্রাভেদ যত বড়োই হোক না, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির পরেই। কোনো-একটা সময়ে এ-রকমও আমাদের মনে হয়েছিলো যে বাংলা শিশুসাহিত্য এই রায়চৌধুরীদেরই পারিবারিক এবং মৌরশি কারবার ভিন্ন কিছুই নয়। উপেন্দ্রকিশোর এই উজ্জ্বল যুগের আদি পুরুষ। তিনিই আমাদের প্রথম শোনালেন রামায়ণ, মহাভারত: যাকে বলা যায় বাংলা দেশের অমর ছড়ার গদ্যরূপ, সেই 'টুনটুনির গল্প' শোনালেন। কুলদারঞ্জনের পুরাণের গল্পে প্রাচীন ভারতের হৃদয়ের পথ খুঁজে পেলুম আমরা; তাঁর রবিন হুডের কাহিনীতে,

যাতে ভোরবেলার শিশির-ছোঁয়া গন্ধটুকুও যেন লেগে ছিলো, মধ্যযুগীয় 'সবুজ সুভগ' ইংলণ্ডের কত স্বপ্নেই মধুর হ'লো ছেলেবেলা। আর সুখলতা রাওয়ের 'গল্পের বই', 'আরো গল্প' সেই দুটি—হায়রে দুটিমাত্র!—বইয়ের কথা কি বলবার! নাকি তারা কখনোই ভোলবার! শৈশবের হৃদয়মন্থন এই বই ক-টি, সংখ্যায় বেশি নয় ব'লেই সম্ভোগে নিবিড়, অফুরন্ত বার প'ড়েও কখনো পুরোনো হ'তো না—আজকের দিনেও তারা পুরোনো হয়নি।

এটুকু হ'লেই যথেষ্ট মনে হ'তো, সাহিত্যের সেই প্রথম অবস্থায় খুব বেশি কেউ চাইতে শেখেনি, কিন্তু প্রাণের অব্যক্ত ইচ্ছা মূর্ত হ'য়ে উঠলো একটি পত্রিকায়। ছোটোদের আশার হরিণকে দিগন্তের দিকে ছুটিয়ে দিয়ে মাসে-মাসে আসতো 'সন্দেশ', আসতো তার আশ্চর্য মলাট আর ভিতর-কার মনোহরণ রঙিন ছবি নিয়ে, আনতো দুটি মলাটের মধ্যে সাহিত্যের বিচিত্র ভোজে উজ্জ্বল পাইকা অক্ষরের পরিবেশন। কবিতা, গল্প, উপকথা, পুরাণ, প্রবন্ধ, ছবি, ধাঁধা—সন্দেশের ভোজ্য তালিকায় এমন কিছু ছিলো না, যা সুস্বাদু নয়, সুপাচ্য নয়, যাতে উপভোগ্যতা আর পুষ্টিকরতার সহজ সমন্বয় ঘটেনি। শুধু তা-ই নয়, সমস্ত বিভিন্ন রচনার মধ্যে এমন একটি সংগতি ছিলো সুরে, এমন একটি অখণ্ডতা ছিলো এই পত্রিকাটির চরিত্রে, যে অনেক সময় পুরো সংখ্যাটা একজনেরই রচনা ব'লে মনে হ'তো। এই ধারণার সমর্থন করতো অস্বাক্ষরিত রচনার প্রাচুর্য। স্পষ্টত একই হাতের কর্ম সে-সব। অনেক লেখাই অনামীতে বেরোতো 'সন্দেশে'; সেই সব খেয়ালি কবিতা, ছন্দে-মিলে মন্ত্র-পড়ানো এবং অর্থহীনতায় অর্থময় সব কবিতা, পাতা খুলে প্রথমেই যার প্রিয় কণ্ঠের অভ্যর্থনা শুনতাম, আর কখনো-কখনো একই সংখ্যায় যার দুটি-তিনটি ক'রে পাওয়া যেতো; আর সেই সব স্কুল-ছেলেদের হাস্যস্ফূরিত সমানুভাবী গল্প, বালকের প্রচ্ছন্ন জগতে নিত্যনতুন আবিষ্কারের কাহিনী, যেখানে অধ্যবসায়ী নন্দলাল নিয়তিনির্বন্ধে কিছুতেই প্রাইজ পায় না, পাগলা দাশুর রহস্যময় বাক্স শুধু কৌতূহলের অসারতা প্রমাণ করে, এবং মাতুলবিলাসী কল্পনাপ্রবণ যজ্ঞিদাস কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের বিরোধ সইতে না-পেরে মর্মপীড়িত অশ্রুপাত করে—এই

সব অস্বাক্ষরিত গল্প-কবিতা যে কার লেখা, সে-বিষয়ে 'সন্দেশের' তৎকালীন পাঠকরা ঠিক অবহিত না-থাকলেও সারা বাংলায় তার প্রচার হ'তে বিলম্ব হ'লো না—যখন 'হ-য-ব-র-ল' আর 'আবোল-তাবোল' এই দুটি বই প্রকাশিত হ'লো। শুধু তো বই দুটি নয়, প্রকাশিত হ'লো প্রতিভা, অকালমৃত্যুর বেদনাজড়িত সেই বিস্ময় বাংলার চিত্তলোকে তরঙ্গ তুললো সেদিন। সোনার খাতায় নতুন একটি নাম উঠলো, নতুন একটি তারা ফুটলো আকাশে : সুকুমার রায়।

২

আজ আমার সেই ছেলেবেলার পড়া, বাঙালি ছেলের চিরকালের পড়া রচনাবলীর কিছু অংশ নতুন আকারে দেখতে পেয়ে আনন্দিত হচ্ছি। ইতিমধ্যে অনেক বছর কেটেছে; আমরা যারা এ-সব লেখার প্রথম ছোটো-ছোটো ভোক্তা ছিলুম, আজ আমাদেরই উপর ভার পড়েছে নবীন তরুণদের মনের খাদ্য জোগান দেবার। এই চেষ্টায় সম্প্রতি আমরা নানা ভাবে হতকাম হয়েছি। যে-সব বই বিশেষভাবে অপত্যপাঠ্য মনে করি, তা সংগ্রহ করা অনেক সময়ই সহজ হয়নি। বাংলা দেশে এত বড়ো দুর্ঘটনাও ঘটেছিলো যে 'আবোল-তাবোল' অনেক বছর ছাপা ছিলো না। মাঝে কুলদারঞ্জন অবলুপ্তির প্রান্তে এসে ঠেকেছিলেন, সুখলতা রাওয়ের বই জোগাড় করতে প্রায় গোয়েন্দা লাগাবার প্রয়োজন হ'তো। এ-সব বইয়ের পুনঃপ্রকাশ তাই সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ব'লে মনে করি। পাশাপাশি দেখছি সুকুমার রায় আর কুলদারঞ্জনকে, আর সুখলতা রাওয়ের বই দুটি যুক্ত হ'য়ে 'গল্প আর গল্প' নামে বেরিয়েছে। এই রচনাগুচ্ছে—রায়চৌধুরীদের সমগ্র রচনাগুচ্ছে—একটি পারিবারিক সাদৃশ্য দেখতে পাই। ব্যক্তিভেদে শক্তির তারতম্য আছেই, কিন্তু মৌল সাদৃশ্য যেখানে ধরা পড়ে, সেটি তাঁদের সহজ ভঙ্গিতে, গল্প বলার অবসাদহীন প্রবাহে, কণ্ঠস্বরের সেই লাবণ্যে, যে-কোনো লাইন চোখে পড়লেই মনের মধ্যে যার প্রভাব ছড়ায়। এই লাবণ্য গুণটি বুঝিয়ে বলা শক্ত—কিংবা খুবই সহজ, অর্থাৎ এটি

সাহিত্য-রান্নায় সেই লবণ, যার অভাবে অন্য কিছুরই স্বাদ ওঠে না। এক্ষেত্রে বলা যায় যে এঁরা ঠিক ছোটোদের মতো ক'রেই বলতে পারেন—মানে, ছোটোরা নিজেরা যে-রকম ক'রে বলবে সে-রকম অবশ্য নয়, কিন্তু যেমন বললে তাদের মনে হবে যে তাদের মতোই বলা হচ্ছে, ঠিক তেমনি ক'রেই বলতে পারেন এঁরা। তাই এঁদের লেখায় কৃত্রিমতা নেই ; এক ফোঁটা পিঠ-চাপড়ানো নেই ছোটোদের উদ্দেশে, কোনোরকম ইস্কুল-মাস্টারি করুণা কিংবা কর্তব্যবোধ নেই ; ছোটোদের সম্মান সম্পূর্ণ বজায় রাখেন এঁরা, কিন্তু তাই ব'লে স্বকীয় সত্তা ভোলেন না, নিজেরাই ছেলেমানুষির ভুল করেন না কখনো, বন্ধুতাস্থাপনের চেষ্টায় অশোভন মুখভঙ্গি ক'রে শ্রদ্ধা হারান না। সুকুমার রায়ের প্রত্যেক গল্পেই উপদেশ আছে, কিন্তু সেটা বাইরে থেকে নিক্ষিপ্ত নয়, ভিতর থেকেই প্রকাশ-পাওয়া, সে-উপদেশ সেই জাতের, যা বালকেরা নিজেরাই মাঝে-মাঝে কৃতজ্ঞ চিত্তে নিয়ে থাকে জীবন থেকে। এইজন্যই তাদের উপভোগ কখনো ব্যাহত হয় না ; তাদের বয়সোচিত নানারকম ছলচাতুরী বোকামি এবং দুষ্টুমির শেষে জব্দ হওয়ার দৃশ্যটিতে নিজেরাই তারা প্রাণ খুলে হাসে ; ঐ জব্দ হওয়ার—যদিও তারাই এক-একজন এক-এক গল্পের নায়ক—সম্পূর্ণ সমর্থন করে তারা ; সেটুকু না-থাকলেই ভালো লাগতো না, সত্যি বলতে। এতে প্রমাণ হয়, বয়স্ক লেখকের সঙ্গে তাঁর ছোটো-ছোটো পাঠকদের একাত্ম-বোধ কত নিবিড়।

তবু যুগ-বদলের সঙ্গে-সঙ্গে সাহিত্যেও স্বাদ-বদল ঘ'টে থাকে, আর সুকুমার রায়ের সমস্ত লেখার মধ্যে শুধু 'পাগলা দাশু'র গল্পগুলোই আজকের দিনে মনে হয় কালপ্রভাবে ঈষৎ মলিন, যেন সাল-তারিখ পেরিয়ে আসা। যে-বিশেষ পরিবেশের সংলগ্নতায় এই গল্পগুলি জন্মেছিলো, সেই পরিবেশ আজ স্মৃতিকথায় পর্যবসিত ; এই রকম ঐতিহাসিক ব্যবধান অনেক সময়ই রসগ্রহণে ব্যাঘাত ঘটায়। কিন্তু রূপকথা চিরন্তন, চিরকালের পুরোনো ব'লেই তারা নতুন থাকে ;—আর এইখানেই সুখলতা রাওয়ের—কৃতিত্ব বেশি বলবো না, কিন্তু ভাগ্য ভালো। তাছাড়া যাকে লাবণ্য বলেছি, সহজ ভঙ্গি, সেই গুণটি সবচেয়ে বেশি প্রশংসা জাগায় তাঁরই লেখায়, কেননা

'পাগলা দাশু' বা কুলদারঞ্জনের কাহিনীর তুলনায় তাঁর গল্প আরো অনেকটা তরুণতরদের গ্রহণযোগ্য। 'গল্পের বই', 'আরো গল্প'—ঠিক 'টুনটুনির বই'য়ের মতো—একেবারেই বালভাষিত গদ্যে লেখা—অবশ্য রবীন্দ্রনাথের অর্থে নয়—সবেমাত্র যারা পড়তে শিখেছে একান্তভাবে তাদেরই উপযোগী ; ছোটো-ছোটো কথা, মৃদু-মৃদু বাক্য, শাদাশিধে ঘরোয়া ধরনে নিচু গলায় বলা—যেন লেখা গল্পই নয় আসলে, বলা গল্প—অথচ দক্ষিণারঞ্জনের জাঁকজমকের বেড়া ডিঙোতেও হয় না, আবার একটুও পানসে নয় তাই ব'লে, ছোট্ট মাপের মধ্যে ভরপুর এক-একটি গল্প। বর্ণপরিচয় পেরোনো মাত্র ধরিয়ে দেয়া যায় এমন সুখপাঠ্য গল্পের বই এ-তিনটি ছাড়া বাংলা ভাষায় এখনো বেশি হয়েছে ব'লে মনে করতে পারি না।

সুখলতার গল্প অবশ্য মৌলিক নয়, বিদেশী রূপকথার, প্রধানত গ্রিম-ভ্রাতাদের অনুসরণে লেখা। কিন্তু তাতে তাঁর গৌরবের কোনো হানি হয় না। সাহিত্যের কোনো-কোনো অবস্থায় অনুবাদ বা অনুসারী রচনা মৌলিকতারই মর্যাদা পেয়ে থাকে ; তাছাড়া বৈশ্বিকতা রূপকথার চরিত্রগত, একই কাহিনীর বিভিন্ন প্রকরণ বিভিন্ন এবং বহুবিচ্ছিন্ন দেশে উদ্গত হ'য়ে মানবজাতির আদিম ঐক্যের সন্ধান দেয়। গ্রিমের গ্রন্থও সূক্ষ্ম অর্থে মৌলিক নয়, জর্মন দেশের আদ্যিকালের রূপকথার সংগ্রহ, আর সে-সব গল্প সুখলতার হাতে এমন অবাধভাবে দেশীয় হাওয়ায় প্রস্ফুটিত হয়েছে যে তারই জন্য বাঙালি শিশু বংশানুক্রমে কৃতজ্ঞ থাকবে তাঁর কাছে।

এই মৌলিকতার প্রসঙ্গটি আরো একটু অনুধাবনযোগ্য। সুখলতা, দৃষ্টিপাতমাত্র ধরা পড়ে, এ-বিষয়ে ব্যতিক্রম নন। তখনকার শিশু-লেখকরা প্রায় সকলেই মধুকরব্রতী ; তাঁদের সাহিত্যের প্রধান অংশই অনুবাদ বা অনুরচনা—যাকে বলে অ্যাডাপ্টেশন—কিংবা প্রচলিত লোকসাহিত্যের সংগ্রহ বা সংকলন। এর উদাহরণ উপেন্দ্রকিশোর, কুলদারঞ্জন, 'চারু ও হারু' সত্ত্বেও দক্ষিণারঞ্জন, এবং অজস্র স্বাধীন রচনা সত্ত্বেও স্বয়ং যোগীন্দ্রনাথ। নিজে গল্প তৈরি ক'রে কী হবে, তার প্রয়োজনই বা কী—এঁদের মনের ভাবখানা ছিলো এইরকম ; দেশে ও বিদেশে যে-রত্নরাজি ছড়িয়ে

প'ড়ে আছে, সেইগুলির যথাযোগ্য পরিবেশনেই এঁদের প্রযত্ন ছিলো। বাংলাদেশের সেটা ছিলো ফুটে ওঠার, হ'য়ে ওঠার সময়; এ-রকম সময়ে কোথাও-কোথাও অনুবাদের বড়ো-বড়ো যুগ এসেছে; যে-দৃশ্য আমরা দেখতে পাই চসারের কিংবা মার্লোর ইংলণ্ডে, বাংলা শিশুসাহিত্যের আলোচ্য অংশ তারই একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। এই ঐতিহাসিক অবস্থায় স্বাধীন এবং পরনির্ভর রচনায় ভেদচিহ্ন স্পষ্ট থাকে না; আর ভেবে দেখতে গেলে কোনো লেখাই তো সম্পূর্ণ 'স্বাধীন' নয়—বিশেষত, দেশে যখন কিছুই নেই, তখন অতীত থেকে, বিদেশ থেকে সংকলনকর্মই স্রষ্টা-মনের যোগ্য হয়ে ওঠে।* পূর্বসূরীরা জঙ্গল কেটে সাফ করলেন, তৈরি করলেন পথ, নানা দেশের নানান বীজ ছড়িয়ে দিলেন মাটিতে—আর এমনি ক'রে ঘটিয়ে দিলেন, ফলিয়ে তুললেন সুকুমার রায়ের সুপরিণত ব্যক্তিস্বরূপ।

২

সুকুমার রায়কে আমি বরাবর শ্রদ্ধা করেছি শুধু হাস্যরসিক ব'লে নয়, শুধু শিশুসাহিত্যের প্রধান বলে নয়, বিশেষভাবে সাবালকপাঠ্য লেখক ব'লেও। তাঁর কথা ভাবলে অনিবার্যত মনে পড়ে ল্যুইস ক্যারল-এর যুক্তিচালিত বিস্ময়লোক, মনে পড়ে এডওঅর্ড লিয়র-এর লিমারিকগুচ্ছে ব্যক্তিবাদের পরাকাষ্ঠা। এই শেষের কথাটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। ইওরোপে যন্ত্রযুগ এসে যখন বললো, 'সব মানুষকে এক ছাঁচে ঢালাই ক'রে দাও',

* এই অনুবাদের ধারা উনিশ শতকেই আরম্ভ হয়েছিলো—আর তা শুধু নাবালক সাহিত্যেই নয়—বিদ্যাসাগরের 'কথামালা'র পাশে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতও আমরা দেখতে পাই। পরবর্তীকালে অবনীন্দ্রনাথও অনেকাংশে অনুলেখক। এ-প্রসঙ্গে আরো স্মর্তব্য যে বাংলার 'স্বদেশী' যুগে দেশজ রত্ন উদ্ধার করার যে-আবেগ এসেছিলো, তা তথাকথিত শিশুসাহিত্যেই আবদ্ধ থাকেনি; যে-প্রেরণায় যোগীন্দ্রনাথ ছড়া সংগ্রহ করলেন, উপেন্দ্রকিশোর লৌকিক গল্প, আর দক্ষিণারঞ্জন রূপকথা, সেই একই প্রেরণার মহার্ঘ ফল 'কথা ও কাহিনী'।

সমাজের সেই স্পর্ধার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জেগে উঠলো সাহিত্যের নানা বিভাগে। লিয়রের আপাত-লঘু পঞ্চপদাবলী সেই প্রতিবাদেরই অন্যতম দলিল। তাঁর প্রহসনের পাত্র-পাত্রী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চরম নমুনা, একদম বেপরোয়া তারা, মরীয়ারকম স্বাবলম্বী, বা স্বেচ্ছাচারী—কেউ তারা গাছে উঠে ব'সে থাকে, কেউ বা দাড়িতে টুপিতে যত রাজ্যের পাখি জোটায়, কেউ বা ঝাঁপিয়ে পড়ে এটনার গনগনে উনুনটার মধ্যে—আর তাদের এ-সব কাণ্ড দেখে 'they' বা অন্যেরা যখন হাসে বা মারতে ওঠে, তখন তারা ম'রে গেলেও গোঁ ছাড়ে না। এই 'অন্যেরা' হ'লো সমাজ, যে-সমাজ মানুষকে কল বানাতে চায়। অ্যালিসের স্বপ্নলোকেও সবই অদ্ভুত, অবৈধ, অসামাজিক—নিয়মহারা নয়, কিন্তু উল্টো নিয়মের অধান—যে-নিয়মে ওঅর্ডস্বর্থের সাত্ত্বিক বুড়ো ফাদাব উইলিয়ম হঠাৎ খেপে গিয়ে অনবরত মাথার উপর দাঁড়িয়ে থাকে, যা-কিছু পোষ-মানা, আপোশে চলা, অতিশয় আরামদায়ক এবং গতানুগতিক, তাকে 'মানি না' বলার সম্ভাবনাটাই ক্যারলের অসম্ভাবনার তাৎপর্য। ভিক্টরীয় যুগের অনেক নিন্দে শোনা গেছে, কিন্তু এই আশ্চর্য 'ননসেন্স' সাহিত্য—যার মরাল-গীতি চেস্টটন গেয়েছিলেন—তারও উত্থান এই সময়েই ঘটেছিলো, মৃদু-মসৃণ 'লন টেনিসন'-এর আমলে। এই 'ননসেন্স' আর কিছুই নয়: আধুনিক সমীকরণের বিরুদ্ধে তির্যক বিদ্রোহঘোষণা।

সুকুমার রায়ের জগৎটাতেও এই বিদ্রোহের আভাস দেখা যায়। সেখানেও রাজার পিসি কুমড়ো নিয়ে ক্রিকেট খেলে, আর রাজা বিল্ববিমুখ মুণ্ডিতমস্তকের সমস্যা নিয়ে আকুল হ'য়ে থাকেন; সেখানেও কেউ ছায়া ধরার ব্যবসা করে, কেউ বা আপিশ-টাপিশ সব ভুলে শুধু গান গেয়ে দিন কাটায়। এই সাদৃশ্য শুধু প্রভাবজনিত নয়। উপরোক্ত দুই ইংরেজ লেখকের কাছে, বলা বাহুল্য, সুকুমার রায়ের ঋণ অনেক; সেই ঋণ সার্থক হয়েছিলো এইজন্যে যে এঁদের সঙ্গে তাঁর নানা রকম মিল ছিলো। মিল ছিলো গুণের দিক থেকে, প্রাণের দিক থেকেও। ক্যারলের মতো, তিনিও ছিলেন একাধারে শিল্পী ও বিজ্ঞানী; লিয়রের মতো, একাধারে চিত্রী ও লেখক; ক্যারলের মতোই শব্দতত্ত্বে সন্ধানী ছিলেন, আর উভয়ের

মতোই জন্মেছিলেন লজিকনিষ্ঠ মনের সঙ্গে খামখেয়ালি মেজাজ নিয়ে। এ-দুয়ের মিলন ঘটলে তবেই সত্যিকার খেয়াল-খাতা লেখা যায়, নয়তো ও-বস্তু আক্ষরিক অর্থেই 'ননসেন্স' হয়ে পড়ে। এ-ক্ষেত্রে সুকুমার রায় তাঁর উত্তমর্ণদের—সমকক্ষ বললে ভুল হবে—কেননা তাঁর ব্যঙ্গের দিকেও ঝোঁক ছিলো—কিন্তু সমীপবর্তী। ব্যঙ্গরচনা খেয়ালি লেখার সধর্মী নয়, যেহেতু লক্ষ্যগোপনেই খেয়ালি লেখার লক্ষ্যভেদ, আর স্পষ্ট কোনো লক্ষ্য ছাড়া ব্যঙ্গ হয় না। যেখানে সুকুমার রায় ব্যঙ্গনিপুণ—যেমন 'সৎপাত্র' বা 'ট্যাঁসগরু'তে—সেখানে তাঁর উদ্দেশ্য আমরা পরিষ্কার দেখতে পাই ব'লে অদ্ভুত রসটা বিশুদ্ধভাবে পাই না। 'হাত গণনা' 'নারদ, নারদ', 'গন্ধবিচার'—যে-সব কবিতায় চরিত্রসৃষ্টি আছে, মনস্তত্ত্ব আছে—সেখানেও স্পর্শসহ 'অর্থ' এসে রচনার জাত বদলে দেয়। এ-কথা ব'লে সুকুমার রায়ের মূল্য আমি কমাতে চাচ্ছি না—অমন অপচেষ্টা কোনো বাতুল যেন না করে—আমার উদ্দেশ্য শুধু এটুকু বলা যে তিনি ছিলেন অনেকটা চেস্টর্টনের মতো—একাধারে ঠাট্টায় আর আজগুবিত্বে স্বভাবসিদ্ধ; ক্যারলের মতো, লিয়রের মতো বিশুদ্ধভাবে অদ্ভুত রসের পূজারি ছিলেন না।

কিন্তু, এই ইংরেজ যুগলের তুলনায় একটি বিষয়ে তিনি মহত্তর; সেটি তাঁর কবিত্বগুণে। এই বিচার পরম নয়, আপেক্ষিক। অর্থাৎ এখানে 'এ বুক অব ননসেন্স-'এর সঙ্গে বা 'অ্যালিসে'র পদ্যাংশের সঙ্গে 'আবোল-তাবোলে'র তুলনা করছি না; ভেবে দেখছি আপন ভাষার কাব্যের ক্ষেত্রে কার কী-রকম মূল্য। ইংরেজিতে লিয়র কিংবা ল্যুইস ক্যারল আসন পেয়েছেন হালকা কবিতার বিভাগে; তাঁদের পদ্য কৌতুকের উৎস, কৌতূহলের বিষয়, গবেষণাযোগ্য বিরল মণিমুক্তোর মতো; কিন্তু সুকুমার রায়কে 'হাসির কবিতা'র গণ্ডির মধ্যে ধ'রে রাখা যায় না, কোনো বিশেষজ্ঞতার পরিধির মধ্যেও না—তিনি বেরিয়ে আসেন বাংলা কবিতার বড়ো মহলেই। 'আবোল-তাবোল', আমার প্রথম থেকেই মনে হয়েছে, বাংলা ভাষার রীতিমতো একটি কাব্যগ্রন্থ, যাতে হাসির ছুতো ক'রে, ছবি এবং কৌতুকের সাহায্যে ভুলিয়ে এনে, শিশুদের এবং বয়স্কদেরও কয়েক ফোঁটা বিশুদ্ধ কাব্যরস অন্তঃস্থ ক'রে দেয়া হ'লো। 'মেঘ-মুলুকে ঝাপসা

রাতে রামধনুকের আবছায়াতে' ব'সে 'আলোয় ঢাকা অন্ধকারে'র গন্ধে ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পাবেন কি কবি ছাড়া অন্য কেউ? না কি অন্য কেউ 'পান্তভূতের জ্যান্ত ছানা'কে 'জোছনা হাওয়ার স্বপ্ন-ঘোড়া'য় চড়িয়ে দেবেন? নাকি সংসারের হাজার হট্টগোলের মধ্যে অনবরত শুনতে পাবেন যে গানের মাঝে 'তবলা বাজে ধিনতা'? যাঁর মালপোয়ালোভী মার্জার বেরিয়ে আসে, যখন—

বিদঘুটে রাত্তিরে ঘুটঘুটে ফাঁকা
গাছপালা মিশমিশে মখমলে ঢাকা,
জটবাঁধা ঝুলকালো বটগাছ তলে,
ধকধক জোনাকির চকমকি জ্বলে।...
পুবদিকে মাঝরাতে ছোপ দিয়ে রাঙা,
রাতকানা চাঁদ ওঠে আধখানা ভাঙা—

যাঁর হাস্যভীরু রামগরুড়-শাবক

যায় না বনের কাছে কিংবা গাছে-গাছে
দখিন হাওয়ার সুড়সুড়িতে
হাসিয়ে ফেলে পাছে।
সোয়াস্তি নেই মনে মেঘের কোণে-কোণে
হাসির বাষ্প উঠছে ফেঁপে
কান পেতে তাই শোনে।
ঝোপের ধারে-ধারে রাতের অন্ধকারে
জোনাক জ্বলে আলোর তালে
হাসির ঠারে-ঠারে—

তাঁকে কবি ব'লে না-মানতে হ'লে 'কবি' কথাটায় অন্যায়ভাবে সীমানা টানতে হয়। সত্য, সুকুমার রায়ের পদ্যজাতীয় রচনা অধিকাংশই সর্বতো-ভাবে পদ্য, পদ্য যত ভালো হ'তে পারে তা-ই—তার বেশি আর-কিছু

নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে এ-কথাও সত্য যে মাঝে-মাঝে পদ্যের সীমা পেরিয়ে তিনি কবিতার স্তর স্পর্শ ক'রে যান—তখন আমরা যে-আনন্দ পাই, সেটা পরিহাসলব্ধ হ'তে পারে না। উদ্ধৃত অংশের উজ্জ্বল চিত্ররূপ, ছন্দের বিন্যাস, প্রথম দৃষ্টান্তে হসন্ত শব্দে অন্তর্মিলবহুল নৌকার দাঁড় পড়ার মতো ছপছপ-আওয়াজ—সবটা মিলিয়ে কৌতুকাবহ প্রসঙ্গ এরা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে, কিংবা কৌতুকের সঙ্গে কল্পনা মিশে হ'য়ে উঠেছে অন্য কিছু। এখানে আমরা অন্য যে-আস্বাদটুকু পাই, তাকে কবিতারই অভিজ্ঞতা ব'লে তখনই আমরা চিনতে পারি। অর্থাৎ, 'আবোল-তাবোল'-এর আবেদন একাধিক স্তরে; ছোটোরা কুমড়োপটাশ আর বোম্বাগড়ের রাজাকে নিয়ে হাসে, দুলে-দুলে ছন্দ পড়ে, আবৃত্তি করে চেঁচিয়ে; আর বড়োরা—হয়তো কোনো-কোনো বালক-বালিকাও—উপভোগ করে 'দখিন হাওয়ার সুড়সুড়ি', মুগ্ধ হয় মিলের চমকে, দেখতে পায় ব্যঙ্গের দীপ্তি, লক্ষ্য করে বাতিকগ্রস্তদের অবিশ্বাস্য ব্যবহারে সমাজবিধানের সমালোচনা।

এ ছাড়া অন্য দিক থেকেও তাঁর দাবি আছে। নিছক পদ্যরচনার কারিগরিতে, ছন্দ-মিলের অপ্রতিহত পরিচালনায় সুকুমার রায়ের দক্ষতা এমন অসামান্য যে শুধু তারই জন্য তাঁকে কবি ব'লে স্বীকার করার বাধা হয় না। বাংলা দেশ, এখানে স্মরণ করা ভালো, একই কারণে কবির সম্মান দিয়েছে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে; সত্যেন্দ্রনাথও পদ্যকার, পদ্য ছাড়া বেশি কিছু লেখেননি, কিন্তু সেই পদ্যই ওস্তাদের মতো, আর প্রচুর পরিমাণে লিখেছেন ব'লে কবিসভায় শেষ পর্যন্ত তাঁকে অমান্য করা যায় না। উপরন্তু সত্যেন্দ্রনাথের তুলনায় সুকুমার রায় অনেক বেশি পরিণত মনের মানুষ, তাঁর কলাকৌশলও অনেক বেশি সাবালক; তাই তাঁর পদ্য ছোটোদের জন্য লেখা হ'লেও বয়স্কদের ভোগ্যবস্তু হয়েছে, আর সত্যেন্দ্রনাথের লক্ষ্য যদিও বয়স্ক পাঠক, কার্যত তাঁর অধিকাংশ কবিতাই কিশোরপাঠ্য। গত দুই দশকে বাংলা কবিতা যতটা বদলে গেছে, তাতে আজকের দিনের তরুণ কবির পক্ষে সত্যেন্দ্রনাথ আর অপরিহার্য নেই, কিন্তু লেখা শেখার যে-কোনো ইস্কুলে 'আবোল-তাবোল' এখনো আবশ্যিক।

'আবোল-তাবোলে'র সঙ্গী বই এবার প্রকাশিত হ'লো 'খাই-খাই' নামে। বইটি চোখে দেখে, এমনকি শুধু নাম শুনে, আমার মনে প'ড়ে গেলো 'খাই-খাই' কবিতা যখন প্রথম বেরিয়েছিলো অদূরবর্তী, সুদূরবর্তী অতীতে। সেই গ্রন্থবিরল যুগে বিধাতার আশীর্বাদের মতো এসেছিলো নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'পার্বণী', তারই পাতায় এই অপ্রতি-রোধ্য কবিতা প্রথম এবং অবিস্মরণীয়রূপে পড়েছিলাম। মনে পড়ে একটি বালককে অসংখ্য বার এটি আবৃত্তি করতে হয়েছিলো, আর তা-ই শুনে বয়স্কজনেরা কতই না হেসেছিলেন। হ্যাঁ—হাসির কবিতা সন্দেহ নেই, কিন্তু শুধু তা-ই নয়, শুধু আজব ভোজের রঙিন তালিকাই তৈরি হয়নি এখানে, মাতৃভাষার স্বরূপটিও প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলা ভাষার এক-একটি ক্রিয়াপদ কত রকম বিচিত্র অর্থে ফরমাশ খাটে, যা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু হঠাৎ কেউ জিগেস করলে বলতে পারি না—সে-বিষয়ে আমাদের মনোরম উপায়ে সচেতন ক'রে দিলেন সুকুমার রায়। তাঁর এ-ধরনের রচনার মধ্যে সবচেয়ে চমকপ্রদ 'শব্দকল্পদ্রুম', আর 'খাই-খাই' সবচেয়ে বিস্তারিত ও সম্পূর্ণ। 'খাই-খাই' পদ্যে লেখা হ'লেও আসলে একটি প্রবন্ধ বা অভিধানের ছিন্নপত্র, অথচ রঙে-রসে উজ্জ্বল; পণ্ডিতের সঙ্গে রসিক এখানে মিলেছে, আর রসিকতায় শান দিয়ে যাচ্ছে ছন্দ-মিলের দাঁড়ি-কমা। ঐ মিল—স্বচ্ছন্দ, অভিনব, অনিবার্য এক-একটি মিল—ওর প্রয়োজন ছিলো ওখানে—নয়তো অতক্ষণ ধ'রে সহ্য করা যেতো না; কিন্তু পদ্যের ঘনিষ্ঠতা যে-সব রচনায় নেই, সেখানে লেখক পুরোমাত্রায় পুষিয়ে দিয়েছেন গল্প এনে, প্লট সাজিয়ে; 'অবাক জলপান' এবং অংশত 'চলচিত্তচঞ্চরী'কে বলা যায় 'খাই-খাই'য়েরই গদ্য প্রকরণ, অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন প্রবন্ধ। সুকুমার রায়ের মাপজোক ঠিক নিতে হ'লে, তাঁর নানান গুণপনা বুঝতে হ'লে, আমাদের আসতে হবে এখানেই—তাঁর রচনাবলীর এই অংশে—(যেখানে ভাষাতত্ত্ব শিল্পীর হাতে সজীব হ'য়ে উঠেছে, যেখানে তাঁর বৈজ্ঞানিক সার্কাসে কথার খেলা দেখানো হয়।) এই কথা নিয়ে খেলা করার কাজটি লেখকদের পক্ষে লোভনীয়, কিন্তু রজ্জুপথে চলার মতোই বিপজ্জনক, একচুল ভুল হ'লেই সেখানে অপঘাত ঘটে। এর জন্য বিশেষ একরকম

মনীষিতার প্রয়োজন হয়, সেটা সকলের থাকে না। এই ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার আধুনিক লেখকদের মধ্যে সুকুমার রায় অনন্যভাবে চোখে পড়েন; তাঁর কথা-খেলার ফলশ্রুতি বিনোদনেই ফুরোয় না, তাতে ভাষার লুকানো কোণে আলো পড়ে, ভাষাপ্রয়োগের সম্ভাবনা যেন বেড়ে যায়। 'হাঁসজারু' বা 'বকচ্ছপ' শুনে ছোটোরা যত ইচ্ছে হাসুক, কিন্তু আমাদের মনে প'ড়ে যায় জেমস জয়সকে আর পূর্বসূরী ল্যুইস ক্যারলকে, যিনি 'slithy' আর 'mimsy' উদ্ভাবন ক'রে জয়সকে পথ দেখিয়ে দেন।* অবশ্য 'হাঁসজারু', 'বকচ্ছপে' ক্যারলীয় গূঢ়তা নেই, কিন্তু ইঙ্গিত ঠিকরে পড়ে সুকুমার রায়ের শ্লেষপ্রয়োগে, যমকের ব্যবহারে। ঐ শ্লেষ বা 'পান' করার বিদ্যেটি বড়ো পিচ্ছিল—অনেকের হাতেই তা ছিবলেমি মাত্র হ'য়ে পড়ে। কিন্তু সুকুমার রায়, 'হাস্য-কৌতুকে' রবীন্দ্রনাথের মতো, ওর সাহায্যে ভাষার গাঁট খুলে দেখান। 'অবাক জলপানে' আমরা শুধু কৌতুকে আবিষ্ট হই না, সেই সঙ্গে 'জল' কথাটির সঙ্গে নতুন ক'রে আমাদের চেনা হয়।

৪

সুকুমার রায়ের মৃত্যুর পরে 'সন্দেশ' যতদিনে বন্ধ হ'লো, তার আগেই শিশু-সাহিত্যে নতুন যুগ এনেছে 'মৌচাক' পত্রিকা। পরে অবশ্য 'সন্দেশ' বেরিয়ে আবার কিছুদিন চলেছিলো, কিন্তু 'প্রত্যাগত' শার্লক হোমস-এর

* 'Slithy' কথাটাই পিছল-পিছল শোনায়, আর 'mimsy' মানে যে তুচ্ছ কিছু, তা কি আর ব'লে দিতে হয়। প্রথম কথাটি—একটু ভাবলেই বোঝা যাবে—তৈরি হয়েছে 'lithe' আর 'slimy' মিশিয়ে, আর দ্বিতীয়টিতে মিশেছে 'flimsy' আর 'miserable'। ইংরিজিতে এই প্রথম দেখা দিলো 'তোরঙ্গ-শব্দ' বা 'portmanteau word', যাকে পরিণতির চরম সোপানে জেমস জয়স নিয়ে গেলেন। বাংলা ভাষায় 'womoon' বা 'hominous' এখনো সম্ভব হয়নি, কিন্তু 'গল্পসল্পে' রবীন্দ্রনাথ খেলাচ্ছলে দু-একটি নমুনা বানিয়েছিলেন, যেমন 'হিদিক্কার' বা 'বুদবুধি'। এর প্রথমটিতে 'হৃদয়,' 'হিক্কা,' 'ধিক্কার' এই তিনটি শব্দেরই আভাস দেয়, আর দ্বিতীয়টিতে 'বুধ' আর 'বুদ্বুদ' মিশে পাণ্ডিত্যের প্রতি কটাক্ষ পড়েছে।

মতোই সে আর তার পূর্ব সত্তা ফিরে পায়নি। এর পর থেকে শিশু-সাহিত্যে আসর জমালেন 'মৌচাকে'র লেখকরাই ; শিশুসাহিত্যের দ্বিতীয় যুগের এই পত্রিকাটিকেই প্রতিভূ বলা যায়।

এ-কথার অর্থ এই যে আধুনিক কালে, অর্থাৎ গত তিরিশ বছরের মধ্যে যাঁরা ছোটোদের জন্য উল্লেখ্যরূপে লিখেছেন, তাঁরা সকলেই এই পত্রিকার লেখক এবং কেউ-কেউ হয়তো ওরই প্ররোচনায় প্রথম ওদিকে মন দেন। প্রথম যুগের সঙ্গে দ্বিতীয় যুগের কিছু লক্ষণগত পার্থক্য দৃষ্টিপাত-মাত্র ধরা পড়ে। আগে রচনার ক্ষেত্রে নাবালক-সাবালকের সীমান্তরেখা খুব স্পষ্ট ছিলো ; যাঁরা ছোটোদের জন্য লিখতেন, তাঁরা অন্য কিছু লিখতেন না, আর যাঁদের বলতে পারি অবিশেষ সাহিত্যিক, সর্বসাধারণের লেখক, তাঁরাও শিশুসাহিত্য এড়িয়ে যেতেন। (পাঠ্যপুস্তক বাদ দিয়ে বলছি, আর রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কাব্যটি যে 'শিশুসাহিত্য' নয়, সে-কথা অবশ্য না-বললেও চলে।) আধুনিক কালে এ-ব্যবস্থার বদল হয়েছে। 'মৌচাকে'র প্রথম সংখ্যার প্রথম কবিতার লেখক ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, তার অনতিপরেই 'বুড়ো আংলা'র আবির্ভাব হ'লো সেখানে : 'ভারতী'-গোষ্ঠীর, তারপর 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর প্রায় সকলে দেখা দিলেন একে-একে ; মোটের উপর এ-কথা বললে ভুল হয় না যে সম্প্রতি যাঁরা ছোটোদের জন্য লিখেছেন এবং লিখছেন, দু-একজনকে বাদ দিয়ে সকলেই তাঁরা সাবালক সাহিত্যে প্রতিষ্ঠাবান। হয়তো এরই জন্য, কিংবা হয়তো অনিবার্য যুগপ্রভাবে, আমাদের শিশুসাহিত্যও অপেক্ষাকৃত বয়স্ক হয়েছে এখন : হয়তো শৈশবেরও চরিত্র বদলেছে এতদিনে ; আমরা আমাদের ছেলেবেলায় যে-রকমের ছোটো ছিলুম, এই রেডিওমুখর সিনেমাচ্ছন্ন যুগে সে-রকম আর সম্ভব ব'লেই মনে হয় না। এই পরিবর্তন প্রতিফলিত হয়েছে শিশুসাহিত্যে ; রচনার বিষয় বেড়েছে, বিষয় বদলেছে ; ভিন্ন সুরে বলা হয় আজকাল, ছোটোদের আর ততটা ছোটো ব'লে গণ্য করা হয় না, এবং বর্তমান কালের 'ছোটোদের' বই অনেক ক্ষেত্রে বয়স্করাও উপভোগ ক'রে থাকেন।

এই শেষের কথাটাকে একটু বিস্তার করা দরকার। শিশুসাহিত্যে বড়ো দুটো শ্রেণী পাওয়া যায়। তার একটা হ'লো একান্তভাবে, বিশুদ্ধ-

রূপে নাবালকসেব্য, যেমন যোগীন্দ্রনাথের, উপেন্দ্রকিশোরের রচনাবলী; আর অন্যটা হ'লো সেই জাতের বই, যাতে বুদ্ধির পরিণতিক্রমে ইঙ্গিতের গভীরতা বাড়ে, যেমন ক্যারলের অ্যালিস-কাহিনী, অ্যাণ্ডারসেনের রূপকথা, বাংলা ভাষায় 'বুড়ো আংলা', 'আবোলতাবোল'। যাদের মনের এখনো দাঁত ওঠেনি, একেবারে তাদেরই জন্য প্রথম শ্রেণীর রচনা, তাদের ঠিক উপযোগী হ'লেই তা সার্থক হ'লো; কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনা, বিশেষ অর্থে শিশুপাঠ্য থেকেও, হ'য়ে ওঠে বড়ো অর্থে সাহিত্য, শিল্পকর্ম; অর্থাৎ লেখক ছোটোদের বই লিখতে গিয়ে নিজেরই অজান্তে সকলের বই লিখে ফেলেন। বাংলা ভাষার সাম্প্রতিক শিশুসাহিত্য, যা বয়স্করাও উপভোগ করেন, তা এ-দুয়ের কোনো শ্রেণীতেই পড়ে না; খুব ছোটোদের খাদ্য এটা নয়—বরং বলা যায় কিশোর-সাহিত্য—আর বয়স্কদের যখন ভালো লাগে, তখন এই কারণেই লাগে যে লেখক তা-ই ইচ্ছে করেছিলেন, অনেক সময় বোঝা যায় যে লেখক যদিও মুখ্যত বা নামত ছোটোদের জন্য লিখেছেন, তবু সাবালক পাঠকও তাঁর লক্ষ্যের বহির্ভূত ছিলো না।

এর ফল—চারদিক মিলিয়ে দেখলে—ভালোই হয়েছে। প্রাচুর্য বেড়েছে, বেড়েছে উপাদানের বৈচিত্র্য, সেই সঙ্গে রূপায়ণেও সমৃদ্ধি এসেছে। বিস্তর বই বেরোচ্ছে আজকাল, বিস্তর বাজে বই বেরোচ্ছে—কিন্তু সেই সব খড়-বিচিলির স্তূপের মধ্যে শস্যকণারও পরিমাণ বড়ো কম নেই। রচনার নতুন ধারা নানা দিকেই বেরিয়েছে; তার একটা হ'লো বহির্জীবনের ঘটনাবহুল কাহিনী, যাকে বলে অ্যাডভেঞ্চার, আর কৌতুক-রচনা—'পরশুরামে'র অনন্য উদাহরণ বাদ দিলে—সম্প্রতি যেন বিশেষভাবে শিশু-সাহিত্যেই আশ্রয় নিয়েছে। এই উভয় বিভাগেই দেখা যায়, লেখকরা নাবালক-বুদ্ধির গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে নারাজ; তাঁদের লেখাটা হয় ছোটোদের মাপের, কিন্তু বিষয়টা সব সময় আন্দাজমতো হয় না, কখনো-কখনো পরিণত মনের প্রবণতা তাতে ধরা পড়ে। আমি কী বলতে চাচ্ছি সেটা স্পষ্ট হবে হেমেন্দ্রকুমারের সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের রোমাঞ্চিকার তুলনা করলে। 'যখের ধন' খাঁটি কিশোর-সাহিত্য—আর লেখার জাত হিশেবেও বাংলা ভাষায় নতুন—কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্রের নতুন 'বৈজ্ঞানিক' অ্যাডভেঞ্চারে

যেন আরো কিছুর সম্ভাবনা আমরা দেখতে পাই। শুধু সম্ভাবনা, সেটুকুই যা দুঃখ। তাঁর চান্দ্র ভ্রমণের রহস্যঘন কাহিনী বা দানবিক দ্বীপের লোমহর্ষক উপাখ্যান, এ-সব রচনাকে শিশুসাহিত্য বললে একটু কম বলা হয়, কিন্তু অন্য কোনো নামও এদের দেয়া যায় না। এতে এমন উপকরণ আছে, যাতে পরিণত মনেও কৌতূহলের উত্তেজনা আসে, কিন্তু সেই উত্তেজনার তৃপ্তির পক্ষে যথোচিত উপাদান বা ব্যবস্থাপনা নেই। আমরা বয়স্করা রুদ্ধশ্বাসে প'ড়ে উঠি, কিন্তু প'ড়ে উঠে মনে হয় যে আরো অনেক বিস্তার করলে, আরো অনেক বৈজ্ঞানিক আর মানবিক তথ্য যোগ করলে, তবে বিষয়টির প্রতি সুবিচার হ'তো, 'শিশু-সাহিত্য' হবার জন্য গল্পটা যেন বাড়তে পেলো না। এর মানে এ-কথা নয় যে কিশোর পাঠকের ভাগে কোথাও কম পড়লো; আমার বক্তব্য শুধু এটুকু যে এদের যেন বয়স্কোচিত গল্প হবারই কথা ছিলো, অবস্থাগতিকে ছিটকে পড়েছে শিশুসাহিত্যে*। অনেকটা এই রকমের ধারণা দেয় হাস্যরচনাও; সেখানেও, যেমন শিবরামের কোনো-কোনো গল্পে, অভিজ্ঞতাটা পাই বয়স্ক জীবনের, শুধু পরিবেশনটা কৈশোরোচিত।

শিবরাম চক্রবর্তীর উপাদান ছিলো প্রমাণসই হাস্যরসিকের, কিন্তু তিনি তাঁর পুরো আকারে পৌঁছতে পারলেন না, ঘটনাচক্রে—কিংবা হয়তো তাঁর স্বভাবেই একটা অসংশোধনীয় ছেলেমানুষি আছে ব'লে—শিশুসাহিত্যেই আবদ্ধ থাকলেন। অবশ্য 'বড়োদের জন্য'ও তিনি লিখেছেন,

* 'অবস্থাগতিকে' কথাটা অনুধাবনযোগ্য। অ্যাডভেঞ্চারঘটিত গল্প জমাবার মতো উপকরণ বাঙালির জীবনে বেশি নেই; পুরো মাপে লিখতে গেলেই সম্ভাব্যতার সীমা ডিঙোবার আশঙ্কা ঘটে। হয়তো এই কারণেই প্রেমেন্দ্র মিত্র এইচ. জি. ওএলসের অনুগামী হ'তে পারেননি, আর হেমেন্দ্রকুমারও স্টিভেনসনকে সাত হাত তফাতে রেখেছেন। জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে অ্যাডভেঞ্চার নামক পদার্থটা পশ্চিমবাসীর জীবনের মধ্যে সত্য, তাই তার সাহিত্যেও সেটা জীবন্ত হয়ে দেখা দিয়েছে। আমাদের পক্ষে ও-বস্তুটি এখনো অনেকটাই বানানো, অমূল কল্পনা বা ইচ্ছাপূরণ। এই একই কারণে, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের প্রশংসনীয় হুকা-কাশি সত্ত্বেও, বাংলা ভাষায় সত্যিকার গোয়েন্দা-গল্প এখনো হ'তে পারলো না, শুধু তার বিকৃতি জ'মে উঠলো কিশোর-সাহিত্যের কুপথ্যশালায়।

কিন্তু সে-লেখা তাঁর 'ছোটোদের' লেখারই আদিরসাত্মক প্রকরণমাত্র, এ ছাড়া আর তফাৎ কিছু নেই। এ-কথাটা প্রশংসার হ'লো না, কিন্তু আরো কিছু অপ্রশংসাকে শিবরাম যেন নেমন্তন্ন ক'রে ডেকে পাঠান ; তিনি যে মাঝে-মাঝে একটু ভিন্ন অর্থে লোক হাসান, তাঁর রচনাবলীর অনেকটা অংশ যে চর্বিতচর্বণ, শ্লেষ, যমক ইত্যাদি অলংকারগুলোকে তিনি যে প্রায় বিভীষিকার স্তরে নিয়ে গেছেন, এ-সব কথা বলার জন্য সমালোচকের প্রযোজন হয় না, তাঁর নাবালক পাঠকরাও তা বলতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত দোষ যোগ ক'রে দেখলেও তাঁর গুণের অংশ মলিন করতে পারে না, সব সত্ত্বেও এ-কথাটা সত্য থেকে যায় যে কৌতুকেব কলাক্ষেত্রে তাঁর স্বাক্ষর জাজ্বল্যমান, যেখানে তাঁর রচনা উৎকৃষ্ট —আর সে-রকম গল্পও সংখ্যায় তিনি অনেক লিখেছেন—সেখানে তাঁর হাস্যরস এমন দুর্বার যে তার আঘাতে পাকা বুদ্ধির দেয়ালসুদ্ধু ভেঙে পড়ে। শিববামের 'কালান্তক লাল ফিতা'—যেখানে আদালতের বূ্যহ থেকে সম্পত্তি উদ্ধারের চেষ্টা পরলোকে পৌঁছিয়ে দিয়েও থামলো না, বা 'পঞ্চাননের অশ্বমেধ'—সে-গল্পের শেষে 'ঘোড়াটা হাসতে-হাসতে ম'রে গেলো', বা যে-গল্পে তিনি কুশল প্রশ্নের নিক্তি-মাপা জবাব দেবার জন্য গাণিতিক ভাষা উদ্ভাবন করেছেন—এ-সব গল্প শিশুসাহিত্যের গণ্ডি পেরিয়ে বাংলা ভাষার কৌতুকসাহিত্যে স্থান পায়। তুলনীয় গল্প তাঁর আরো আছে, সমসাময়িক অন্য লেখকদেরও আছে ; উদাহরণত উল্লেখ করবো রবীন্দ্রলাল রায়ের 'দিনের খোকা রাতে', বা সেই জীবনের পক্ষে অতি সত্য গল্পটি, যেখানে নায়ক ছাতা ভুললেই ধারাবর্ষণ নামে আর বর্ষাতি নিলেই রোদ্দুর ওঠে দেখে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলো যে বিশ্বজগতে 'আমার জন্যই সব হচ্ছে' ;—সব মিলিয়ে বোঝা যায় যে আধুনিক লেখক উপাদানের জন্য বালকজীবনে আবদ্ধ থাকেন না, যদিও হাসির ভোজে ছেলে-বুড়োর অংশ থাকে সমান—কেননা এ-সব লেখায় ঠাট্টা থাকলেও উগ্রতা নেই। যা বিশেষ অর্থে ব্যঙ্গ নয়, শুধুই কৌতুক—এই বস্তুটি আমাদের শিশু-সাহিত্যেই প্রচুর হ'য়ে দেখা দিয়েছে, এ-কথাটি আনন্দের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করি।

উপরন্তু প্রমাণ মেলে যে ব্যঙ্গরচনাও ঝিমিয়ে পড়েনি। যোগ্য কারিগর আছেন অন্নদাশঙ্কর, যাঁর হাতে বাংলা দেশের সনাতন ছড়া নতুন ক'রে জেগে উঠেছে। আধুনিক কবির হাতে ছড়া বেরোতে পারে শুধু এই শর্তে যে তাতে তিনি বক্তব্য কিছু দেবেন, অথচ সেটুকুর বেশি দেবেন না যেটুকু এই হালকা ছোটো চটুল শরীরে ধ'রে যায়। একেবারে সারাংশ কিছু না থাকলে তা নেহাৎই শব্দের টুংটাং হ'য়ে পড়ে, আবার মাত্রা একটু বেশি হ'লেও ছড়া আর ছড়া থাকে না। অন্নদাশঙ্কর দু-দিকই ঠিক সামলে চলেন, তাঁর ছড়ার একরত্তি রূপের মধ্যে একটি ফোঁটা বস্তুও তিনি বসিয়ে দেন, সঙ্গে দেন কৌতুকের সেই আমেজটুকু, যার স্বাদ জিভে লেগে থাকে। তাঁর 'উড়কি ধানের মুড়কি' প'ড়ে সাবালক পাঠকের সবিস্ময় প্রশংসা জেগেছে ; সেই একই ঝাল-মিষ্টি-মেশানো মুড়মুড়ে ঠাট্টা আবার তিনি ছড়িয়েছেন 'রাঙা ধানের খৈ'তে, এ-খই 'ছোটোদের' ব'লে আলাদা ক'রে চেনা যায় না।* ছোটোদের ভিড় জ'মে উঠবে সন্দেহ নেই, কিন্তু ঠাট্টার সবটুকু রস শুধু বয়স্ক পাঠকই পাবেন, কেননা লেখকের বক্তব্যবিষয়ে 'কেশনগরে'র মশার কাঁদুনিটাই শেষ কথা নয়, বই জুড়ে ঝলক দিচ্ছে যুদ্ধকালীন পলিটিক্যাল ব্যঙ্গ, ভারতভঙ্গের বেদনা, আর উঁচু হ'য়ে ফুটে আছে একটি আশ্চর্য সুলিখিত নাটিকা, সেখানে লেখক, হাস্যমুখর ছন্দ চালিয়ে, পিষ্টক-গ্রাসী বিচারক বানরের পুরোনো নীতিকথায় ভারত-পাকিস্তান-ব্রিটিশ সম্বন্ধের বিবরণ দিয়েছেন। শিশুমহলে রাজনীতির প্রবেশ 'সন্দেশে'র সময়ে অভাব্য ছিলো, এখানেও এই দুই যুগের প্রভেদ বোঝা যায়।

কিন্তু এই প্রভেদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ লীলা মজুমদার। তার কারণ, তিনি নতুন যুগের স্বাদ এনেছেন, বিষয়গত বৈচিত্র্য দিয়ে নয়, রূপায়ণের অভিনবত্বে। নতুন বিষয়ের নিজস্ব একটি আকর্ষণ আছে, তার প্রভাবে লেখাটা গৌণ হ'য়ে যায় অনেক সময়, কিংবা ভুল কারণে মূল্য পায়। এই

* অন্নদাশঙ্করের ছড়া বা অজিত দত্তের 'নইলে' নামক উৎকৃষ্ট কৌতুকাবহ কবিতাটি, এ-সবের জাত আসলে হালকা কবিতার, ইংরেজিতে যাকে বলে লাইট ভর্স, সেখানে বিষয়টাতেই সাবালক মনের খোরাক থাকে।

আকর্ষণ লীলা মজুমদারে নেই, আর নেই ব'লেই তাঁর লেখায় দুই যুগের পার্থক্য স্পষ্ট হয়েছে—বস্তুর দিক থেকে নয়, চরিত্রের দিক থেকে। প্রেমেন্দ্রের মতো, বা অন্নদাশঙ্করের মতো তিনি অপূর্ব কোনো উপাদান আমদানি করেননি ; তিনি লিখেছেন সেই পুরোনো ছোটো ছেলেরই গল্প, যে-ছেলে চেয়ে ছাখে, অবাক হয়, স্কুলে যায়—যেতে চায় না ; এখানে কৃতিত্বটুকু সমস্ত তাঁর লেখায়, নতুনত্ব সমস্ত তাঁর দৃষ্টিতে। বিষয়বস্তুর মিল থাকলে পূর্বপর তুলনা করা সহজ হয়, এ-ক্ষেত্রে তার আরো একটা বড়ো রকমের সুবিধে আছে। লীলা মজুমদার সুকুমার রায়ের পিতৃব্যপুত্রী, রায়-চৌধুরীদের বংশগত দীপ্তি পেয়েছেন, কিন্তু এই 'পারিবারিক সাদৃশ্য' ছাড়াও তিনি বিশেষ অর্থেই সুকুমার রায়ের উত্তরসাধক। তাঁর 'দিনে দুপুরে'র সঙ্গে 'পাগলা দাশু' মিলিয়ে পড়লে তৎক্ষণাৎ কিছু সামান্য লক্ষণ ধরা পড়ে : সেই একই রকম চাপা হাসি, মুখ টিপে হাসি, নকল-গম্ভীর বাচন-ভঙ্গি, এমনকি সেই বালিকার বদলে বালক-মনেরই নেপথ্যলোকে আলো ফেলা। 'দিনে দুপুরে'র কুশীলব যে ছেলেরাই, কখনোই কোনো মেয়ে নয়, এতে একটু বিস্ময় জাগে, কোথায় একটু অভাব ব'লেই বোধ হয়—কিন্তু এই অভাব পূরণ ক'রে দেয় লেখিকার বালকজীবনের সহজবোধ, আর স্কুল-ছেলেদের অসাধু এবং বলশালী স্ল্যাং বুলিতে তাঁর এমন দখল, যাতে ফিরে-ফিরে তাঁর অগ্রজকেই মনে পড়ে।

এই সাদৃশ্যের পটভূমিতে লীলা মজুমদারের বৈশিষ্ট্য আরো উজ্জ্বল হয়েছে। মোটের উপর, পূর্বপুরুষের তুলনায়, তাঁকে মনে হয় বেশি অভিজ্ঞ, বেশি সচেতন, কিংবা যাকে ইংরিজিতে বলে সফিস্টিকেটেড—আশা করি কথাটায় কেউ অপরাধ নেবেন না। এর সমস্তটাকেই কালধর্মের প্রভাব ভাবলেও ভুল হবে, তাতে লেখকের স্বকীয়তাকে খর্ব করা হয়। যেমন তাঁর গল্পের স্বাদ 'পাগলা দাশু'র সীমাতিক্রান্ত, তেমনি সমসাময়িক কারো সঙ্গেও তাঁর সাদৃশ্য নেই। তিনিও কৌতুকের কারুকর্মী, কিন্তু শিবরামের মতো অতিরঞ্জনপন্থী নন, অন্নদাশঙ্করের ব্যঙ্গও তাঁর ধাতে নেই ; তাঁর গল্পে কখনোই আমরা চেঁচিয়ে হাসি না, কিন্তু আগাগোড়াই মনে-মনে হাসি—আর কখনো-কখনো শেষ ক'রে উঠে ভাবতে আরো বেশি ভালো

লাগে। এই কৌতুকের সঙ্গে কল্পনা এমন সুমিত হ'য়ে মিশেছে, এমনভাবে আজগবির সঙ্গে বাস্তবের মাত্রা ঠিক রেখে, আর এমন নিচু গলার লয়দার গদ্যের বাহনে, যে লীলা মজুমদারকে—তাঁর পরিমাণের মন-খারাপ-করা ক্ষীণতা সত্ত্বেও—বাংলা শিশুসাহিত্যে স্বতন্ত্র একটি আসন দিতে হয়।

৫

বাংলা শিশুসাহিত্যে দুই যুগ দেখিয়েছি; প্রথমে সরল, সংকলনপ্রধান, বিশুদ্ধরূপে শিশুসেব্য; তারপর উদ্ভাবনে নিপুণ, উপকরণে বিচিত্র, অংশত প্রবীণপাঠ্য। দুই যুগের চরিত্রভেদও দেখিয়েছি; বলতে চেয়েছি আধুনিক লেখক একান্তভাবে ছোটোদের জন্য লেখেন না, আর ছোটোরাও তেমন ছোটো আর নেই। এর সঙ্গে কিছু-কিছু 'তবে' 'কিন্তু' যোগ করা সম্ভব হ'লেও মোটের উপর এই বিভাগের যাথার্থ্য নিয়ে তর্ক ওঠে না। কিন্তু এই সীমাচিহ্ন, ইতিহাসের খুঁটি, এই সুবিধাজনক কাজ-চালানো ব্যবস্থা—সমস্ত ভেঙে পড়ে, অর্থ হারায়, যখন আমরা অবনীন্দ্রনাথের সম্মুখীন হই। দুই যুগে ব্যাপ্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গার সেতুবন্ধী সওদাগর। তাঁকে দুই শতকের অন্তর্বর্তী করেছে তাঁর আয়ুষ্কাল; লেখকজীবনের পরিধির মাপে তিন পুরুষের সমসাময়িক তিনি। তাঁকে উপেন্দ্রকিশোরের সতীর্থ ব'লে ভাবতে পারি, আবার আধুনিক রঙ্গমঞ্চেও তিনি প্রতীয়মান। উভয় যুগেরই চিহ্ন আছে তাঁর রচনায়, আরম্ভকালের লক্ষণ দেখি অনুরচনার উন্মুখতায়, আবার বর্তমানের ঝোঁক পড়েছে শিশুগ্রন্থের সর্বজনীন আবেদনে।

না—ভুল হ'লো, ঠিক কথাটি বলা হ'লো না। অবনীন্দ্রনাথ, বাল্যবঙ্গের রত্নবণিক তিনি, এ-কথা যেমন সত্য, তেমনি এ-বিষয়েও সন্দেহ নেই যে শিশুসাহিত্যের ফ্রেমের মধ্যে তাঁকে ধরানো যায় না। 'নালক', 'রাজ-কাহিনী', 'বুড়ো আংলা', 'আলোর ফুলকি', এ-সব বই আলাদা ক'রে ছোটোদের নয়, আলাদা ক'রে বড়োদেরও নয়; এখানেই তিনি খুঁজে পেলেন নিজেকে, বাস্তুভিটের দখল পেলেন। এটাই তাঁর ভাষা, তাঁর

মনের ভাষা, প্রাণের ভাষা ; এটাই তাঁর স্বর, তাঁর গলার স্বর, সত্তার স্বর ; এটাই—তিনি। যে-সব লক্ষণের কথা বলেছি, যেখানে-যেখানে দুই যুগেরই সঙ্গে তাঁর মিল দেখিয়েছি, আসলে সেগুলোই তাঁর মনের অভিজ্ঞান, তাঁরই চরিত্রের প্রমাণপত্র। যেকালে তিনি জন্মেছিলেন, যে-কুলে তিনি জন্মেছিলেন, সেখানে তাঁকে খুঁজতে গেলে দিশে মিলবে না, বড়ো জোর টুকরো ক'রে পাওয়া হবে। 'নালক' থেকে 'আপন কথা' পর্যন্ত বইগুলো যখন চিন্তা করি, তখন মনে হয় যে তাঁর মতো অখণ্ড চরিত্র নিয়ে আর-কোনো বাঙালি লেখক জন্মাননি, আর-কেউ নেই তাঁর মতো একই সঙ্গে এমন উদাসীন আর চকিতমনা, এমন দূরে থেকেও সংবেদনশীল। তাঁর জীবৎকালে কত হাওয়া উঠলো সাহিত্যে, কত হাওয়া ঘুরে গেলো, কিন্তু সে-সবের একটিও খড়কুটো দেখতে পাই না এখানে, কারোরই কোনো 'প্রভাব' ধরতে পারি না, পাশের বাড়ির রবি-কাকার পর্যন্ত না—যদিও সেই রবি-কাকারই উৎসাহে তিনি তুলিতে অভ্যস্ত হাতে প্রথম কলম ধরেছিলেন। সমসাময়িক পরিবেশের মধ্যে তিনি যেন থেকেও নেই ; তিনি লিখেছেন একলা ব'সে আপন মনে ঘরের কোণে, লিখেছেন যে-রকম ক'রে না-লিখেই তিনি পারেননি ; ভাবেননি সে-লেখা কার জন্য, কে পড়বে ;—কিংবা যদি-বা ছোটোদের কথা ভেবে থাকেন, সেই ছোটোরাও বিশ্বমানবেরই প্রতীক।

আরো বুঝিয়ে বলি কথাটা। যাঁরা সাবালকপাঠ্য লেখক, মাঝে-মাঝে ছোটোদের জন্য লেখেন, আর সেখানেও বয়স্ক জীবনের বক্তব্য বাদ দেন না, অবনীন্দ্রনাথ তাঁদের দলে পড়েন না। ইতিপূর্বে তাঁর নাম করেছি তাঁদের সঙ্গে, যাঁদের হাতে শিশুপাঠ্য রচনাও বড়ো অর্থে সাহিত্য হ'য়ে ওঠে, হ'য়ে ওঠে সাহিত্যশিল্পের চিরায়ত উদাহরণ। কিন্তু এখানেও একটু আলাদা ক'রে দেখতে চাই। একদিকে রাখতে চাই সুকুমার রায়, লুইস ক্যারলকে, যাঁদের লক্ষ্যভেদী রচনার লক্ষ্যটাই বেশি উঁচুতে ছিলো না, যাঁদের কৌতুকের সীমার মধ্যে গভীর কোনো বক্তব্যের স্থান নেই। আর অন্য দিকে আছেন হান্স অ্যাণ্ডারসেন, অবনীন্দ্রনাথ, যাঁদের শিশুসাহিত্যে জীবনের মূল্যায়ন পাই, বাণী শুনতে পাই মানবাত্মার উদ্দেশে। অর্থাৎ,

এঁরা সেই বিরল জাতের বড়ো লেখক, যাঁদের আত্মপ্রকাশের বাহনই হ'লো শিশুসাহিত্য। অবনীন্দ্রনাথ 'পথে-বিপথে'ও লিখেছিলেন—'বড়োদের' বই সেটি—কিন্তু সেখানে তাঁকে চিনতে পারি না—যেন তিনি অন্য মানুষ, রীতিমতো 'শিক্ষিত', 'ভদ্রলোক';—সেখানে মাঝে-মাঝে রবীন্দ্রনাথের বোল দেয়—এমনকি, বঙ্কিমেরও—ভ্রমণ-চিত্রের কোনো-কোনো অংশে ছাড়া, সেটি 'ভারতী'-গোষ্ঠীর যে-কোনো ভালো লেখকের রচনা হ'তে পারতো। আর তাঁর মুখে-বলা বই—'ঘরোয়া', 'জোড়াসাঁকোর ধারে', এদেরও মূল্য প্রধানত তথ্যগত, শিল্পগত নয়। কিন্তু যেখানে তিনি শিল্পী, স্রষ্টা, যেখানে তিনি আসল অর্থে মৌলিক, সেখানে তাঁকে দেখতে হ'লে আসতে হবে এই অনুরচিত বইগুলির কাছে—এই 'নালক', 'রাজকাহিনী', 'বুড়ো আংলা', 'আলোর ফুলকি' *—যে-সব বই তিনি লিখেছিলেন তাদেরই জন্য, যারা 'ছেঁড়া মাতুরে নয়তো মাটিতে বসে' গল্প শোনে, ইতিহাসের সত্যিকার 'রাজা-রানী-বাদশা-বেগম' যারা। তাঁর বিষয়ে এ-কথাও ঠিক বলতে চাই না যে তিনি ছোটোদের বই লিখতে গিয়ে সকলের বই লিখে ফেলেছেন, বলতে চাই তিনি প্রথম থেকেই সকলের বই লিখেছেন, শিশুর বইয়ের ছল ক'রে মানুষের বই লিখেছেন তিনি। তাঁর মনের মধ্যে সেই মানুষ ব'সে ছিলো—'সেই সত্যিকার রাজা-রানী-বাদশা-বেগম'—যে-মানুষ না-ছেলে, না-বুড়ো, কিংবা একই সঙ্গে দুই—যার বয়সের হিশেব নেবার কথাই ওঠে না, উপায়ও নেই—আজকের ভোরবেলাটির মতো নতুন আবার সভ্যতার সমান বুড়ো সেই রূপকথার চিরকালের যে শ্রোতা এবং নায়ক। আর এ-সব বই যে-ভাষায় তিনি লিখেছেন—যেটা তাঁর মনের ভাষা, প্রাণের ভাষা,—সে তো ভাষা

* এখানে 'ভূতপত্রী'র নাম করলুম না এইজন্য যে এ-বইটির গড়ন কিছু নড়বড়ে; গল্প, গুজব, পুরাণ, ইতিহাস, ভূগোল, আজগবি, এই সমস্ত মিলে-মিশে 'বুড়ো আংলা'র মতো নতুন এবং অবিকল একটা পদার্থ হ'য়ে ওঠেনি, কোথাও কোথাও অসংলগ্নতার দোষ ঘটেছে। (যেমন হারুন-বাদশার উপাখ্যানের সঙ্গে সাগরতলের মাসিবাড়ির গল্পটিকে শুধু বাইরে থেকে জুড়ে দেয়া হয়েছে, ভিতর থেকে ঘটকালি করা হয়নি।) অবশ্য এ-কথা বলার মানে এ নয় যে বইটির অন্যবিধ মূল্য বিষয়ে আমি সচেতন নই।

নয়, ছবি, সে তো ছবি নয়, গান ,—সুর তাতে রূপ হ'য়ে ওঠে, আর রূপ যেন সুরের মধ্যে গ'লে যায় ;—তাতে ছবির পর ছবি দেখি চোখ দিয়ে, আর কানে শুনি একটানা গান গুনগুন, গুনগুন ;—তার সম্মোহন কেউ নেই যে ঠেকাতে পারে। আর এই জাদুকর গদ্যে যা তিনি লিখেছেন, যা-কিছু লিখেছেন, তাতে বুদ্ধিঘটিত বস্তু কিছু নেই, তার আবেদন ভাবনার কাছে নয়, কল্পনার কাছে, আমাদের কৌতূহলে নয়, ইন্দ্রিয়ে—চেতনায়। এই লেখার রসগ্রহণের জন্য 'শিক্ষিত' হ'তে হয় না, 'অভিজ্ঞ' হ'তে হয় না ; মনের চোখ, মনের কান আর চলনসই গোছের হৃদয়টুকু থাকলেই যথেষ্ট। অর্থাৎ, নানা বয়সের নানা স্তরের মানুষের মধ্যে যে-অংশ সামান্য, সেই অংশই অবনীন্দ্রনাথের ছেঁড়া কাঁথার রাজপুত্তুর। তাই তাঁর শিশুগ্রন্থ সর্বজনীন।*

এই যিনি কথাশিল্পে রূপকার, সুরকার, বাংলা গদ্যের চিত্ররথ গন্ধর্ব যিনি, এবার তাঁকে বিশেষভাবে শিশুসাহিত্যের সংলগ্ন ক'রে দেখা যাক। প্রথমেই বলতে হয়—যা অন্য ভাবে আগেই বলা হয়েছে—যে অবনীন্দ্রনাথ বই লিখেছেন, ছোটোদের জন্য না, ছোটোদের বিষয়ে। হান্স আণ্ডারসেনের মতো, তিনিও প্রতিভাবান শিশুপ্রেমিক, পশুপ্রেমিক ; তাঁর বই আলো ক'রে আছে এক আশ্চর্য ভালোবাসা, যা এই দুই প্রাকৃত জীবের ভিতর দিয়ে বিশ্বজীবনে ছড়িয়ে পড়ে। 'খাতাঞ্চির খাতা'য় পুতু যেখানে 'হিজুলি-পাতার জামা বাতাসে মেলে দিয়ে', 'জোনাকপোকার মতো একটুখানি আলো' নিয়ে ঘরের মধ্যে উড়ে এসে 'ঝুমঝুম ক'রে ঘুঙুর বাজিয়ে' খেলতে লাগলো ; যেখানে, 'রাজকাহিনী'র নিষ্ঠুরতম হত্যার আগে, পাহাড়ের উপর ভাঙা কেল্লায় দুই নিরীহ দুর্ভাগা আফিংচি বুড়ো তাঁদের কুড়োনো

* ব্যতিক্রমস্বরূপ উল্লেখ করবো 'শকুন্তলা'। 'শকুন্তলা'য় কালিদাসকেই কেটে-ছেঁটে পাৎলা ক'রে বলা হয়েছে, লেখক নিজের কিছুই যোগ করেননি, নতুন কোনো সৃষ্টি নেই এখানে, তাই এটি সীমিত অর্থেই শিশু-পাঠ্য। পক্ষান্তরে, 'আপন কথা'কে 'ছোটোদের' বই ব'লে ভাবতে রীতিমতো প্রয়াসের প্রয়োজন হয় ; 'ছেলেবেলা'র মতো, এরও মূল্য বিষয়ে নয়, বিষয়ীতে, আর গদ্য ভাষার বিশেষ একটি প্রকরণকলায়। অবনীন্দ্রনাথের সব-চেয়ে পাৎলা-হাওয়ার বই এই 'আপন কথা' ; পড়তে-পড়তে মাঝে-মাঝে ঈষৎ হাঁপ ধরে।

কন্যাটিকে নিয়ে 'একটি পিদিমের একটুখানি আলোয় মস্ত একখানা অন্ধকারের মধ্যে' ব'সে আছেন, আর বুড়ো চাচার ছেলেবেলার গল্প শুনতে-শুনতে মেয়েটির 'চোখ ঘুমিয়ে পড়ছে'—সেখানে, আর এই রকমের আরো অনেক দৃশ্যে, আমরা যা অনুভব করি, যাতে দ্রব হই, নন্দিত হই, সেটা লেখকের এই মজ্জাগত গুণ—ঠিক গুণও নয়, তাঁর হৃদয়ের ক্ষরণ—তাঁর অপরিমাণ স্নেহ, উদ্বেল বাৎসল্য। এই স্নেহ পরতে-পরতে মিশে আছে তাঁর রচনায়, যেন ছাপার লাইনগুলির ফাঁকে-ফাঁকে ব'য়ে চলেছে, কিন্তু কোথাও-কোথাও ঢেউ উঠেছে বড়ো-বড়ো—সবচেয়ে বড়ো ঢেউ 'ক্ষীরের পুতুলে', ষষ্ঠীতলার সেই মহীয়ান স্বপ্নে, যেখানে লেখক বিশ্বশিশুর বর্ণনা দিতে-দিতে ছড়ার মন্ত্রে বাংলাদেশের প্রতিমায় প্রাণ দিয়েছেন। গল্পের উপসংহারের জন্য তুচ্ছ কোনো দৈব উপায় এটা নয়, গল্পের প্রাণের কথা এখানেই বলা আছে—এই স্বপ্নটিতেই অবনীন্দ্রনাথের আসল পরিচয়। এ তো স্বপ্ন নয়, দৃষ্টি, পরাদৃষ্টি—যাকে বলে vision—সেই একই, যে-দৃষ্টিতে ধরা পড়ে—'জগৎ-পারাবারের তীরে ছেলেরা করে খেলা।'

এই একটা জায়গায় বড়ো রকম মিল পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের। রবীন্দ্রনাথেও বাৎসল্যবৃত্তি অসামান্য, ব্যাপ্ত হ'য়ে, বিচিত্র হ'য়ে তা প্রকাশ পেয়েছে, যেন প্রাণের পেয়ালা উপচে পড়ছে বার-বার, নানা রসে, নানা ভাবে, নানা ভঙ্গিতে। তাঁর উপন্যাসে শিশুচরিত্র যেমন প্রচুর, তেমনি জীবন্ত; যেখানেই তারা দেখা দেয়, সেই অংশেই পুলক লাগে। 'গল্পগুচ্ছে'—শুধু 'কাবুলিওয়ালা' নয়, 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'ছুটি', 'রাসমণির ছেলে', এই রকম অনেক গল্পই স্নেহসূত্রে বিকশিত, 'পোস্টমাস্টার'ও—শেষ পর্যন্ত—তা-ই, আর মৃণ্ময়ী, গিরিবালা প্রভৃতি বালিকা-নায়িকাদের বিষয়ে নায়কের প্রণয় ছাপিয়ে প্রবল হ'য়ে উঠেছে লেখকের বাৎসল্যবোধ।* 'ছুটি'র ফটিককেই আবার আমরা

* অনেক সময় প্রেমের গল্পে লেখক নিজেই তাঁর নায়িকার প্রেমে পড়েন, কিন্তু—'নষ্টনীড়' বাদ দিলে—'গল্পগুচ্ছে' রবীন্দ্রনাথের মনের ভাবটি প্রেমিকের নয়, পিতার; তাঁর নায়িকাদের মধ্যে প্রিয়াকে ততটা দেখতে পাই না, যতটা কন্যাকে। বালক-বালিকার চরিত-কথা, 'সবুজপত্র' যুগের আগে পর্যন্ত, এখানে কিছু অত্যধিক মাত্রাতেই দেখা যায়।

দেখতে পাই 'দেবতার গ্রাসে'র রাখালে, 'খাতা'র উমাকেই চিনতে পারি 'পলাতকা'র 'চিরদিনের দাগা'য়, আবার 'পুনশ্চ'র 'শেষ চিঠি'তে। নাটকে কাঁচা হাতে আরম্ভ হ'লো 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', তারপর 'বিসর্জন'; তারপর শিশুর মুখে ঋষির কথা শোনালেন 'শারদোৎসবে', 'ডাকঘরে'। আর 'শিশু'—সেই হাসিকান্নায় বিনুনি-করা কবিতা, অমন হালকা, চপল, গভীর, সুদূরস্পর্শী, একাধারে অমন পার্থিব আর স্বর্গীয়, যার অনুরূপ অন্য কোনো লেখার অস্তিত্বের কথা আমি জানি না, যার পাশে উইলিয়ম ব্লেকের শৈশব-গীতিকাও একটু বিশেষ অর্থে 'ধর্মসংগীত' ব'লে মনে হয়—সেখানে স্নেহ, তার বাস্তবের রস ভরপুর বজায় রেখে, হ'য়ে উঠেছে পূজা, আর শিশু, রক্তেমাংসে প্রামাণ্য থেকেও, হ'য়ে উঠেছে ভগবানের সঙ্গে মানুষের মিলনের উপায়। রবীন্দ্রনাথ, যেমন তিনি গাছের পাতায় সোনার বরন আলোটিতেই চিরপ্রেমের অঙ্গীকার দেখেছিলেন, তেমনি রাঙা হাতে রঙিন খেলেনা দিয়ে তবেই বুঝেছিলেন বিশ্বসৃষ্টির আনন্দময় রহস্য।

কিন্তু এই তুলনার এখানেই শেষ। এই সহজাত স্নেহশীলতা, আর জীবনের মধ্যে চিরশিশুর উপলব্ধি—শুধু এই ভাবের দিকটিতেই সাদৃশ্য পাই অবনীন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথে; রূপায়ণের ক্ষেত্রে কিছুই মিল নেই। দু-জনের তফাৎ—মস্ত তফাৎ—এইখানে যে অবনীন্দ্রনাথের বই সর্বজনীন হ'য়েও আলাদা অর্থে ছোটোদেরও উপযোগী, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ—পাঠ্যপুস্তক বাদ দিয়ে—সত্যিকার ছোটোদের বই একখানাও লেখেননি। সেটা সম্ভব ছিলো না তাঁর পক্ষে, (তিনি যে বড্ড বেশি বড়ো লেখক।) আমি অবশ্য

দিদি', 'খাতা', 'আপদ', 'অতিথি', 'স্বর্ণমৃগে' বৈদ্যনাথের স্বহস্তে প্রস্তুত খেলার নৌকো, 'রাসমণির ছেলে'তে ব্যঞ্জনকারিণী মহার্ঘ মেম-পুতুলের সুন্দর ঘটনাটি—সমস্ত মিলিয়ে এই গ্রন্থ যেন স্নেহরসে পরিপ্লুত হ'য়ে আছে। আর এই শিশুচিত্রাবলী—শুধু 'গল্পগুচ্ছে' নয়—সমগ্রভাবে বাংলা সাহিত্যেই লক্ষণীয়: 'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে', শ্রীকান্ত-দেবদাসের বাল্যপ্রণয়, তারপর 'পথের পাঁচালি', 'রাণুর প্রথম ভাগ'—চারদিকে তাকিয়ে দেখলে ধরা পড়ে যে বাংলা কথাশিল্পের একটি বড়ো অংশ শৈশবঘটিত। হয়তো বাঙালির মনে স্বভাবতই বাৎসল্য বেশি; অন্তত কোনো-কোনো লেখক সার্থক হয়েছেন—দ্বন্দ্বজটিল বয়স্ক জীবনের ক্ষেত্রে নয়, শৈশবের সরল পরিবেশেরই মধ্যে।

ভুলিনি যে 'শিশু', 'শিশু ভোলানাথে'র কোনো-কোনো কবিতা ছোটোদের পক্ষে অফুরন্তভাবে উপভোগ্য, 'মুকুটে'র কথাও মনে আছে আমার—কিন্তু সে-কথা উঠলে সেখানেই বা থামবো কেন আমরা—কেন উল্লেখ করবো না 'ব্যঙ্গকৌতুক', 'হাস্যকৌতুক', তারপর 'অচলায়তন', 'শারদোৎসব', 'কথা ও কাহিনী,' এমনকি 'ডাকঘর', 'লিপিকা' আর শেষ পর্যন্ত 'গল্পগুচ্ছের'ই বা নাম করতে দোষ কী। প্রায় সব বয়সেই পড়া যায় কিন্তু এক-এক বয়সে এক-এক স্তরে পড়া হয়, এমন রচনার অভাব নেই রবীন্দ্রনাথে, কিন্তু শিশু-সাহিত্যের প্রসঙ্গে তাঁকে আনতে হ'লে বেছে নিতে হবে সে-সব বই, যেগুলো ভেবে-চিন্তে পাৎলা ক'রে লেখা, যাতে কৈশোরোচিত চেহারা অন্তত আছে। আর এই ক্ষেত্রেই স্পষ্ট দেখতে পাই যে রবীন্দ্রনাথ, যতই চেপে-চেপে লিখে থাকুন, নিজেকে কখনো ছাড়াতে পারেননি—কোনো মানুষই তা পারে না। 'সে', 'খাপছাড়া', 'গল্পসল্প', এদের আমি রাখবো—শিশুসাহিত্যের বিভাগে নয়, স্বতন্ত্র একটি শ্রেণীতে, (এদের বলবো প্রতিভাবানের খেয়াল, অবসরকালের আত্মবিনোদন, চির-চেনা রবীন্দ্রনাথেরই নতুনতর ভঙ্গি একটি।) 'ভূতপত্রী'র সঙ্গে 'সে', আর 'আবোল-তাবোলে'র সঙ্গে 'খাপছাড়া'র তুলনা করলে তৎক্ষণাৎ জাতের তফাৎ ধরা পড়ে; আগের বই দুটির স্বাচ্ছন্দ্য এখানে নেই, এরা বড়ো বেশি সাহিত্যিক, বড়ো বেশি সচেতন—এমনকি আত্মসচেতন; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামক যে-মহাকবি তিনি মাঝে-মাঝেই উঁকি দিয়ে যান, আর তাঁরই হাতের নতুন কৌশল আমরা অভিজ্ঞ পাঠকরা চিনতে পেরে খুশি হই। সুকুমার রায়ের, অবনীন্দ্রনাথের—'সে'-র মুখের কথা দিয়েই বলছি—'কেরামতিটা কম ব'লেই সুবিধা' ছিলো।

অবনীন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথের প্রতিতুলনায় আরো একটু যোগ করবো। রবীন্দ্রনাথের নানা দিকের মধ্যে শুধু একটি ছিলো শৈশব-সাধনা, আর অবনীন্দ্রনাথে এটি প্রায় সর্বস্ব, অন্তত—তাঁর সাহিত্যে—সর্বপ্রধান। তাঁর ভিতরকার বালকটিকে রবীন্দ্রনাথ কখনো ভুললেন না, আর অবনীন্দ্র তাকে হারিয়ে ফেলতে অস্বীকার করলেন। রবীন্দ্রনাথের শিশুকাব্য, হাওয়ার মতো হালকা, তিনি তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রেখেছেন পূর্ণপরিণত জীবনের

ওজন; আর অবনীন্দ্রনাথ, শৈশবের পরশমণি ছুঁইয়ে, জীবন নামক ব্যাপারটাকেই নির্ভার ক'রে তুলেছেন। বয়স্ক জীবনের বড়ো-বড়ো অভিজ্ঞতাকে স্থান দিয়েছেন তিনি—ঘৃণা, হিংসা, প্রেম—কিন্তু সেগুলোকে এমন ক'রে বদলে নিয়েছেন, এমন কোমল স্বপ্নের রঙে গালিয়ে নিয়েছেন, যে তাদের আর চেনাই যায় না অথচ ঠিক চেনাও যায়। 'আলোর ফুলকি'তে কত কথাই বলা আছে! সুরের বিরুদ্ধে অসুরের চক্রান্ত, আলোর বিরুদ্ধে পিশাচশক্তির, শিল্পীর নিষ্ঠা, পুরুষের বীর্য, নারীর ছলনা, নারীর ত্যাগ। স্ত্রী-পুরুষের মিলনের কথা—শুধু 'আলোর ফুলকি'তে নয়—বারে-বারেই দেখা দেয় তাঁর লেখায়, দেখা দেয় অনিবার্যভাবেই, সৃষ্টির এই মূলসূত্রটিকে দূরে রাখলে কিছুতেই তাঁর কাজ চলতো না। শিশুসাহিত্যে নিষিদ্ধ এই বিষয়টিকে তিনি 'গৃহীত' ব'লে ধ'রে নিয়ে নিঃশব্দ থাকেননি, কিংবা শুধু ভাবের দিক থেকেই দেখাননি তাকে, রীতিমতো তার ছবিও দিয়েছেন—সে-ছবি যেমন বাস্তব, তেমনি বস্তুভারহীন। মনে করা যাক 'বুড়ো আংলা'র সেই অর্থময় দৃশ্যটি, যেখানে খোঁড়া হাঁসের সঙ্গে সুন্দরী বালিহাঁসটির দেখা হবার পর, ওরা দু-জনে 'জলে গিয়ে সাঁতার আরম্ভ করলে',* আর একলা রিদয় পাড়ে ব'সে বেনার শিষ চিবোতে লাগলো; কিংবা—আরো ভালো—'রাজকাহিনী'তে গায়েব-গায়েবীর আশ্চর্য জন্ম-কথা—যেখানে 'কোটি কোটি আগুনের সমান' সূর্যদেবের আলো ক্রমশ ক্ষীণ হ'তে-হ'তে শুধু একটুখানি রাঙা আভা হ'য়ে 'সধবার সিঁদুরের মতো' সুভাগার বিধবা সিঁথি 'আলো ক'রে রইলো'—আর তারপরেই মানবীর কোলে জন্ম নিলো দেবতার সন্তান। এই প্রতীকচিত্র অবনীন্দ্রনাথ এঁকেছেন—আইনমাফিক শিশুসাহিত্যের সীমার মধ্যে থাকার জন্য নয়—তাঁর মনের ভাষাই ঐ-রকম ছিলো ব'লে। ও-রকম ক'রেই ভাবতেন তিনি,

* 'আলোর ফুলকি', 'বুড়ো আংলা', দুটি গ্রন্থই বিদেশী গল্পের অবলম্বনে লেখা। মূল গ্রন্থ দুটি আমার পড়া নেই, ঘটনাবিন্যাসে অবনীন্দ্রনাথের নিজের অংশ কতখানি তা আমি বলতে পারবো না। কিন্তু ঘটনাগুলির ভিতর দিয়ে যে-মন তাঁর প্রকাশ পেয়েছে, এই আলোচনার পক্ষে তা-ই যথেষ্ট।

ও-রকম ক'রেই দেখতেন, তাঁর স্বভাবই ছিলো রূপকথা ক'রে সব কথা বলা। যাকে তিনি গল্প বলেছেন, তিনি নিজেই সেই ছোটো ছেলে, তারই ঘুমে-ঢোলা, স্বপ্ন-জড়ানো অথচ স্বচ্ছ চোখ দিয়ে জগৎটাকে দেখেছেন তিনি ; তাঁর জগৎটাই শিশুর জগৎ, কিংবা শিশুজগৎ—বিরাট বিশ্বকে গুটিয়ে এনে এইটুকু কৌটোর মধ্যে তিনি ধরিয়ে দিয়েছেন। সেখানে সবই খুব ছোটো মাপের, বয়স্ক কিছু নেই, মায়েরা ছোটো মেয়ের মতো, দাড়িওলা রাজপুত রাজারা ঠিক যেন ছোটো ছেলেটি ; যেন বিচিত্র মানুষের মধ্য থেকে সামান্য লঘিষ্ঠ সংখ্যাটিকে বের ক'রে নিতে হ'লো, বড়ো এবং বুড়ো লোকদের মানিয়ে নেবার জন্য। নয়তো, এই একান্তরূপে প্রাকৃত জগতে, বয়স্কদের স্থান হ'তো না।

রবীন্দ্রনাথ দূর থেকে শিশুকে দেখেছেন, তার সঙ্গে বিচ্ছেদবোধে ব্যথিত হয়েছেন, বার-বার তৃষিত হয়েছেন তাকে ফিরে পাবার জন্য। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথে এই বিচ্ছেদটাই কখনো ঘটেনি। আর তাই, যেহেতু তিনি ছোটো ছেলের সঙ্গে এক হ'য়ে ছিলেন, তাঁর স্নেহের চেয়েও বড়ো হ'যে উঠেছে আর-একটি বৃত্তি : একটি আশ্চর্য শ্রদ্ধা, জীবনের প্রতি বিস্ময়ে ভরা শান্ত ধীর গভীর একটি সম্ভ্রম। এই হচ্ছে সেই চোখ, যে-চোখ সত্যিকার শিশুর, রূপকথার শিশু-মানুষের, যে পায়ের তলার পিঁপড়েটিরও কথা শুনতে থেমে দাঁড়ায়, বিশ্বজগৎকে বন্ধু ব'লে ধ'রেই নেয়—ধ'রে নিয়ে ভুল করে না। এ-চোখ দেখতে ভয় পায় না, দেখতে পেয়েও আকুল হয় না, এতে কাছে ডাকা নেই, দূরে রাখাও না—একই সঙ্গে নির্লিপ্ত ও ঘনিষ্ঠ, একে বলতে পারি প্রাণপদার্থের পবিত্রতাবোধ। আকাশের উঁচু পাড় থেকে যে-বাজ অমোঘ হ'য়ে নেমে আসে তাকেও এ নমস্কার জানায়, আবার পায়রার রক্তমাখা ছেঁড়া পালকটিকেও করুণা দিয়ে ধুয়ে দেয়। অবনীন্দ্রনাথের পশুচিত্রণ, তাঁর প্রকৃতির বর্ণনা, সবই এই উৎস থেকেই নিঃসৃত হয়েছে ; তাঁর পশুপাখিরা ব্যঙ্গকৌতুক উপদেশের উপায় নয়, তারা আছে ব'লেই মূল্যবান, আর ফুল, পাতা, জল, আকাশ—এরাও শুধু গয়না নয় তাঁর কাছে, শুধু মানুষের মনের আয়নারও কাজ করে না, এরা নিজেরাই প্রাণবন্ত, ব্যক্ত, ব্যক্তিত্বধারী ; তাঁর লেখায় 'বীর বাতাস'

. ব'য়ে যায়, আলো কথা 'বলেন',* 'বৃক্ষটি' ভঙ্গি ধ'রে 'দাঁড়ান', আর কুঁকড়ো হ'য়ে ওঠে—হ'য়ে ওঠেন—শুধু কি কুক্কুটকুলচূড়ামণি, শুধু কি একজন মহাশয় ব্যক্তি? শিল্পী, প্রেমিক, বীর, পুরুষ, রাজা—এত বড়ো চরিত্ররূপ যে তুচ্ছ একটা মোরগের মধ্যে ফুটে উঠতে পারলো, এতে মূল লেখকের যতটা অংশই থাক না, অবনীন্দ্রনাথের হৃদয়ের দানও দীপ্ত হ'য়ে আছে। সে-দান আর কিছু নয়, এই শ্রদ্ধা, যাতে নিখিলজীবন একসূত্রে বাঁধা পড়ে। অবনীন্দ্রনাথের নির্যাস এটি, তাঁর সমস্ত লেখার মজ্জাস্বরূপ; এরই জন্য—হান্স অ্যাণ্ডারসেনের মতোই—তিনি শিশু-পশুর গল্প ব'লে শোনাতে পেরেছেন অমৃতবাণী: সর্বজীবে দয়া, সর্বভূতে প্রেম, বিশ্বের সঙ্গে একাত্মবোধ।†

৬

এমন মত পোষণ করা সম্ভব যে শিশুসাহিত্য স্বতন্ত্র কোনো পদার্থ নয়, যেহেতু তা সত্যিকার সাহিত্য হ'লে বড়োরাও তাতে আনন্দ পান, আর সাবালক—এমনকি আবহমান সাহিত্যের একটি অনতিক্ষুদ্র বিচিত্র অংশের ছোটোরাও উত্তরাধিকারী। যে-সব গ্রন্থ চিরকালের আনন্দভাণ্ডার, ছোটোদের প্রথম দাবি সেখানেই—সেই রামায়ণ, মহাভারত, বাইবেল,

* এই 'তিনি'র আশ্চর্য ব্যবহার অবনীন্দ্রনাথে সর্বত্র পাওয়া যাও, 'নালকে'র একটি অংশ উল্লেখ করি। 'রাত ভোর হ'য়ে এসেছে, শিশিরে নুয়ে পদ্ম বলছে—নমো, চাঁদ পশ্চিমে হেলে বলছেন—নমো, সমস্ত সকালের আলো পৃথিবীর মাটিতে লুটিয়ে পড়ে বলছেন—নমো'—এখানে এই 'বলছেন'টা হঠাৎ যেন পুজোর ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়ে চ'লে যায়।

† অ্যাণ্ডারসেনের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের তুলনা বার-বার এসে পড়ছে। কিন্তু একটি পার্থক্য উল্লেখ করবো। খৃস্টান ঐতিহ্যে পাপবোধ প্রবল; যে-মেয়ে ঘাঘরা বাঁচাতে রুটি মাড়িয়েছিলো, আর লাল জুতা প'রে দেমাক হয়েছিলো যার, তাদের অতি কঠিন শাস্তি দিয়ে তবে অ্যাণ্ডারসেন পুণ্যালোকে পৌঁছিয়ে দিলেন। আর হৃদয়হীন নির্দয় ছেলেটার উপর গণেশের শাপ লাগলো বটে, কিন্তু যে-উপায়ে তার ত্রাণ হ'লো সেটা বিপদসংকুল হ'লেও মনোরম। হিন্দুর মনে নরকের ধারণা নেই; সেটা তার শক্তির কারণ, দুর্বলতারও।

আরব্যোপন্যাস, বিশ্বের পুরাণ, বিশ্বের রূপকথা আর সেইসঙ্গে আধুনিক-কালের ভাস্বর চিত্রাবলী—ডন কুইক্সট, রবিনসন ক্রুসো, গালিভার। শিশু-সাহিত্যের বড়ো একটি অংশ জুড়ে এরাই আছে ; এই অমর সাহিত্যের প্রবেশিকাপাঠ শিশুলেখকের আত্মকৃত্য। পক্ষান্তরে, মৌলিক শিশুগ্রন্থ তখনই উৎকৃষ্ট হয়, যখন তাতে সর্বজনীনতার স্বাদ থাকে। অতএব, অন্তত তর্কস্থলে, সাহিত্য এই 'ছোটোবড়ো'র ভেদজ্ঞানকে অস্বীকার করা সম্ভব।

কিন্তু এই মত একটা জায়গায় টেঁকে না। যারা আক্ষরিক অর্থে শিশু, নেহাৎ বাচ্চা, এইমাত্র পড়তে শিখলো কিংবা এবারে পড়তে শিখবে, তাদের জন্যও বই চাই ; আর সে-সব বইয়ে সাহিত্যকলার সাধারণ লক্ষণ আমরা খুঁজবো না, আলাদা ক'রেই তাদের দেখতে হবে। কত ভালো ক'রে কাজ চলবে, কত সহজে ক-খ শিখবে ছেলেরা, তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাস্য শুধু এইটুকু ; তার বেশি চাহিদাই নেই। কিন্তু এখানেও, আশ্চর্যের বিষয়, বাঙালির মন সৃষ্টিশীলতার পরিচয় দিয়েছে ; বাংলার মাটিতে এমন মানুষ একজন অন্তত জন্মেছেন, যিনি একান্তভাবে ছোটোদেরই লেখক—সেই সব ছোটোদের, যারা কেঁদে-কেঁদে পড়তে শিখে হেসে-হেসে বই পড়ে। অবশ্য অশ্রুহীন বর্ণপরিচয় সম্ভব নয় ; ঠিক অক্ষর চিনতে হ'লে—চেনাতে হ'লে —আজ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরই আমাদের অবলম্বন ; কিন্তু তার পরে—এবং তার আগেও—মাতৃভাষার আনন্দরূপের পরিচয় নিয়ে প্রস্তুত আছেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার। মুখে বোল ফোটার সঙ্গে-সঙ্গে বাঙালি ছেলে তাঁরই ছড়া আওড়ায়—সেই ধাবমান অজগর আর লোভনীয় আম্রফলের চিরনূতন নান্দীপাঠ—মায়ের পরেই তাঁর মুখে-মুখে কথা শেখে। যোগীন্দ্রনাথ, তাঁর হাসিখুশির দানসত্র নিয়ে, তাঁর উৎসর্গিত শুভ্র জীবনের রাশি-রাশি উপচার নিয়ে, আজকের দিনে একজন লেখকমাত্র নেই আর, হ'য়ে উঠেছেন বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠান, শিশুদের বিশ্ববিদ্যালয়। ঠিক তাঁর পাশে নাম করতে পারি এমন কোনো বিদেশী লেখকের সন্ধান আমি আজো পাইনি ; 'হাসিখুশি'র সঙ্গে তুলনীয় কোনো ইংরেজি পুস্তক এখনো আমাকে আবিষ্কার করতে হবে। অনুরূপ গ্রন্থে ইংরেজি ভাষা কত সমৃদ্ধ সে-কথা আমি ভুলে যাচ্ছি না ; সেই সাহিত্যের বৈচিত্র্য, উদ্ভাবনকৌশল

আর দক্ষতাকে শ্রদ্ধাও করি ;—কিন্তু শেষ পর্যন্ত দক্ষতাটাই অত্যধিক ব'লে মনে হয়, মনে হয় মাপজোক নিয়ে নিখুঁতভাবে কলে-তৈরি জিনিশ কিংবা লেখক-চিত্রক-মুদ্রকের সমবায়শ্রমের যোগফল। এইখানে যোগীন্দ্রনাথের জিৎ। তিনি প্ল্যান ক'রে বই লেখেননি, প্রাণ থেকে লিখেছিলেন ; তাঁর লেখা ঘনিষ্ঠভাবে তাঁরই, তাঁর হৃদয়ের স্পন্দনটি সেখানে শুনতে পাই— শিশুর জন্য অনবরত খিল-খুলে-রাখা দরাজ তাঁর হৃদয়। বই প'ড়ে শিশু-মনস্তত্ত্ব জানতে হয়নি তাঁকে, শিক্ষাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ হ'তে হয়নি ; বিভিন্ন বয়সের শিশুর মনের তারতম্য ঠিক কতটা, কিংবা সে-মনের উপর কোন রঙের কত মাত্রার প্রভাব কী-রকম, এ-সব বিষয়ের বৈজ্ঞানিক তথ্যে কিছুই তাঁর প্রয়োজন ছিলো না। শিশুর মন সহজেই তিনি বুঝতেন—তাঁর নাড়ির টানই ওদিকে ছিলো, আর সেই সঙ্গে রুচি ছিলো নির্ভুল, রচনা-শক্তি যথাযথ—যেটুকু হ'লে সংগত হয় সেইটুকুই, তার কমও না, বেশিও না। তাই তাঁর প্রতিটি বই ঠিক তা-ই, অতিতরুণ পাঠমালার যা হওয়া উচিত—আগাগোড়া শৈশবের রসে সবুজ, একেবারে কিশলয়ের মতো কাঁচা—লেখায় যেটুকু কাঁচা ভাব আছে, অপটুতাও আছে, তাও তার স্বাদের একটি উপকরণ, ওর চেয়ে 'পাকা হাত' হ'লে সে-হাতে অমন তার উঠতো না। অপটুতা মানে অক্ষমতা নয়—এমন নয় যে কিছু-একটা ইচ্ছে ক'রে তিনি পেরে ওঠেননি—তাকে বলতে পারি ঘরোয়া ভাব, সভাযোগ্য সৌষ্ঠবের বদলে গৃহকোণের অন্তরঙ্গতা যেন আটপৌরে হবার সুখ, দুপুরবেলা মাদুর পেতে শুয়ে মা যখন ছেলেকে ডাকেন, সেই অবসরের সতর্কতাহীন আরাম। যোগীন্দ্রনাথের রচনা এক'ন্তভাবে অন্তঃপুরের ;—স্কুলের নয়, পাঁচজনকে ডেকে শোনাবার মতোও না, যেন মা-ছেলের বিশ্রম্ভালাপের ভাষা—ঠিক তেমনি স্নিগ্ধকোমল সহাস্য তাঁর গলার আওয়াজ। ঐ আওয়াজটি ফরমাশ দিয়ে পাওয়া যায় না ব'লেই যোগীন্দ্রনাথের জুড়ি হ'লো না ; তাই এই বিভাগে, পথিকৃৎ হ'য়েও এখনো তিনি সর্বোত্তম। 'হাসিখুশি'র প্রতিদ্বন্দ্বিতার উচ্চাশা নিয়ে অনেক বই উঠলো পড়লো ; তার সর্বাধুনিক প্রকরণটি বর্ণবিলাসে জাজ্জ্বল্যমান। প্রকরণটি বিলেতি কিংবা মার্কিনি ; প্রসাধনসিদ্ধ, নয়নরঞ্জন ; এ-সব বই

ছবিরই বই, অন্তত ছবিটাই এখানে মুখ্য, আর লেখা নামক গৌণ অংশটি নির্দোষ হ'লেও, দক্ষ হ'লেও, তাতে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় না, লেখকের সঙ্গে শিশুর মনের অব্যবহিত সম্বন্ধটি নেই তাতে। আর বইয়ের পাতায় ইন্দ্রধনুকে উজাড় ক'রে দিলেও এই অভাবের পূরণ হয় না।

অন্য দিক থেকেও তফাৎ আছে। পড়া-শেখা পুঁথির সবচেয়ে জরুরি গুণ এই যে তা বস্তু-ঘেঁষা হবে, যাকে বলে কংক্রীট। এইটেই সব বইয়ে পাওয়া যায় না। অনেক ক্ষেত্রে ছবিটা শুধু ছবিতেই থাকে, আর সেইজন্য পাঠযোগ্যতা ক্ষুণ্ণ হয়। যেটা পাঠ্য বই, তাতে ছবিটা থাকা চাই লেখাতেই, রংটা লাগানো চাই ক্ষুদ্র এবং খুব সম্ভব অনিচ্ছুক পাঠকের মনটিতেই। সেই সঙ্গে দ্রষ্টব্য ছবি—থাকা ভালো নিশ্চয়ই, কিন্তু সেটা অতিরঞ্জিত হ'লে তাতে উদ্দেশ্যেরই পরাভব ঘটে। যদি বলি 'লাল ফুল, কালো মেঘ', সেটা তো নিজেই একটা ছবি হ'লো, মেঘলা দিনে মাঠের মধ্যে কোথাও একটি লাল ফুল ফুটে আছে এ-রকম একটা দৃশ্যেরও তাতে আভাস থাকে, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে টকটকে লাল হুবহু একটি গোলাপফুল বসিয়ে দিলে তাতে চোখের সুখ কল্পনাকে বাধা দেয়। এখানে উদ্দেশ্য হ'লো—চোখ ভোলানো নয়, চোখ ফোটানো, আর দেহের চোখ অত্যধিক আদর পেলে মনের চোখ কুড়ে হ'য়ে পড়ে, কল্পনা সবল হ'তে পারে না। মনে করা যাক 'জল পড়ে, পাতা নড়ে'—রবীন্দ্রনাথের সেই আদিশ্লোক, তাঁর জীবনের কবিতা পড়ার প্রথম রোমাঞ্চ যাতে পেয়েছিলেন তিনি—সেটি বটতলার ছাপায় ছিলো ব'লে আনন্দে কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি, বরং সেইজন্যই নিবিড় হয়েছে, অন্য কোনো উপকরণ ছিলো না ব'লেই বাণীচিত্র মূল্য পেয়েছে পুরোমাত্রায়। আমি অবশ্য নিশ্ছবিতার অনুমোদন করছি না; আমার বক্তব্য শুধু এই যে লেখার মধ্যেই ছবির যেন ইঙ্গিত থাকে, আর আঁকা ছবি সেই ইঙ্গিতকে ছাপিয়ে উঠে নষ্ট ক'রে যেন না দেয়, কল্পনাকে উশকে দিয়েই থেমে থাকে।* এখন যোগীন্দ্রনাথের লক্ষণ এই যে তাঁর লেখার

* বর্ণপরিচয় পুস্তকে ছবির স্থান কোথায় এবং কতটুকু, তার আদর্শ আছে রবীন্দ্রনাথের 'সহজ পাঠে'। যোগীন্দ্রনাথের বইগুলিও—লক্ষ্য করতে হবে—রঙিন কালিতে হ'লেও এক

মধ্যেই দৃশ্যতাগুণ ছড়িয়ে আছে : তাঁর বর্ণমালার উদাহরণে বিশেষ্য ছাড়া কিছু নেই, আর সেই বস্তুগুলিও অধিকাংশই সজীব, যথাসম্ভব পশুশালা থেকে গৃহীত—যেখানে শিশুর মন তৎক্ষণাৎ সাড়া দেয়—আর নয়তো শিশুজীবনের অন্তরঙ্গ পরিবেশ থেকে বাছাই-করা। 'কাকাতুয়ার মাথায় ঝুঁটি। খেঁকশিয়ালি পালায় ছুটি। গরু-বাছুর দাঁড়িয়ে আছে। ঘুঘুপাখি ডাকছে গাছে—' জীবজন্তুর মেলা ব'সে গেছে একেবারে, আবার মাঝে-মাঝে সুন্দর এক-একটি পারম্পর্য ধরা পড়ছে, যেমন ধোপার পরেই নাপিত, কণ্ঠকণ্ডূয়নী ওলের পরই ঔষধ, বা টিয়াপাখির লাল ঠোঁটের সঙ্গে ঠাকুরদাদার শীর্ণ গণ্ডের প্রতিতুলনা। বস্তুত, বর্ণমালার উদাহরণ-সংগ্রহে 'হাসিখুশি' এমনই অব্যর্থ যে ঐ একটি বিষয়ে বাংলা ভাষার উপাদান সেখানে নিঃশেষিত ব'লে মনে হয়; পরবর্তীরা—আজকের দিন পর্যন্ত—লিখেছেন ওরই ছাঁচে, নতুনত্ব যা-কিছু শুধু চেহারায়। কিন্তু ঐ ছাঁচটা এমন যে ওর মধ্যে একাধিকের সম্ভাবনা নেই—নেই ব'লেই প্রমাণ হয়েছে; যোগীন্দ্রনাথের একটি লাইনও 'আরো ভালো' করা যায় না, আর দীর্ঘ ঈ-তে ঈগলের বদলে ঈশান, বা ঋ-তে ঋষির বদলে ঋষভ লিখলে রকমারি হয় বটে, কিন্তু ব্যঞ্জনা হয় না, ছবিটা মারা যায়। তাই পরবর্তী কারো লেখাতেই স্বাদ পাওয়া গেলো না; 'হাসিখুশি' তার

রঙে ছাপা; নানা রঙের সমাবেশে চিত্তবিক্ষেপ ঘটে, পাঠক্রিয়া ক্ষুণ্ণ হয়। লেখার সঙ্গে ছবির সৌষম্যসাধনের আর-একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ 'আবোল-তাবোলে'র আদি সংস্করণ।

এই প্রবন্ধ লেখা হবার পর আমি মর্মঘাতীরূপে আবিষ্কার করলাম যে 'হাসিখুশি'র নতুনতম সংস্করণে এই তিন পুরুষের চেনা, প্রিয়, পুরোনো, অম্লান, অম্লেয় ছবিগুলির বদলে 'আধুনিক' ধরনের পটুত্ব-অভিমানী অপটু চিত্রাবলী আমদানি করা হয়েছে। আমি নিশ্চয়ই বলবো যে এটা স্যাক্রিলেজের পর্যায়ভুক্ত, পুরোনো পাথরের মন্দির ভেঙে নব্য ফ্যাশনের বিদেশী মার্বেলের তথাকথিত মন্দির-রচনার তুল্য। জানি না কোন দুর্বুদ্ধির প্ররোচনায় যোগীন্দ্রনাথের প্রকাশক এবং উত্তরাধিকারী এই কর্মটি করেছেন, কিন্তু সমস্ত সাহিত্যজগতের দোহাই দিয়ে তাঁদের কাছে আমার নিবেদন এই যে তাঁরা যেন পরবর্তী সংস্করণে পুরোনো ছবির পুনঃপ্রতিষ্ঠা ক'রে বাংলা সংস্কৃতির মুখরক্ষা করেন।

প্রসাদগুণে, প্রত্যক্ষতার গুণে, এমন জরাহীন জীবন্ত হ'য়ে থাকলো যে তার পরে অন্য ছাঁচের দ্বিতীয় একটি মৌলিক গ্রন্থ রচনার জন্য প্রয়োজন হ'লো আস্ত একজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিভা।

শুভক্ষণে 'সহজ পাঠ' লেখায় হাত দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রচনা-কালের দিক থেকে এটি 'সে', 'খাপছাড়া'রই সমসাময়িক, কিন্তু ও-দুটি গ্রন্থের আত্মসচেতন বৈদগ্ধ্যের কোনো চিহ্ন নেই এখানে; পাঠ্যপুস্তক ব'লে, এখানে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভাকে সীমার মধ্যে রেখেছিলেন, অথচ তার প্রয়োগে কোনো কার্পণ্য করেননি। এর ফলে সর্বাঙ্গে সার্থক হয়েছে 'সহজ পাঠ'—বাংলা ভাষার রত্নস্বরূপ এই গ্রন্থ, যেন প্রতিভার বেলাভূমিতে উৎক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র নিটোল স্বচ্ছ একটি মুক্তো। এর ছত্রে-ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে চারিত্র, আবার সেই সঙ্গে ব্যবহারযোগ্যতা, পরিশীলিত বিরল হাওয়ারই মধ্যে নিকটতম তথ্যচেতনা, মহত্তম বাণীসিদ্ধির সরলতম উচ্চারণ। কী ছন্দোবদ্ধ ভাষা, কী কান্তি তার, কী-রকম চিত্ররূপের মালা গেঁথে-গেঁথে চলেছে, অথচ কঠিনভাবে প্রয়োজনের মধ্যে আবদ্ধ থেকে, শিশুর মনের গণ্ডি কখনো না-ভুলে, বর্ণশিক্ষার উদ্দেশ্যটিকে অক্ষরে-অক্ষরে মিটিয়ে দিয়ে। পদ্যছন্দের বৈচিত্র্য, মিলের অপূর্বতা, অনুপ্রাসের অনুরণন*—সমস্তই এখানে এনেছেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু সমস্তই আঁটো মাপের শাসনের মধ্যে রেখেছেন, কোনোখানেই পাত্র ছাপিয়ে উপচে পড়েনি। ভেবে দেখা যাক একেবারে প্রথম শ্লোকটি—'ছোটো খোকা বলে অ আ। শেখে নি সে কথা কওয়া'—কেমন সহজ অথচ অবাক-করা মিল, আর এ-রকম শুধু একটিই নয়, এর পরেই মনে পড়ে 'শাল মুড়ি দিয়ে হ ক্ষ। কোণে ব'সে কাশে খক্ খ', আর—সবচেয়ে আশ্চর্য—সেই নরম, অনতিস্ফুট 'ঘন মেঘ ডাকে ঋ। দিন বড়ো বিশ্রী—' এই যেটা এখন মনে হয় 'ঋ'র সঙ্গে অনিবার্য এবং একমাত্র মিল, তার প্রতীক্ষায় কত কাল কাটাতে হ'লো বাংলা

* বর্ণপরিচয় পুস্তকে অনুপ্রাস-প্রয়োগ অপরিহার্য, তার প্রকটতাও এড়ানো সম্ভব নয়। কিন্তু 'সহজ পাঠে' অনুপ্রাস অনেকটা বিনীত হ'য়ে আছে, যেন অলক্ষ্যে কাজ ক'রে যাচ্ছে; কোথাও-কোথাও স্বর-ব্যঞ্জনের নমুনাগুলি, নিজেরা অনেকটা অগোচরে থেকে, দিয়ে যায় সাহিত্যেরই স্বাদ, ছন্দেরই আনন্দ।

ভাষাকে। পদ্য-ব্যবহারেও কারিগরি কিছু কম নেই—কোনো-কোনোটি 'ছন্দ' বইয়ে নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত হ'তে পারতো—'আলো হয় গেল ভয়'-এর ত্বরান্বিত বেগ, 'কাল ছিল ডাল খালি'র দু-রকমের দোলা, 'আমাদের ছোটো নদী'তে দীর্ঘায়িত 'বৈশাখ' শব্দটির সুখস্পর্শ, 'গঞ্জের জমিদার সঞ্জয় সেন। দু-মুঠো অন্ন তারে দুই বেলা দেন'—এই মাত্রিক পয়ারে পিংপং বলের মতো লাফিয়ে-ওঠা এক-একটি যুক্তবর্ণ। অথচ এর কিছুই অত্যন্ত বেশি স্পষ্ট হ'য়ে ওঠেনি, সমস্তটাই মূল উদ্দেশ্যের অধীন হ'য়ে আছে, নম্র হ'য়ে শিশুশিক্ষার কর্তব্যটুকু সম্পন্ন ক'রে যাচ্ছে। এই সমন্বয়গুণ—এটি আরো বেশি বিস্ময় জাগায় গদ্যের অংশে—বিস্ময়ের চমক সেখানে নেই ব'লেই, আপাতচোখে কারিগরিটা সেখানে অদৃশ্য ব'লেই। কিছু নয়, ছোটো-ছোটো কয়েকটি কথা পাশাপাশি বসানো, পদ্যের ঢেউও নেই, একেবারেই সমতল—হঠাৎ দেখলে মনে হ'তে পারে 'যে-কেউ' লিখতে পারতো, কিন্তু মনঃসংযোগ করামাত্র ধারণা বদলে যায়। 'বনে থাকে বাঘ। গাছে থাকে পাখি। জলে থাকে মাছ। ডালে থাকে ফল।' আর তারপরে মাত্রা-বদলে-যাওয়া 'বাঘ আছে আম-বনে। গায়ে চাকা-চাকা দাগ। পাখি বনে গান গায়। মাছ জলে খেলা করে।'—এই গদ্য লেখার জন্য রবীন্দ্রনাথের সত্তর বছরের অভ্যস্ত হাতেরই প্রয়োজন ছিলো; এর আগে 'লিপিকা' যিনি লিখেছেন, এবং এর পরে 'পুনশ্চ' যিনি লিখবেন, তাঁরই হাত থেকে বেরোতে পারে—'রাম বনে ফুল পাড়ে। গায়ে তার লাল শাল। হাতে তার সাজি। জবা ফুল তোলে। বেল ফুল তোলে। বেল ফুল সাদা। জবা ফুল লাল।' শুধু ছাপার অক্ষরে চোখ বুলিয়ে আশ মেটে না এখানে; এ-লেখা থেমে-থেমে, মনে-মনে পড়তে হয়, বলতে হয় গুনগুন ক'রে, এর সুন্দর সুনিয়ন্ত্রিত ছন্দটিকে মনের মধ্যে মুদ্রিত ক'রে নিতে হয়। আর এই ছন্দের ভিতরেই ছবির পর ছবি বেরিয়ে আসছে; বাঘ, মাছ, পাখি, ফুলের বাগানে লাল শালের উজ্জ্বলতা, জবার পাশে বেলফুল। যে-বয়সে ক-খ চিনলেই যথেষ্ট, সেই বয়সেই সাহিত্যরসে দীক্ষা দেয় 'সহজ পাঠ'; এই একটি বইয়ের জন্য বাঙালি শিশুর ভাগ্যকে জগতের ঈর্ষাযোগ্য বলে মনে করি।

৭

ছোটোরা কী চায়, কী পড়তে ভালোবাসে, আজ বাংলাদেশে তার সংখ্যাগণনা যদি নেয়া হয়, তাহ'লে বিচিত্র রকমের ফল পাওয়া সম্ভব। হয়তো তাদের মোহন-তালিকা খুঁজে পাওয়া যাবে ডট-ড্যাশ-বিস্ময়চিহ্ন-বহুল দুই অর্থে বীভৎস হত্যাকাহিনীতেই; কিম্বা, দৈনিক পত্রের শিশু-বিভাগ এবং সাধারণভাবে শিশু-পত্রিকার সাক্ষ্য থেকে, হয়তো প্রমাণ হবে যে ছোটোরা বেজায় কাজের লোক হ'য়ে উঠেছে আজকাল, বড্ড হিশেবি, নেহাৎই শুধু গল্প-কবিতা প'ড়ে ঠ'কে যাবার পাত্রটি আর নেই; 'দেশের উন্নতি', 'সমাজ-সংস্কার', এই রকম সব গুরুতর বিষয়ে ইস্কুলমাস্টারি এখন চায় তারা, আর সেই ভাতের বদলে পাথর-কুচি গলাধঃকরণ করার জন্য তার সঙ্গে চায় মাছি-আটকানো চিটগুড়ের মতো বিশুদ্ধ ন্যাকামির পলেস্তারা। কিন্তু এ-রকম দুর্লক্ষণ—শুধু তো শিশুসাহিত্যে বা সাহিত্যে নয়—দেশের মধ্যে চারদিকেই উগ্র হ'য়ে উঠেছে: কী সংগীতে, কী সিনেমায়, কী-বা দোল-দুর্গোৎসবে অথবা পঁচিশে বৈশাখের পুতুল-পুজোয়, রুচিহীনতার বিষব্রণ আজ সর্বত্রই প্রকট। এই দৃশ্যে ভাবুক ব্যক্তির মন-খারাপ হ'তে পারে, উদ্বেগেরও কারণ নেই তা নয়; পাছে, গণতন্ত্রের কৃষ্ণপক্ষে, মন্দই প্রবল হ'য়ে উঠে ভালোকে চেপে দেয় এই আশঙ্কায় বিশ্বের সুধীচিত্ত আজ দোদুল্যমান। তবে আশার কথা এই যে সাহিত্য-ব্যাপারে সংখ্যা-গণনায় ঠিক ছবিটা পাওয়া যায় না; কেননা, ঐকাহিকের আবেদন যেমন বিপুল, তেমনি মানুষের মনে অমৃতের তৃষ্ণাও দুর্বার, আর সেই তৃষ্ণার তৃপ্তি হ'য়ে, প্রতিভূ হয়ে, যুগে-যুগে শিল্পীরা আসেন জীবনধর্মেরই আপন নিয়মে, তার প্রেরণা কোনোকালেই রুদ্ধ হয় না। বিশেষত, বাংলা শিশু-সাহিত্যের কৃতিত্ব অসামান্য, তার সাম্প্রতিক বিকৃতি সেখানে অকিঞ্চিৎকর। এমনও বলা যায় যে আমাদের সমগ্র সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ অংশই শিশুসাহিত্য; অন্ততপক্ষে এটুকু সত্য যে ছোটোদের ছোটো খিদের মাপে বাংলা ভাষায় সুপথ্য যত জমেছে, সে-তুলনায় সুপরিণত সবল মনের ভারি খোরাক এখনো তেমন জোটেনি। এর কারণ—কেউ হয়তো বাঁকা

ঠোঁটে বলবেন—আমাদের জাতিগত ছেলেমানুষি এখনো ঘোচেনি ; কিন্তু আমি বলবো এই শৈশবসিদ্ধি শান্তশীল গৃহস্থ বাঙালির চিত্তবৃত্তিরই অন্যতম প্রকাশ। বাংলা শিশুসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য এই যে এই ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছে সারা দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোনো-কোনো বুদ্ধি, মহত্তম কোনো-কোনো মন : যার আদিপুরুষ বিদ্যাসাগর, যাকে রবীন্দ্রনাথ নানা স্থলে স্পর্শ ক'রে গেছেন, যাতে আছেন অবনীন্দ্রনাথের মতো শিল্পী, আর সুকুমার রায়ের মতো রসিক, তার দুটো-একটা রোগলক্ষণে ভীত হবার কারণ দেখি না, কেননা তার আপন ঐতিহ্যেই আরোগ্যশক্তি সঞ্চিত আছে।

১৯৫২

বাংলা ছন্দ

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত একবার বলেছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্যের সিদ্ধিদাতা গণেশ।' এ-কথা যে কত সত্য তা, যত দিন যাবে ততই গভীর ভাবে আমরা উপলব্ধি করবো। শুধু যে সাহিত্যের শিল্পগত আদর্শই রবীন্দ্রনাথের রচনায় মূর্ত হয়েছে তা নয়, শিল্পের উপাদান যে-ভাষা সে-ভাষাও তাঁরই সৃষ্টি। সকলেই জানেন যে সাধারণ জীবনের ব্যবহারিক ভাষা আর সাহিত্যের ভাষা এক নয়, আবার গদ্যের ভাষা আর কাব্যের ভাষাতেও পার্থক্য আছে। গদ্যকাব্যের সার্থকতা স্বীকার করি, তবু এ-কথাও সত্য যে কাব্যের প্রধান বাহন ভাষার সেই সুনিয়ন্ত্রিত বেগবিকশিত ভঙ্গি, যার নাম ছন্দ। প্রথমেই মেনে নিতে হবে যে ছন্দ জিনিশটা কৃত্রিম নয়, মিল অনুপ্রাসাদি আনুষঙ্গিক অলংকার নিয়ে শুধুমাত্র একটা কৌশলও নয়, কাব্যের প্রাণের সঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্য সংযোগ। কোনো-একটা কথা আবেগ দিয়ে বলতে গেলে ছন্দ এসে পড়ে স্বভাবেরই অনতিক্রম্য আকর্ষণে; আবেগের আঘাতে ভাষা যে স্বতই ছন্দে তরঙ্গিত হ'য়ে ওঠে, তার প্রমাণ রত্নাকর দস্যুর কাহিনীতে শুধু নয়, সাহিত্যের ইতিহাসেও আছে। ইংরেজি সাহিত্যে এলিজাবেথীয় যুগে এবং উনিশ শতকে যখন কাব্যপ্রেরণার বান ডেকেছিলো, তখন ছন্দের ধ্বনিবিলাস হিল্লোলিত হ'য়ে উঠেছিলো সুপ্রচুর বৈচিত্র্যে, আর মাঝখানকার আঠারো শতকে কাব্যের প্রেরণা যখন নিস্তেজ, ছন্দের বীণাও তখন চুপ ক'রে রইলো, হিরোয়িক কপলেট ছাড়া আর-কোনো সুর বাজলোই না। পুরোনো অ্যাংলো-স্যাক্সন কবিতায় একটিমাত্র আনুপ্রাসিক ছন্দ পাওয়া যায়, কিন্তু তার চেয়েও প্রাচীন গ্রীক ও সংস্কৃত কাব্যে ছন্দোবৈচিত্র্যের কথা সর্বজনবিদিত। অ্যাংলো-স্যাক্সন কবিতায় বলবার কথাও বেশি ছিলো না, পোপ ড্রাইডেনের কবিতাও বুদ্ধিপ্রসূত ব্যঙ্গচাতুর্যে সীমাবদ্ধ। আমাদের সাহিত্যে 'পয়ার ত্রিপদীর বাঁধন' ভেঙে নতুন ছন্দ জাগলো বৈষ্ণব কাব্যে, তারপর রবীন্দ্রনাথ যে-ছন্দোবৈচিত্র্য আনলেন তা পূর্বযুগে কল্পনা করাও সম্ভব ছিলো না। ছন্দের এই বৈচিত্র্যকে শুধু একটা কারুকলার চর্চা মনে করলে ভুল হবে; তা শুধু উপায়-

নৈপুণ্য বা টেকনীকের উৎকর্ষ নয়, কবির চিত্তস্ফূর্তিরই অনুরণন সেটা, দেশের জেগে-ওঠা কাব্যপ্রতিভার অদম্য আনন্দধ্বনি। প্রতিভা যখন পাংশু, বক্তব্য যখন গদ্যজাতীয়, তখন একটি মোটারকমের ছন্দেই কাজ চ'লে যায়, কিন্তু যখন বলবার কথা এত জ'মে ওঠে যে মনে হয় ব'লে আর শেষ করা যাচ্ছে না, প্রতিভার সেই ঐশ্বর্যকে ধারণ করার জন্যই মালিনী শিখরিণী মন্দাক্রান্তার উল্লাস। 'তোমায় সাজাবো যতনে কুসুমে রতনে কেয়ূরে কঙ্কণে কুঙ্কুমে চন্দনে—' এ-কথা কবি যখন তাঁর কবিতাকেই বলেন, আনন্দের সেই আবেগ থেকেই ভাষার ভিতরে নানা ছন্দের ধ্বনিসংঘাত জেগে ওঠে।

বাংলা ছন্দের যে মাধুর্যমণ্ডিত বিচিত্রতা আজ দেখতে পাচ্ছি, তা যে সিদ্ধিদাতা রবীন্দ্রনাথেরই সৃষ্টি, এ-বিষয়ে কারো মনে এখনো যদি সংশয় থাকে, 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' প'ড়ে সে-সংশয় আশা করি দূর হবে। সৃষ্টি মানে বৈজ্ঞানিক অর্থে আবিষ্কার নয়, সে-কথা বলা বাহুল্য হ'লেও বলতে হচ্ছে, কেননা এক শ্রেণীর পাঠক কথার আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করতেই ভালোবাসেন। বাংলা ছন্দের যে-তিনটি মূল ধারা আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রাক্-রবীন্দ্র বাংলা কাব্যে সে-তিনটিরই প্রচলন ছিলো : রবীন্দ্রনাথ ভাঙাচোরাকে সুসম্পূর্ণ করেছেন, এবড়োখেবড়োকে পরিমার্জিত করেছেন, সমস্তটিকে সুসংগত ক'রে মিলিয়েছেন আধুনিক বাংলা ভাষার প্রকৃতির সঙ্গে ;— শুধু তা-ই নয়, তিনটি ধারারই স্বরূপ তাঁর কবিচৈতন্যে প্রতিভাত হয়েছে এমনভাবে যে পুরোনো ছন্দের নব-নব বিস্ময়কর প্রকরণ অবিরাম তরঙ্গ তুলেছে তাঁর কাব্যে সংগীতে গীতিনাট্যে, শেষ দিন পর্যন্ত তার বিরাম ছিলো না। বাংলা ছন্দের অফুরন্ত বৈচিত্র্যের দুয়ার খুলে দিয়েছেন তিনি ; সে-বৈচিত্র্যে আজকের দিনে আমরা এতই অভ্যস্ত যে তার বিস্ময়করতা সম্বন্ধে সব সময়ে আর সচেতন থাকি না, কিংবা এ-কথাও সব সময়ে মনে পড়ে না যে রবীন্দ্রনাথই এই বৈচিত্র্যের উৎসস্থল। 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' লিখে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন এই দুটি বিষয়েই আমাদের মনকে নতুন ক'রে জাগিয়ে দিলেন ব'লে তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

প্রবোধচন্দ্র যাকে বলেন যৌগিক ছন্দ আর সাধারণত যাকে বলা হয় পয়ার, তার প্রকৃতি মধুসূদন বুঝেছিলেন ; প্রবোধচন্দ্র যাকে বলেন স্বরবৃত্ত,

আমাদের লোকসাহিত্যে ও মেয়েলি ছড়ায় তার প্রাণপূর্ণ প্রাচুর্য দেখা যায় : বাংলা ছন্দের এই দুটি বিভাগে রবীন্দ্রনাথ একতলার উপরে চারতলা পাঁচ-তলা তুলেছেন, কিন্তু নূতন ভিত্তি স্থাপন করেননি ; মৌল উপাদান অবলম্বনে বৈচিত্র্যবিকাশে তাঁর নূতনত্ব, নূতন উপাদানের প্রবর্তনায় নয়। কিন্তু তিন মাত্রার ছন্দে (প্রবোধচন্দ্রের ভাষার মাত্রাবৃত্ত) রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কর্তার আসন দেয়া যায়—কেননা যুক্তবর্ণকে দুই মাত্রার মূল্য দিলে তবেই যে এ-ছন্দের আসল রূপটি ফোটে, এ-কথা পূর্ববর্তী কোনো কবির মনেই ধরা পড়েনি, না বৈষ্ণব কবিদের, না হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বা বিহারীলাল চক্রবর্তীর, 'মানসী'র আগে ঠিক রবীন্দ্রনাথেরও না। প্রথম থেকেই এ-ছন্দ রবীন্দ্রনাথের প্রিয়, প্রথম থেকেই এ-ছন্দে সংশ্লিষ্ট যুক্তবর্ণ তাঁর কানে খারাপ লেগেছে, এবং সেই কর্ণপীড়ার প্ররোচনায় প্রথম-প্রথম তিনি যুক্তবর্ণ যথাসম্ভব এড়িয়ে চলেছিলেন, কিন্তু তাতে কেমন-একটা ঝিমিয়ে-পড়া একঘেয়ে ভাব এলো, কান খুশি হ'তে পারলো না। এ-ছন্দে যুক্তবর্ণকে দু-মাত্রা ধরলেই যে সমস্যার সমাধান হয়, এ-সত্যটি রবীন্দ্রনাথ যেদিন পেলেন সেদিন বাংলাভাষায় নতুন একটি ছন্দের জন্ম*

* জানতে কৌতূহল হয় সে-দিনটি কোন দিন, অর্থাৎ প্রথম কোন কবিতায় মাত্রাবৃত্তে যুক্তবর্ণের রহস্য তিনি আবিষ্কার করেন। এ-বিষয়ে নিশ্চিতভাবে বলতে হ'লে আমার চেয়ে নিপুণ গবেষকের প্রয়োজন, কিন্তু আমি যতদূর সন্ধান করতে পেরেছি, তাতে মনে হয় এই নবজন্ম তখনই ঘটলো যখন 'কড়ি ও কোমলে'র 'বিরহ' ('আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন') কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—

কত শারদ যামিনী হইবে বিফল
বসন্ত যাবে চলিয়া।…
এই যৌবন কত রাখিব বাঁধিয়া
মরিব কাঁদিয়া রে।

এর পরবর্তী 'মায়ার খেলা'ও এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় :

আজি বিরহ-রজনী ফুল্ল কুসুম শিশির-সলিলে ভাসে।

অবশ্য 'মানসী'র আগে এ-রকম উদাহরণ স্বল্প ; এই সূত্রের ব্যাপক প্রয়োগ ঐ গ্রন্থেই প্রথম ব'লে এ-বিষয়ে প্রবর্তকের সম্মান দিতে হয় 'মানসী'কেই।

হ'লো। নতুন এই অর্থে যে তার কোনো উদাহরণই পূর্ববর্তী সাহিত্যে ছিলো না। কেননা এ-ছন্দে যুক্তবর্ণকে দু-মাত্রা ধরা আর না-ধরায় যে জাতেরই তফাৎ হ'য়ে যায়, আজকের দিনে আশা করি তা কাউকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। আর এ-কথাও সুবিদিত যে যুগ্মধ্বনির আঘাতে-সংঘাতে এই মাত্রাবৃত্ত ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ জীবন ভ'রে এমন ক'রে খেলিয়েছেন যেমন ক'রে সাপুড়ের বাঁশিও সাপকে খেলায় না। মাত্রাবৃত্তের বিভিন্ন উপবিভাগের প্রবোধচন্দ্র সুন্দর বর্ণনা করেছেন, এ-প্রসঙ্গে তাঁর বিশ্লেষণ তীক্ষ্ণ, সিদ্ধান্তও প্রায়ই নির্ভুল, যদিও—

আজি বর্ষা গাঢ়তম নিবিড় কুন্তল সম
মেঘ নামিয়াছে মম দুইটি তীরে

এখানে 'বর্ষা ও কুন্তল...এই সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনিগুলি যেন উপলখণ্ডের মতো ছন্দের অবাধ ধ্বনিপ্রবাহের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করছে। বস্তুত সমস্ত কবিতাই যেন যৌগিক ও মাত্রিক রীতির মধ্যে কেমন অব্যবস্থিত ভাবে দোদুল্যমান হয়ে আছে'—প্রবোধবাবুর এ-মন্তব্য সম্বন্ধে আমার একমাত্র বক্তব্য হচ্ছে—না। কবিতাটি রীতিমতো যৌগিক রীতিতে রচিত, সুচিন্তিত ও সুবিন্যস্ত, মাত্রিকের আভাসমাত্র নেই, 'বর্ষা' ও 'কুন্তল' শব্দ ছন্দের ধ্বনিপ্রবাহে 'বাধা সৃষ্টি' করেনি, আঘাতের উত্তেজনা এনেছে। তাছাড়া এখানে শুধু বর্ষা ও কুন্তল শব্দে যুগ্মধ্বনি সংশ্লিষ্ট হয়নি, 'গাঢ়' শব্দেও হয়েছে। 'হৃদয়-যমুনা'য় যুগ্মধ্বনি অপেক্ষাকৃত কম এবং এক জায়গায় 'শব্দ' বিশ্লিষ্ট ক'রে 'শবদ' লেখা আছে ব'লেই কি প্রবোধবাবু এর মাত্রিক উন্মুখতা কল্পনা করেছেন?

২

যুক্তবর্ণের প্রসঙ্গটা একটু ভেবে দেখা যাক, কেননা যুক্তবর্ণের মূল্যের ভিন্নতার উপরেই বাংলা ছন্দের রীতিবৈচিত্র্যে অনেকখানি নির্ভর করে। কিন্তু প্রথমেই তর্ক উঠতে পারে যুক্তবর্ণ কথাটা নিয়ে। ছেলেবেলার অভ্যাসদোষে আমরা বহুকাল পর্যন্ত নিশ্চিন্তমনে যুক্তাক্ষর কথাটা ব্যবহার ক'রে আসছিলাম, প্রবোধচন্দ্র এসে সেটাকে একেবারে উড়িয়ে দিলেন, তিনি বললেন, 'যুগ্মধ্বনি'। তাঁর ধমক খেয়ে যুক্তাক্ষর কথাটা মুখে আনতে আমাদের আর সাহস হয় না, রবীন্দ্রনাথও দু-একবার যুক্তাক্ষর ব'লেই সামলে নিয়েছেন, কখনো বলেছেন যুগ্মধ্বনি, কখনো যুক্তবর্ণ, কখনো যুক্তব্যঞ্জন। যদি যুগ্মধ্বনি বলতে সমস্তটাই বোঝাতো, তাহ'লে অন্য কোনো শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজনই হ'তো না। যুক্তবর্ণ ছাড়াও যুগ্মধ্বনি হ'তে পারে, বাংলা হসন্ত শব্দে যুগ্মধ্বনির ছড়াছড়ি, কিন্তু যুক্তবর্ণ, শাবেক কালে যাকে যুক্তাক্ষর বলতুম, তার মূল্যভেদেই পয়ারের গাম্ভীর্য ও মাত্রাবৃত্তের ঝংকার। যুগ্মধ্বনি বললে কথাটা অস্পষ্ট থেকে যায়। যেমন—

মহাভারতের কথা অমৃতসমান
কাশীরাম দাস কহে শোনো পুণ্যবান।

এখানে 'তের' 'মান' ইত্যাদি যুগ্মধ্বনি আছে অনেকগুলি, যুক্তবর্ণ আছে একটি মাত্র, 'ণ্য'। ঐ 'ণ্য'-এর মূল্যভেদেই পয়ার আর মাত্রাবৃত্তে জাতের তফাৎ। কাশীরামের শ্লোকটাকে মাত্রাবৃত্তে ফেলে দেখা যাক :

মহাভারতের। অমৃতসমান। কথা
পুণ্যবানেরা। শোনে।

'তের' ও 'মান' এখানেও দু-মাত্রা, পয়ারেও তা-ই, কিন্তু 'ণ্য' পয়ারে এক, এখানে দুই। দেখা যাচ্ছে যে যুগ্মধ্বনির ব্যবহার পয়ারে ও মাত্রাবৃত্তে এক

রকম হ'তেও পারে, কিন্তু যুক্তবর্ণের ঘা লাগলেই প্রকট হ'য়ে ওঠে প্রভেদ। 'পুণ্য' কথাটা পয়ারে অনায়াসে দু-মাত্রায় চেপে বসেছে, মাত্রাবৃত্তে তা হবার উপায় নেই। এই কারণে যুক্তবর্ণ কথাটার সার্থকতা মানতে হয়। সব যুক্তবর্ণ ই যুগ্মস্বর, কিন্তু সব যুগ্মস্বরই যুক্তবর্ণ নয়। বাংলার বহুল যুক্ত-ব্যঞ্জন এবং 'ঐ' 'ঔ' 'এই' ইত্যাদি যুক্তস্বর—যুক্তবর্ণ বলতে এগুলোকেই বোঝায়, 'আজ', 'কাল', 'তার', 'এর' প্রভৃতি অসংখ্য হসন্ত শব্দের যুগ্ম-ধ্বনিকে নয়। পয়ারজাতীয় ছন্দে যুক্তবর্ণগুলির ওজন কখনো একমাত্রা, কখনো দু-মাত্রা, কিন্তু মাত্রাবৃত্তে যুক্তবর্ণের ওজন সর্বদাই দু-মাত্রা, এর কখনো ব্যতিক্রম হয় না—* এই দুই ছন্দের জাতিভেদের একটি সূত্র হ'লো এই। শুধু যুগ্মস্বর দিয়ে বিচার করলে এ-প্রভেদ সুস্পষ্ট হয় না, তাই যুক্তবর্ণকে আসরে আনতে হ'লো।

বাংলার যেটা লৌকিক ছন্দ, প্রবোধচন্দ্র যাকে বলেন স্বরবৃত্ত, এক দিক দিয়ে পয়ারের সে সধর্মী, অন্য দিক দিয়ে মাত্রাবৃত্তের সঙ্গে তার মিল। তার মাপটা মাত্রাবৃত্তের মতো আঁটোসাঁটো সুনির্দিষ্ট নয়, পয়ারের মতোই মাঝে-মাঝে তার অনেকখানি ফাঁক, কবি ইচ্ছেমতো তার খানিকটা ভরান খানিকটা ছেড়ে দেন—কিছু-কিছু ফাঁক থেকেই যায়, যা আমরা টেনে উচ্চারণ ক'রে ভরাট করি। স্বভাবের এই সাদৃশ্যের জন্য স্বরবৃত্ত পংক্তি মাঝে-মাঝে হুবহু পয়ারের চেহারা নেয়—আমাদের গ্রাম্য ছড়ার পদে-পদে তার উদাহরণ :

> সুবুদ্ধি তাঁতির ছিল, কুবুদ্ধি ঘনালো
> আক্রাবাড়ি নিয়ে তাঁতি ব্যাঙের ছাঁ মারিলো।...

* অবশ্য শব্দের আদিতে কোনো-কোনো যুক্তব্যঞ্জন নিঃসংশয়ে একমাত্রা—কী পয়ারে, কী মাত্রাবৃত্তে। 'ম্লান হ'য়ে এলো কণ্ঠে মন্দারমালিকা,' 'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান তার লাগি কাড়াকাড়ি'—এখানে 'ম্লান' ও প্রাণে'র যুক্তব্যঞ্জন দু-মাত্রায় উচ্চারণ করা সম্ভবই নয়। যুক্তস্বরের কথা আবার আলাদা—হোক সে শব্দের আদিতে, মধ্যে কি অন্তে—'ঐ', 'ঔ' পয়ারজাতীয় ছন্দে এক মাত্রা কিংবা দু-মাত্রা হ'তে পারে, মাত্রাবৃত্তে তার দু-মাত্রা বাঁধা।

আজিডাঙা কাজিডাঙা মধ্যে ধনেখালি
সেখান থেকে এলো ব্যাং চোদ্দ হাজার ডালি।

প্রথম ও তৃতীয় পংক্তির রীতিমতো পয়ার হবার কোনোই বাধা নেই, এমনকি, ও-দুই পংক্তি যদি পয়ারের মতো ক'রেও পড়ি তাহ'লেও সমস্তটার সুর কেটে যায় না। পয়ার-স্বরবৃত্তের এ-রকম হরিহর-মিলন রবীন্দ্রনাথেও লক্ষ্য করেছি, নিচের চার লাইনের মধ্যে দু-লাইনই স্বচ্ছন্দে পয়ারে চালান ক'রে দেয়া যায়:

ঘরেতে দুরন্ত ছেলে করে দাপাদাপি
বাইরেতে মেঘ ডেকে ওঠে, সৃষ্টি ওঠে কাঁপি।· ·
বাইরে কেবল জলের শব্দ ঝুপ ঝুপ ঝুপ
দস্যি ছেলে গল্প শোনে একেবারে চুপ।

এ থেকে বোঝা যায় যে পয়ারের সঙ্গে স্বরবৃত্তের খুব একটা ঘনিষ্ঠ রক্তের সম্বন্ধ আছে, স্বরবৃত্ত একটু শিথিল হ'লেই পয়ারের কাঠামোর মধ্যে ধ'রে যায়, আবার পয়ার কখনো-কখনো ঢেউ খেলিয়ে স্বরবৃত্ত হ'য়ে উঠতে পাবে, যেমন রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দের অর্থ' প্রবন্ধে। সেখানে 'বৃষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর'কে পয়ারে বেঁধে যে-শ্লোক তিনি বানিয়েছেন তার 'মন্দ-মন্দ বৃষ্টি পড়ে নবদ্বীপে বান' এ-পংক্তিটি সুচিন্তিত পয়ার হওয়া সত্ত্বেও অনায়াসেই ছড়ার ছন্দেও পড়া যায়।

মাত্রাবৃত্তের সঙ্গে স্বরবৃত্তের সাদৃশ্য যুগ্মধ্বনির মূল্যে: স্বরবৃত্তে যুগ্মধ্বনিমাত্রেরই ডবল মাত্রা স্বাভাবিক, হোক তা হসন্ত শব্দ কি যুক্তবর্ণ, মাত্রাবৃত্তে তা অনতিক্রম্য। মহাভারতের শ্লোকটাকে স্বরবৃত্তের ছাঁদে ফেলছি—

কাশীরামের মহাভারত পুণ্যবানে শোনে

এখানে 'মের' 'রত' আর 'ণ্য'-র সমান ওজন, তিন জায়গাতেই ডবল মাত্রার ঝোঁক পড়েছে। কিন্তু পয়ারের ঝোঁক যুক্তবর্ণের একমাত্রিক

উচ্চারণের দিকে, তাই যুক্তবর্ণের এলাকায় এসেই স্বরবৃত্ত পয়ারকে ছেড়ে মাত্রাবৃত্তের সঙ্গে আত্মীয়তা পাতালো। তার পয়ার-ঘেঁষা স্বভাব তবু ঘুচলো না; মাত্রাবৃত্তের সঙ্গে এটুকু তফাৎ রইলো যে একটু-আধটু কম-বেশিতেই সে ভেঙে পড়ে না, তাকে টেনে বাড়ানো এবং চেপে কমানো যায় ব'লে রচয়িতা এবং আবৃত্তিকার স্বাধীনতা পায় অনেকটা বেশি। যদি লেখা যায়

কাশীরামের মহাভারত গুণবানে শোনে

তাহ'লে স্বরবৃত্ত আপত্তি করে না, কিন্তু

মহাভারতের অমৃতসমান কথা
গুণবানেরা শোনে

এ-লাইন ভুল-ছন্দের উদাহরণস্বরূপ লিখতেও লজ্জা বোধ হয়। স্বরবৃত্তের হালকা হ'তে যেমন আপত্তি নেই, তেমনি তার উপর এতখানি বোঝাও চাপানো সম্ভব হয়েছে যাতে যুক্তবর্ণের উচ্চারণ সংশ্লিষ্ট হ'য়ে গেছে একটু অস্বাভাবিকভাবেই। প্রবোধচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলাল থেকে উদাহরণ তুলে দিয়েছেন:

আসছে নানাবিধ শকট অল্পবিস্তর অন্ধকারে,...
অনেক বাক্য-হানাহানি, গর্জনবর্ষণ অনেকখানি

এখানে 'অল্পবিস্তর' আর 'গর্জনবর্ষণে' সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনি স্বরবৃত্ত রীতিতে ব্যতিক্রম ব'লেই ধরতে হবে, প্রবোধচন্দ্র জানিয়েছেন যে 'রবীন্দ্রনাথ এ-রকম পর্ব যথাসম্ভব বর্জন ক'রেই স্বরবৃত্ত ছন্দ রচনা করেছেন....'

স্বরবৃত্ত আমাদের ভাষার দ্বিধর্মী ছন্দ। পয়ারের প্রতি তার রক্তের টান, আবার মাত্রাবৃত্তের সঙ্গেও তার প্রাণের মিল। এই দুই বিপরীতের গা ঘেঁষে-ঘেঁষে চ'লেও এই ছন্দ তার আপন বৈশিষ্ট্যের ধারাটি এমনভাবে অক্ষুণ্ণ রেখেছে যে ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয়। তব তার অসবর্ণ উন্মুখতার

পরিচয় পাওয়া যায় বারে-বারে : খুব বেশি ফাঁক রেখে-রেখে লিখলে সে চায় পয়ারে মিশে যেতে, সমস্ত ফাঁক ভরিয়ে দিলে তার ভিতরে জেগে ওঠে মাত্রাবৃত্তের তাল, যে-কোনো দিকেই বাড়াবাড়ি হ'লে তার চরিত্ররক্ষা দুরূহ হ'য়ে পড়ে।

বৃষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর নদী এলো বান
শিবঠাকুরের বিয়ে হ'লো তিন কন্যা দান

এই শ্লোকটার ফাঁক বাড়িয়ে দিয়ে যদি লেখা যায় :

জল পড়ে টিপিটিপি নদী এল বান
শিবঠাকুরের বিয়ে তিন কন্যা দান

তাহ'লে তাকে পয়ার না-ব'লে আর উপায় থাকে না, আবার এরই সবগুলো ফাঁক ভরিয়ে দিলে কী রকম হয় তার নমুনা রবীন্দ্রনাথ 'ছন্দ' বইতে বানিয়ে দিয়েছেন :

বৃষ্টি পড়ছে টাপুরটুপুর নদেয় আসছে বন্যা
শিবঠাকুরের বিয়ের বাসরে দান হবে তিন কন্যা।

সঙ্গে-সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ দোহাই দিয়েছেন, স্বরবৃত্তের ফাঁকগুলো এমন ক'রে 'ঠেসে ভরাতে কেউ যেন ইচ্ছা না করেন'। মাঝে-মাঝে ফাঁক না-থাকলে স্বরবৃত্ত যে খেলে না, এ-জ্ঞান যে-কোনো যুগের যে-কোনো কবির জন্মলব্ধ, কিন্তু ফাঁকগুলো ভরিয়ে যদি দেয়াই যায়, তাহ'লে সেটা যে স্বরবৃত্তের শরশয্যা না-হ'য়ে মাত্রাবৃত্তের ফুলশয্যা হ'য়ে পড়ে, রবীন্দ্র-রচিত এই শ্লোকই তার প্রমাণ। এর প্রথম লাইন

বৃষ্টি পড়ছে টাপুরটুপুর নদেয় আসছে বন্যা

দ্রুত তালে এক নিশ্বাসে স্বরবৃত্ত রীতিতে প'ড়ে ফেলা যায়, কিন্তু

শিবঠাকুরের বিয়ের বাসরে দান হবে তিন কন্যা

এখানে এসে স্বরবৃত্ত আর টিঁকলো না, পরিষ্কার মাত্রাবৃত্ত হ'য়ে উঠলো। প্রথম লাইনটি স্বরবৃত্তেও পড়া যায়, আবার মাত্রাবৃত্তেও, দ্বিতীয় লাইনটি শুধু মাত্রাবৃত্তেই পড়া যায়, অতএব পুরো শ্লোকটি মাত্রাবৃত্তে পড়লেই কি ভালো হয় না? স্বরবৃত্তে 'বেফাঁক ঠাশবুনানি'র আর-একটা উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন:

স্বপ্ন আমার বন্ধনহীন সন্ধ্যাতারার সঙ্গী
মরণ-যাত্রীদলে,
স্বর্ণবরণ কুজ্ঝটিকায় অস্তশিখর লঙ্ঘি'
লুকায় মৌনতলে।

এর পুরোটাই মাত্রাবৃত্ত হ'য়ে গেলো। এ থেকে এই তত্ত্বই আমরা পেলাম যে স্বরবৃত্তের সমস্ত ফাঁক ভরিয়ে দিতে গেলে তার মাত্রাবৃত্ত হ'য়ে ওঠবার ঝোঁক এমন প্রবল হয় যে রচয়িতার পক্ষে সে-ঝোঁক সামলানো প্রায় সম্ভবই হয় না।

নিজের দোহাই নিজেই অমান্য ক'রে রবীন্দ্রনাথ ফাঁক-ভরানো মাত্রাবৃত্তে কয়েকটি কবিতা লিখেছিলেন। 'পূরবী'র 'বিজয়ী' ও 'বেঠিক পথের পথিক' উল্লেখ ক'রে প্রবোধচন্দ্র দেখিয়েছেন যে ফাঁক-ভরানো রীতি সর্বত্র রক্ষিত হয়নি, মাঝে-মাঝে ফাঁক থেকে গেছে। 'বেঠিক পথের পথিকে'র শেষ স্তবকটিকে যে স্বরবৃত্ত বলাই যায় না, মাত্রাবৃত্তই বলতে হয়, এ-বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে প্রবোধবাবু ভালো করেছেন, কারণ রবীন্দ্রনাথের রাশি-রাশি কবিতার মধ্যে (গান বাদ দিয়ে বলেছি) এটিই বোধ হয় একমাত্র দৃষ্টান্ত* যেখানে একই কবিতায় দুই জাতের ছন্দ প্রবেশ করতে

* এ-রকম দৃষ্টান্ত 'স্ফুলিঙ্গে' দু-একটি আছে। গ্রন্থের অন্যত্র তার আলোচনা করেছি।

পেরেছিলো। ফাঁক-ভরানো স্বরবৃত্তকে স্বতন্ত্র একটি ছন্দের মর্যাদা দিয়ে প্রবোধচন্দ্র তার নাম দিতে চাচ্ছেন স্বরমাত্রিক ;—তা নামে কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু স্বতন্ত্র ছন্দ হিশেবে ওটি আদৌ দাঁড়াবে কিনা সন্দেহ। কেননা স্বরবৃত্ত একেবারে নির্ফাক হ'লেই তাতে মাত্রাবৃত্তের তাল এসে পড়ে দুর্বারভাবে ; পুরো কবিতার ছন্দ যে মাত্রাবৃত্ত নয়, স্বরবৃত্ত, তা বোঝাবার জন্য মাঝে-মাঝে ফাঁকওলা লাইন রাখতেই হয়। কবিতার আরম্ভেই ফাঁক রেখে রবীন্দ্রনাথ ছন্দের সুর পাঠককে ধরিয়ে দিয়েছেন, যেমন :

তখন তারা দৃপ্তবেগের বিজয়রথে

কিন্তু স্বরবৃত্তের সুরে আরম্ভ করা সত্ত্বেও এমন অনেক পংক্তি অনিবার্যভাবেই এসে গেছে যা স্বরবৃত্তের স্বভাব থেকে স্খলিত হ'য়ে নিশ্চিত আশ্রয় পেয়েছে মাত্রাবৃত্তে।

মশাল তাদের রুদ্রজ্বালায় উঠলো জ্ব'লে
অন্ধকারের ঊর্ধ্বতলে
বহ্নিদলের রক্তকমল ফুটলো প্রবল দম্ভভরে

এ-সব পংক্তি মাত্রাবৃত্ত রীতিতে না-প'ড়ে কি পারা যায়? 'আনমনা' কবিতাতেও এ-রকম একটি পংক্তি আছে—'অন্ধকারের জপের মালায় একটানা সুর গাঁথে।' আসলে খাঁটি 'স্বরমাত্রিক' বা নির্ফাক স্বরবৃত্ত লিখতে হ'লে স্বরান্ত শব্দ ও যুক্তবর্ণ (কেননা বাংলায় যুক্তবর্ণ মাত্রেরই স্বরান্ত উচ্চারণ) বাদ দিয়ে শুধু তিন-তিন মাত্রার হসন্ত শব্দের মালা গেঁথে যাওয়া*

* একটু-আধটু রকমফের হ'তে পারে, যেমন 'বাংলা ছন্দের প্রকৃতি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ-রচিত শ্লোক :

দূর সাগরের পারের পবন
আসবে যখন কাছের কূলে
রঙিন আগুন জ্বালবে ফাগুন
মাতবে অশোক সোনার ফুলে।

কিন্তু এতেও ছন্দ রচনাই চলে, কাব্যরচনা চলে না।

চাই—মাত্রবৃত্তের মহল থেকে তাকে নিশ্চিতরূপে দূরে রাখবার সেটাই একমাত্র উপায়—হসন্তের বেড়ি এমন ক'রে পরাতে হবে যাতে স্বরবৃত্তের দ্রুত লয় মাত্রাবৃত্তের ঢিমে লয়ে কিছুতেই মিশে যেতে না পারে। যেমন :

বেঠিক পথের পথিক আমার
অচিন সে জন রে।
চকিত চলার ক্বচিৎ হাওয়ায়
মন কেমন করে।

এখানে এটুকু লক্ষ্য করবার আছে যে 'চকিত' শব্দকে 'চকিৎ' পড়তে হবে, স্বরান্ত উচ্চারণ করলেই মাত্রবৃত্তের তাল আর ঠেকানো যাবে না। এমনকি এই শ্লোককে টেনে-টেনে মাত্রাবৃত্ত রীতিতে পড়া অসম্ভব নয়, কিন্তু সেটা স্বাভাবিক শোনায় না, কান প্রসন্ন হ'তে পারে না, এবং যে-কোনা পাঠক, কবিতা প'ড়ে যাঁর একটুও অভ্যেস আছে, তিনি কবিতাটি হাতে নিয়েই ঠিক হসন্তে ঠেকে-ঠেকে স্বরবৃত্তেব তালে প'ড়ে যাবেন—ব্যাপারটা কী, তাঁকে ব'লে দিতে হবে না। অতএব একেই বলা যায় নিফাঁক স্বরবৃত্তের যথার্থ স্বরূপ। কিন্তু বাংলায় স্বরান্ত শব্দ এড়িয়ে চলতে হ'লে সমস্ত যুক্ত-বর্ণান্ত শব্দ, বিশেষ্যপদের বিভক্তি, ক্রিয়াপদের বিভক্তি ও কালভেদ, এবং এ ছাড়াও অসংখ্য নিত্যব্যবহার্য শব্দ বাদ প'ড়ে যায়—শুধু হসন্ত শব্দ দিয়ে ছন্দ রচনা করতে গেলে সেটা ছন্দের কসরৎ হ'তে পারে, কিন্তু কাব্য হওয়া তার পক্ষে দুরূহ। এইজন্যই আগাগোড়া নিফাঁক স্বরবৃত্তে রচিত একটি কবিতাও রবীন্দ্রনাথে নেই, 'বেঠিক পথের পথিক'-এর শেষ স্তবক মাত্রাবৃত্তে ঢ'লে পড়লো, 'বিজয়ী' কবিতাতেও ফাঁক থেকে গেলো মাঝে-মাঝে। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রবোধচন্দ্রকে বলেছিলেন : 'বিজয়ী কবিতাটিতে আমি মাত্রার ফাঁক পূরণ করতে চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু সর্বত্র তা আমি পারিনি। কারণ ছন্দের নূতনত্ব বজায় রাখতে চেষ্টা করে কবিতাকে তো খর্ব করতে পারিনে।' ছন্দোরচনার কোনো ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ 'চেষ্টা ক'রে পারেননি', এ-কথা একটু অদ্ভুতই শোনায় ; আসল

কথাটা এইরকম যে বেশিক্ষণ ধ'রে নিফাঁক স্বরবৃত্ত বাংলা ভাষারই বরদাস্ত হয় না, স্বরবৃত্ত রচনায় মাঝে-মাঝে ফাঁক ভরিয়ে দেয়া যেতে পারে, আবার মাত্রাবৃত্ত রচনাতেও মাঝে-মাঝে এমন লাইন হয়তো হ'য়ে গেলো যা নিফাঁক স্বরবৃত্তের অবিকল অনুরূপ, যেমন 'পথের বাঁধন' কবিতায় 'রঙিন নিমেষ ধুলার দুলাল' আগে-পিছনে মাত্রাবৃত্তের চাপে এ-লাইনটি আমরা স্বতই টেনে-টেনে প'ড়ে ফাঁক ভরিয়ে দিই, কিন্তু যদি রবীন্দ্রনাথ

রঙিন নিমেষ ধুলার দুলাল
পরানে ছড়ায় আবির গুলাল

না-লিখে

রঙিন নিমেষ ধুলার দুলাল
হাওয়ায় ছড়ায় আবির গুলাল

লিখতেন, তাহ'লে মুহূর্তের জন্য 'বেঠিক পথের পথিক'-এর সুর বেজে উঠতো ; কিন্তু তার পরে যেই পড়তুম

ওড়না ওড়ায় বর্ষার মেঘে
দিগঙ্গনার নৃত্য

অমনি মাত্রাবৃত্ত ফিরে পেতো তার রাজ্য। এ থেকে এই কথাটাই আবার বোঝা গেলো যে নিফাঁক স্বরবৃত্ত লিখতে-লিখতে যদি কখনো একটিও স্বরান্ত শব্দ এসে পড়লো অমনি তা স্বরবৃত্ত আর রইলো না, হ'য়ে গেলো মাত্রাবৃত্ত, আর শুধু হসন্ত শব্দ দিয়ে পদ্যরচনা সম্ভব হ'লেও কাব্যরচনা অসম্ভব ব'লেই মনে করতে হবে। তাই মনে হয় যে স্বতন্ত্র ছন্দের পদবী প্রবোধচন্দ্রের 'স্বরমাত্রিকে'র প্রাপ্য নয়, যদি তা হ'তো সে-পাওনা রবীন্দ্রনাথ চুকিয়ে দিতেন।

৩

বাংলায় ক-রকমের ছন্দ আছে, এবার এই প্রসঙ্গটি ভেবে দেখা যাক।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তিন রকম। কিন্তু তাঁর প্রবন্ধ থেকে এই ত্রিধারার নির্দিষ্ট সূত্র পাওয়া সহজ নয়। 'বাংলা ছন্দের প্রকৃতি' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, 'একটি আছে পুঁথিগত কৃত্রিম ভাষাকে অবলম্বন করে, ··আর একটি সচল বাংলার ভাষাকে নিয়ে···আর একটি শাখার উদ্‌গম হয়েছে সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় ভেঙে নিয়ে।' প্রথমটি পয়ারজাতীয়, দ্বিতীয়টি ছড়ার ছন্দ বা স্বরবৃত্ত, তৃতীয়টি মাত্রাবৃত্ত। বলা বাহুল্য, উদ্ধৃত বাক্যে এই তিন ছন্দেব যে-রকম বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন তাতে তাদের ধ্বনিবৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়নি, কোন ছন্দের কী-রকম ভাষার দিকে ঝোঁক সে-কথাই শুধু বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত ব'লে নিই যে স্বরবৃত্ত শুধু যে প্রাকৃত বাংলারই ছন্দ, সাধু ভাষা তার ধাতেই সয় না, এ-কথা মনে করলে ভুল হবে :

> ধ্যানে তোমার রূপ দেখি মা, স্বপ্নে তোমার চরণ চুমি,
> মূর্তিমন্ত মায়ের স্নেহ, গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের এই শ্লোকে সংস্কৃত শব্দ আগাগোড়া ছড়িয়ে আছে। আবার এ-কথা বললেও একটু বেশি বলা হ'যে যায় যে স্বরবৃত্তই একমাত্র বাংলা ছন্দ, যাকে 'গুরুচণ্ডালী দোষ স্পর্শ ই করে না,' যেখানে 'অর্থের বা ধ্বনির প্রয়োজন' অনুসারে আরবি ফারসি ইংরেজি শব্দ সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে-সঙ্গেই আমরা একসারে বসিয়ে দিতে পারি। 'সাধু' ভাষার ছন্দে অর্থাৎ পয়ারে 'শব্দের মিশোল' যে যথেষ্ট সহ্য হয়, সেখানেও যে সংস্কৃতের পাশে-পাশে দেশজ ও যাবনিক শব্দ অনায়াসে এসে বসতে পারে, বাংলা কবিতায় তার উদাহরণের অভাব নেই। ভারতচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী ও বিষ্ণু দে, তিন যুগের এই তিনজন বাঙালি কবির কথা মনে পড়ছে যাঁরা পয়ার-ছন্দে বিমিশ্র ভাষা ব্যবহার করেছেন—সে-ভাষাকে এ-অপবাদ কিছুতেই দেয়া চলে না যে 'সেখানে জাতিরক্ষা করাকেই সাধুতারক্ষা করা বলে।'

তাছাড়া, পয়ার যে জাত না-খুইয়েও খাঁটি কথ্য ভাষার বাহন হ'তে পারে কেমন ক'রে, তার আদর্শ তো রবীন্দ্রনাথই স্থাপন করেছেন 'পরিশেষ' গ্রন্থে।

মনে হয়, ছন্দের আলোচনা করবার সময় রবীন্দ্রনাথের মন স্বরবৃত্তের রঙে অত্যন্ত বেশি রঙিন হ'য়ে ছিলো, তার হসন্ত-হিল্লোলিত ঢেউখেলানো রূপের বর্ণনা দিতে-দিতে অন্যান্য ছন্দের প্রতি রীতিমতো অবিচারই তিনি করেছেন। বলেছেন, 'এই খাঁটি বাংলায় সকল রকম ছন্দেই সকল কাব্যই লেখা সম্ভব এই আমার বিশ্বাস।' খাঁটি বাংলা ভাষায়, অর্থাৎ চলতি ভাষায় সকল ছন্দই লেখা সম্ভব, তা রবীন্দ্রনাথই দেখিয়েছেন, কিন্তু যে-কোনো ছন্দে যে-কোনো কাব্য লেখা সম্ভব নয় ব'লেই পৃথিবী ভ'রে ছন্দের এত বৈচিত্র্যের উদ্ভব হয়েছে। অথচ—কেমন ক'রে তা সম্ভব হয়েছিলো ভাবতে পারি না—কাব্যকলার এই মূলসূত্র লঙ্ঘন ক'রে রবীন্দ্রনাথ জোর ক'রেই বলেছেন যে প্রাকৃত বাংলার ছন্দে মেঘনাদবধ কাব্য লেখা যেতো, কয়েক লাইন লিখেও দেখিয়েছেন :

> যুদ্ধ তখন সাঙ্গ হোলো বীরবাহু বীর যবে
> বিপুল বীর্য দেখিয়ে হঠাৎ গেলেন মৃত্যুপুরে
> যৌবনকাল পার না হোতেই। কও মা সরস্বতী,
> অমৃতময় বাক্য তোমার, সেনাধ্যক্ষ পদে
> কোন বীরকে বরণ ক'রে পাঠিয়ে দিলেন রণে
> রঘুকুলের পরম শত্রু, রক্ষকুলের নিধি !

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আবার প্রবোধচন্দ্র সমর্থন করেছেন, তবু এখানে প্রবলভাবেই প্রতিবাদ করতে হয়, বলতেই হয় যে এই উদাহরণ লিখে রবীন্দ্রনাথ তর্কাতীতরূপে এটাই প্রমাণ করেছেন যে যে-কোনো কাব্য যে-কোনো ছন্দে লেখা যায় না। উদ্ধৃত অংশে অমিত্রাক্ষরের বেগতীব্র ধ্বনিকল্লোল কিছুমাত্র এসেছে কিনা তা বিচার করতে হ'লে অবশ্য কবি বা ছান্দসিকও হ'তে হয় না, পাঠকের উপরেই তার বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে।

কাব্যের মধ্যে যে-খবরটুকু থাকে, তা যে-কোনো ছন্দে বা অছন্দে বলা যায়, কিন্তু রস জড়িয়ে থাকে ছন্দে, বিশেষ-বিশেষ শব্দের বিশেষ ধরনের বিন্যাসে, সেখানে একটু নড়চড় হ'লে সমস্তটাই নষ্ট হ'য়ে যেতে পারে। এক ছন্দের কবিতা আর-এক ছন্দে বদলি করা এতই যদি সহজ হ'তো, তাহ'লে এক ভাষার কবিতা আর-এক ভাষায় তর্জমা করতেও মানুষকে এত ভাবতে হ'তো না।

ধ্বনির দিক থেকেও রবীন্দ্রনাথ ছন্দের গোত্রবিচার করেছেন: বাংলা ছন্দের তিনটি বিভাগের নাম দিয়েছেন সমমাত্রার, অসমমাত্রার আর বিষম-মাত্রার ছন্দ। 'দুই মাত্রার চলনকে বলি সমমাত্রার চলন, তিন মাত্রার চলনকে বলি অসমমাত্রার চলন এবং দুই তিনের মিলিত মাত্রার চলনকে বলি বিষমমাত্রার ছন্দ।' দুই মাত্রার হ'লো পয়ারজাতীয় সব ছন্দ, এবং তিন মাত্রা আর দুই-তিনের মিলিত মাত্রা, দুটোকেই মাত্রাবৃত্তের মধ্যে গণ্য করলে দোষ হয় না—রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে আমি অনেকদিন ধ'রে মাত্রা-বৃত্তকে তিন মাত্রার ছন্দ ব'লে এসেছি। তাহ'লে স্বরবৃত্ত? 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' প্রবন্ধ প'ড়ে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ তত্ত্ববিচারের দিক থেকে মাত্রাবৃত্ত আর স্বরবৃত্তকে একই ছন্দ ব'লে ধরেছেন, দুটিই তাঁর মতে তিন মাত্রার ছন্দ।

অচেতনে ছিলেম ভালো
আমায় চেতন করলি কেনে

আর

হাসিয়া হাসিয়া মুখ নিরখিয়া
মধুর কথাটি কয়।
ছায়ার সহিতে ছায়া মিশাইতে
পথের নিকটে রয়।

এ দুটি একই ছন্দের 'প্রাকৃত'রূপ আর 'সাধু'রূপ, এই হ'লো রবীন্দ্রনাথের মত। কিন্তু বর্তমান লেখকের—এবং আরো অনেকের—কানে এ-দুটি আলাদা-আলাদা জাতের আওয়াজ দিয়ে থাকে; প্রবোধচন্দ্রের বিভাগ-

অনুসারে প্রথমটি স্বরবৃত্ত, দ্বিতীয়টি মাত্রাবৃত্ত। 'পয়ার' শব্দটি ব্যবহারও রবীন্দ্রনাথে এক-এক সময় এক-এক রকম। অধিকাংশ সময় তিনি চিরা-চরিত ধারণা অনুযায়ী পয়ার বলতে ত্রিপদীর মতো একটা ছন্দোবন্ধ বুঝেছেন—যাকে বলে ভর্স-ফর্ম—তার মানে, চোদ্দ মাত্রা হ'লেই যে পয়ার হবে তা নয় কিন্তু পয়ারে চোদ্দ মাত্রা থাকতেই হবে। অবশ্য আঠারো মাত্রার 'বড়ো পয়ার'ও স্বীকার করেছেন তিনি, কিন্তু 'আধুনিক বাংলা ছন্দে সব চেয়ে দীর্ঘ পয়ার আঠারো অক্ষরে গাঁথা' এ-কথা তিনি কেন লিখেছিলেন জানি না, কেননা তাঁর নিজের রচনাতেই আঠারোর চেয়েও বড়ো মাপের পংক্তি পাওয়া যায়, মোহিতলাল এবং আধুনিকতর কবিরা ২২ ও ২৬ মাত্রা অক্লেশে চালিয়েছেন। এখানে আপত্তি উঠতে পারে যে ২২ ও ২৬ মাত্রার পয়ার আসলে সেকেলে লঘু ত্রিপদী ও দীর্ঘ ত্রিপদীর একেলে রকমফের মাত্র, আর এ-আপত্তি একেবারে উড়িয়ে দেবার মতোও নয়। তবু তফাৎ একটু আছে। সে-তফাৎ এইখানে যে ত্রিপদীতে যতিস্থাপনের যে-নিয়ম নির্দিষ্ট ছিলো. আধুনিক কবিরা তা লঙ্ঘন ক'রে তাঁদের লম্বা মাপের পয়ারে যতিস্থাপনের বৈচিত্র্য এনেছেন। সেইজন্য এই লম্বা পয়ারকে ছদ্মবেশী ত্রিপদী মনে করাও ঠিক হবে না। পাঠককে হয়তো ব'লে দেয়া দরকার যে পয়ার বলতে আমি একটা ছন্দ বুঝি, আর ত্রিপদী বলতে পয়ারের একটা ছন্দোবন্ধ।

রবীন্দ্রনাথ পয়ারকেই একটা ছন্দোবন্ধরূপে উল্লেখ করেছেন অনেকবার, কিন্তু পয়ার যে আসলে একটা ছন্দ, ছন্দের একটা জাত, এ-চেতনা তাঁর 'ছন্দ' বইতে প্রচ্ছন্নভাবে প্রবাহিত, এবং 'গদ্যছন্দ' প্রবন্ধে কোনো-এক অসতর্ক মুহূর্তে তিনি এ-কথাও ব'লে ফেলেছেন যে 'বেড়া-ভাঙা পয়ার দেখা দিতে লাগল "বলাকা"য় "পলাতকা"য়।' আজকের দিনেও এমন পাঠক হয়তো থাকা সম্ভব যিনি এ-কথা প'ড়ে ভাববেন যে 'বলাকা' আর 'পলাতকা' একই ছন্দে লেখা, এবং সে-ছন্দের নাম পয়ার—সেইজন্য এ-কথাও এখানে ব'লে দিতে হ'লো যে 'বলাকা' প্রধানত পয়ারে লেখা আর 'পলাতকা' আদ্যন্ত স্বরবৃত্তে। একবার মাত্রাবৃত্ত আর স্বরবৃত্তকে, আর-একবার স্বরবৃত্ত আর পয়ারকে অভিন্নরূপে উল্লেখ ক'রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর

মল্লিনাথ-মণ্ডলীর খাটুনি বাড়িয়ে দিয়েছেন। বাংলা ছন্দের প্রাণের রহস্যটি তাঁর বইতে যেমন ক'রে উন্মোচিত হয়েছে, এমন আর কোনোখানেই হয়নি, কিন্তু ছন্দের সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট শ্রেণীবিভাগের আশায় কবির লীলা-প্রাঙ্গণ ছেড়ে ছন্দোবিজ্ঞানীর ল্যাবরেটরিতেই আসতে হ'লো।

৪

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন বাংলা ছন্দের তিনটি প্রধান বিভাগের নাম দিয়েছেন যৌগিক, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত। এই বিভাগের যাথার্থ্য সম্বন্ধে কোনো তর্ক উঠতেই পারে না, নামকরণও সুচারু, তবে সর্বসাধারণের সুবিধের জন্য মাত্রাবৃত্ত অর্থে তিন মাত্রার ছন্দ আর স্বরবৃত্ত অর্থে ছড়ার ছন্দ বিকল্পে চলতে পারে। ছন্দের নাম বিজ্ঞানসম্মত হওয়াটাই সব কথা নয়, সেই সঙ্গে খুব সহজে সাধারণ মানুষের বোধগম্য হওয়াও বাঞ্ছনীয়, এমন হ'লেই ভালো হয় যাতে নাম শোনবার সঙ্গে-সঙ্গে কোনো চেনা কবিতার সঙ্গে মিলিয়ে আমরা সকলেই তার চেহারাটা চিনতে পারি। সেদিক থেকে যৌগিক নামটিতে আমার আপত্তি আছে। 'এ-জাতীয় ছন্দে যুগ্মধ্বনি কোথাও বিশ্লিষ্ট ও দ্বৈমাত্রিক এবং কোথাও সংশ্লিষ্ট ও একমাত্রিক হয় বলে' এ-ছন্দের নাম প্রবোধচন্দ্র দিতে চেয়েছেন যৌগিক। কিন্তু আমাদের চিরকালের চিরচেনা পয়ার কথাটা দোষ করলো কী। যে-পয়ারে বহুযুগ ধ'রে বহু বাঙালি কবির অসংখ্য রচনা স্বদেশবাসীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে, সেই কথাটা কি ছন্দের পরিভাষা থেকে একেবারে লুপ্ত হ'য়ে যাবে? ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি যে পয়ার বলতে একটা ছন্দোবন্ধ আর বোঝায় না, বোঝায় ছন্দের একটা জাত—রবীন্দ্রনাথও অনেকবার এই অর্থে পয়ার বা পয়ারজাতীয় ছন্দ ব্যবহার করেছেন। এ-ব্যবস্থায় এমন-কী ত্রুটি ছিলো যার জন্য নতুন নামের প্রবর্তনা অত্যাবশ্যক হ'লো? প্রবোধচন্দ্র যাকে যৌগিক বলেন, সে-রীতিতে রচিত সমস্ত কাব্যই তো পয়ারের মধ্যে পড়ে: কাশীরাম দাসের মহাভারত, মেঘনাদবধ কাব্য, 'চিত্রাঙ্গদা', 'উর্বশী', 'বলাকা'র 'বলাকা' ইত্যাদি কবিতা, 'পরিশেষে'র 'উন্নতি' ইত্যাদি

কবিতা—পয়ার বলতে এই সমস্তই বুঝি। ছন্দটা যতিপ্রান্তিক না প্রবহমাণ না মুক্তক, পংক্তিগুলি সমান না অসমান, মিল আছে কি নেই, সাধুভাষায় লেখা না চলতি ভাষায়, স্তবকবিন্যাস কী রকম, এগুলো সবই গৌণ কথা, ছন্দের জাতটাই হ'লো আসল। একই ছন্দকে অবলম্বন ক'রে বহুবিধ বৈচিত্র্যসাধন কবিরা করতে পারেন এবং ক'রে থাকেন, কিন্তু এ-সব প্রকরণভেদে ছন্দের জাত-বদল হয় না তো। পয়ার কথাটা শুধু যে ব্যাপক তা নয়, তার আর-একটি গুণ এই যে সে সর্বজনবিদিত, স্বল্পতম শিক্ষিত বাঙালি, ছন্দোতত্ত্বের যে কিছুই জানে না, স্কুলপাঠ্য পদ্য ছাড়া কবিতাও হয়তো পড়েনি, সেও পয়ার কথাটা শুনলে ঝাপসাভাবে খানিকটা ধারণা করতে পারবে ব্যাপারটা কী। প্রবোধচন্দ্র যৌগিক চালাতে চান চালাবেন, কিন্তু আশা করি পয়ার তাতে একেবারে দেশছাড়া হবে না।

৫

আগে বাংলা ছন্দ ছিলো যতিপ্রান্তিক—তার মানে এক-একটি পংক্তি যেখানে শেষ হ'লো, নিশ্বাস নেবার জন্য থামতে হ'তো সেখানেই। তখনকার জনসাধারণের কাছে এর একঘেয়েমি যে অসহ্য বোধ হয়নি তার কারণ কবিতা তখন গাওয়া হ'তো কিংবা পড়া হ'তো সুর ক'রে। সে-সুরের গলা চেপে ধরলো ছাপার অক্ষর। ছাপানো কবিতার বইয়ের প্রচলন যেদিন থেকে হ'লো, সেদিন থেকে কবিতার শ্রোতার সংখ্যা ক'মে গিয়ে পাঠকের সংখ্যা বেড়ে উঠলো দ্রুতবেগে, আর সুরবিরহিত হ'য়ে যতিপ্রান্তিকতার নির্জীবতা কর্ণগোচর হ'লো সহজেই। বাংলা পদ্যের সেই নিস্তেজ স্রোতোধারায় প্রবহমাণতার প্রাণতরঙ্গ প্রথম প্রবাহিত ক'রে দিলেন মধুসূদন। তাঁর অমিত্রাক্ষরে যে মিল ছিলো না এটাই সবচেয়ে আশ্চর্য কথা নয়, তিনি যে 'লাইন-ডিঙোনো' পয়ার লিখেছিলেন, বাংলা ছন্দের যুগান্তকারী ঘটনা এইটেই। এই প্রবহমাণতার সূত্রটি রবীন্দ্রনাথ যে কত বিচিত্র উপায়ে ব্যবহার করেছেন—যদিও মাইকেলি ধরনে নয়—তার সুসম্পূর্ণ আলোচনা প্রবোধচন্দ্র করেছেন। ছোটো-বড়ো পংক্তিতে সাজানো

যে-ছন্দ সাধারণত 'বলাকা'র ছন্দ ব'লে অভিহিত হয়, কিন্তু যে-ছন্দ রবীন্দ্রনাথ প্রথম লেখেন 'মানসী'র 'নিষ্ফল কামনা' কবিতায়, আর রবীন্দ্রনাথেরও আগে লেখেন গিরিশচন্দ্র, প্রবোধচন্দ্র তার নাম দিয়েছেন মুক্তক। নামটি ভালো হয়েছে। বলা বাহুল্য, মুক্তক একটা ছন্দের নাম হ'তে পারে না, এ একটা ঢঙের নাম। ছোটো-বড়ো লাইনে লেখা হ'লেই তাকে মুক্তক বলা যেতে পারে, কিন্তু আরো একটু কথা আছে, সেই সঙ্গে প্রবহমাণ হওয়া চাই, কেননা প্রবহমাণতার তাগিদেই লাইন ছোটো-বড়ো হয়। প্রবোধচন্দ্র সুন্দর দেখিয়েছেন যে গিরিশচন্দ্রের ছন্দ যতটা প্রবহমাণ, বলাকার ছন্দ তার চেয়ে বেশি, কিন্তু বলাকার ছন্দেও প্রত্যেক পংক্তির পরে সূক্ষ্ম একটু বিরতি আছেই। এ-কথা স্বরবৃত্ত মুক্তক সম্বন্ধেও সত্য। পুরোপুরি প্রবহমাণ মাইকেলি অমিত্রাক্ষর ছাড়া কিছু হয় না, শুধু সে-ছন্দই এতটা গদ্যধর্মী যে একটা যতি-চিহ্ন না-পাওয়া পর্যন্ত আমরা গড়গড় ক'রে প'ড়ে যেতে পারি—অবশ্য দমে যদি কুলোয়।*

মুক্তক পয়ার, মুক্তক স্বরবৃত্ত রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পরবর্তী কবিরা অজস্র লিখেছেন, কিন্তু মাত্রাবৃত্ত মুক্তক বিরল। তার কারণ রবীন্দ্রনাথ ও প্রবোধচন্দ্র উভয়েই তাঁদের ভিন্ন-ভিন্ন ধরনে বুঝিয়ে বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে একটুখানি উদ্ধৃত ক'রে দিই: 'পয়ার ছন্দের বিশেষত্ব হচ্চে এই যে, তাকে প্রায় গাঁঠে গাঁঠে ভাগ করা চলে, এবং প্রত্যেক ভাগেই মূল ছন্দের একটা আংশিক রূপ দেখা যায়।...কিন্তু তিনের ছন্দকে তার ভাগে-ভাগে পাওয়া যায় না, এইজন্যে তিনের ছন্দে ইচ্ছামতো থামা চলে না।...তিনের ছন্দে গতির প্রাবল্যই বেশি, স্থিতি কম। সুতরাং তিনের ছন্দ চাঞ্চল্য প্রকাশের পক্ষে ভালো কিন্তু তাতে গাম্ভীর্য এবং প্রসারতা অল্প। তিনের মাত্রার ছন্দে

* এখানে বলা দরকার যে মাইকেলি অমিত্রাক্ষর আবৃত্তির পক্ষে গদ্যধর্মী হ'লেও আন্তরিক বিচারে তার বিপরীত, শব্দচয়নে এবং বাক্যবিন্যাসে বাংলা ভাষার স্বাভাবিক কথ্য ছন্দের সুদূরতম পরপ্রান্তে অবস্থিত। বাংলা কথ্য ছন্দের খুব বেশি কাছে আসতে পেরেছে 'পরিশেষে'র অমিত্রাক্ষর—সেদিক থেকে তাকেই বলা যায় সবচেয়ে গদ্যধর্মী, যদিও সেখানে প্রত্যেক পংক্তির পর বিরতি 'বলাকা'র চেয়েও স্পষ্ট।

অমিত্রাক্ষর রচনা করতে গেলে বিপদে পড়তে হয়—সে যেন চাকা নিয়ে লাঠি খেলবার চেষ্টা।' অমিত্রাক্ষর বলতে রবীন্দ্রনাথ এখানে প্রবহমাণতার কথাটাই ধরেছেন, মিল তো না-দিলেই হ'লো, সে আর বেশি কথা কী। প্রবোধচন্দ্রও বলেছেন যে মাত্রাবৃত্তে 'যথার্থ মুক্তক রচনা বোধ করি সম্ভব নয়।' অথচ অসম্ভবও যে নয় তা 'সেঁজুতি'র 'যাবার মুখে' কবিতা থেকে কয়েকটি লাইন তুলে দিয়ে প্রবোধচন্দ্রই দেখিয়েছেন। সেই সঙ্গে তিনি বলতে চান যে এটি মাত্রাবৃত্ত মুক্তকের অনন্য দৃষ্টান্ত, 'এ-রকম দ্বিতীয় আর একটি দৃষ্টান্তও' তাঁর 'চোখে পড়েনি।' কিন্তু আমার চোখে একাধিক পড়েছে :

ডলু যদি আজ ন্যাকামি করে,—প্রায়ই করে,
আগেকার মতো—তার মানে এই দু'মাস আগের
মতো আর মন বাহবা দেয় না।···
দু'মাস আগে এ করুণ চাউনি, পাণ্ডুর গাল
রহস্যভরা অস্ফুট ভাষা
লাগত ভালো ;···
ইতিমধ্যে যে গোল পাকিয়েছি—
ডলু—মানে এই মৈত্রেয়ী ঘোষ নাম্নী মেয়ের
প্রেমে প'ড়ে গিয়ে !···
সে-কথা যাক তা কথাটা হচ্ছে
কেমন ক'রে
ডলুর কঠিন করুণার হাত এড়ানো যায়
অবশ্য কোনো গোল না ক'রে···
কিন্তু ডলুর সমস্যার এই সমাধান আর
পাব নাকি আমি
জীবনের শেষ দিনের আগে ?
ক্লান্ত লাগে।

(বিষ্ণু দে—'চোরাবালি', 'মন-দেওয়া-নেওয়া')

অন্ধকারের অন্তর থেকে তরঙ্গ-রোল ইতস্তত
কেঁপে ফুটে ওঠে, ফেটে বেজে যায় : ঢেউয়ের মুখের ফেনার মতো
(কঙ্কাবতী গো।)
গড়ায়, ছড়ায় সুপ্তির পরে স্বপ্নের ঘোরে সমস্ত রাত,
তেমনি তোমার নামের শব্দ, নামের শব্দ আমার কানে
বাজে দিনরাত, বাজে সারারাত, বাজে সারাদিন আমার প্রাণে
ঢেউয়ের মতন ইতস্তত ,...
আমি চেয়ে থাকি, দেখি চোখ ভ'রে মনে হয় মোর আঁকাবাঁকা জলে,
মেঘের রেখায়
একা বাঁকা চাঁদ চুপ-চুপ ক'রে কথা ক'য়ে যায়...
এলোমেলো জলে আলো ওঠে জ্ব'লে, ছলছল ঢেউ তোমার নামে
তীরে চুমো খায, দূরে নিযে যায ঢেউয়ের জলের স্রোতের টানে
তোমার নামের শব্দ, 'কঙ্কা! কঙ্কা! কঙ্কা! কঙ্কাবতী!'
(বুদ্ধদেব বসু—'কঙ্কাবতী')

আরো একটি উদাহরণ মনে পড়ছে—সেটি অসমপংক্তিক না-হ'লেও প্রবহমাণ।

বিশাল সাগর পার হ'য়ে এসে বাতাস পাগল
জানালার কাছে চীৎকার ক'রে আবোলতাবোল
বকতে থাকবে—আমরা কবিতা পড়বো যখন। ..
বই থেকে চোখ তুলে মাঝে-মাঝে তাকাবো তোমার
আলো-ছায়া ভরা চুলে আর চোখে—চোখের তারার
গভীর কালোয় , তুমি মুখ তুলে হাসবে—কেমন ?
(বুদ্ধদেব বসু—'কঙ্কাবতী', 'কবিতা')

এই কবিতাগুলি যে 'সেঁজুতি' প্রকাশের অনেক আগে রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিলো এ-খবরটা ঐতিহাসিকের কাছে ঔৎসুক্যকর হ'তে পারে।

কথাটা এই যে মুক্তক ঢঙের মাত্রাবৃত্ত একবারও যদি সম্ভব হ'য়ে থাকে তাহ'লে বার-বার সম্ভব হবার পথে বাধা রইলো কোথায়? সুতরাং এ-ছন্দে মুক্তক রচনা 'বোধ করি সম্ভব নয়', এ-কথা আর বলা যায় না। পয়ারের মতো স্বাধীনতা না-থাকলেও মাত্রাবৃত্ত তার বাঁধনকে অনেকখানি আলগা ক'রে দিতে পারে বইকি, এবং মুক্তকের উঁচু-নিচু রাজ্যে তার তিন মাত্রার নাচ দেখতে-শুনতে ভালোই তো হয়। এ-পর্যন্ত বলা যেতে পারে যে একটানা বেশিক্ষণ স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষা করা তার পক্ষে দুরূহ, কেননা পদাতিকের চেয়ে নর্তকের বিশ্রামের প্রয়োজন বেশি, এমনকি দৌড়ওলার চাইতেও। মাত্রাবৃত্তকে প্রবহমাণ করতে গিয়ে কোনো-কোনো কবি ইতিমধ্যেই অপঘাত ঘটিয়েছেন :

> সত্যই যদি এ-ধরণী হ'ত ঘরণী
> কাব্যের,—হ'ত মহাজীবনের তরণী,—
> খুলে যেত তবে প্রেমের মুক্ত সরণি
> ধরায়। রভসে রসায়িত হ'ত ধমনী।
>
> (মণীন্দ্র রায়—'ছায়াসহচর', 'কর্কশ গান')

> তোমার ঘরে প্রদীপ জ্বলে। আলোর চেয়ে ধোঁয়া
> অধিক। আমি ঘরের স্মৃতি নিবিয়ে পথচারী।
>
> (মণীন্দ্র রায়—'ছায়াসহচর', 'ঘরবাড়ির')

কী-রকম হ'লো? যেন নাচিয়েকে দৌড় করাতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়লো পথের মাঝখানে। এ-রকম দুর্ঘটনা আরো লক্ষ্য করেছি ব'লেই কথাটা এখানে ব'লে নিলাম। অসমমাত্রিক হোক, প্রবহমাণ হোক, যা-ই হোক, মাত্রাবৃত্তের স্বাভাবিক যতিপাত অক্ষুণ্ণ থাকা চাই, নয়তো আঙুলে গোনা ছন্দ হ'তে পারে, কানে শোনা ছন্দ হবে না।

৬

স্বরবৃত্তের প্রসঙ্গে প্রবোধচন্দ্রের দু-একটি মন্তব্য আমার অদ্ভুত লাগলো। তাঁর মতে স্বরবৃত্ত চার-চার সিলেবলের পর্ব ধ'রে চলে—'যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে', এখানে 'যমুনাবতী'র পাঁচ সিলেবলকে তিনি বলেন ব্যতিক্রম। 'এ রকম ব্যতিক্রম রবীন্দ্রনাথ সযত্নে বর্জন করেছেন, তাঁর পরিণত বয়সে (ধরা যাক "ক্ষণিকা"র সময় থেকে) রচিত স্বরবৃত্ত ছন্দের কোথাও ও-রকম পাঁচ সিলেবলের পর্ব দেখা যায় না'—প্রবোধচন্দ্রের এই কথা পুরোপুরি মেনে নেয়া সম্ভব নয়। অবশ্য 'যমুনাবতী'র মতো একেবারে গোনা-গুনতি পাঁচ সিলেবল আধুনিক কালে ব্যতিক্রম ব'লেই গণ্য হবে—কেননা কবিতা আজকাল সুর ক'রে পড়া হয় না—কিন্তু তাই ব'লে এমন কথাও বলা যায় না যে স্বরবৃত্তে চার সিলেবলই অনন্যরূপে নিয়ম। বরং, কবিতা যিনি কান দিয়ে শোনেন তিনিই জানেন যে স্বরবৃত্তের পর্ব চার সিলেবলের সীমা বারে-বারেই ডিঙিয়ে যায়, ও-রকম ডিঙোনোই তার স্বভাব ব'লে। 'ক্ষণিকা' থেকেই কয়েকটি উদাহরণ দিই ; রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী অন্যান্য কাব্যগ্রন্থে, এবং নতুন ও পুরোনো অন্যান্য বাঙালি কবির রচনায়, অনুরূপ উদাহরণ অসংখ্য পাওয়া যাবে সে-কথা বলাই বাহুল্য।

অলক নেড়ে 'দুলিয়ে বেণী'
কথা কইতো শৌরসেনী

মনে হচ্ছে 'আমিও এমন'
        লিখতে পারি ঝুড়িঝুড়ি

হের   মাঠের পথে ধেনু
চলে   'উড়িয়ে গোখুর' রেণু

আলের ধারে 'দাঁড়িয়েছিলাম' একা

হঠাৎ খুশি 'ঘনিয়ে আসে' চিতে

'দাঁড়িয়েছি এই' দণ্ড দুয়ের তরে

কালিদাসকে 'হারিয়ে দিয়ে'
গর্বে বেড়াই নেচে

কিন্তু তবু 'তুমিই থাকো' সমস্যা যাক ঘুচি

এখানে চিহ্নিত পর্বগুলির বিষয়ে কী বলা যাবে? এগুলোয় কি ঠিক চার সিলেবলই আছে, না সাড়ে-চার, নাকি 'আমিও এমন' বা 'দাঁড়িয়েছি এই'র মতো পর্বে প্রায় পাঁচের কাছাকাছি? আইনত বলা সহজ যে কোনোখানেই চার সিলেবলের বেশি নেই—কেননা 'ইয়ে', 'ইও' ইত্যাদি যুগ্মস্বর শাস্ত্রমতে এক মাত্রার বেশি মূল্য পায় না—কিন্তু ব্যবহার সব সময় ব্যাকরণ মেনে চলে না; কার্যত আমরা দেখতে পাই—মানে, শুনতে পাই—যে ও-সব যুগ্মস্বর বা দীর্ঘস্বরের চাপে পর্বগুলির ওজন বেশ বেড়ে গেছে। স্বরবৃত্তের পর্ব কতদূর পর্যন্ত ফেঁপে উঠতে পারে তার আরো ভালো নমুনা আছে 'গীতাঞ্জলি'তে—

যা 'হারিয়ে যায় তা' আগলে বসে রইব কত আর

আছে 'পলাতক'য়—

'গালিয়ে বুকের' ব্যথা
লিখে রাখি এইখানে এই কথা।

কেবল পত্র রওনা করা
'কেবল শুকিয়ে' মরা—

'হারিয়ে যায় তা', 'গালিয়ে বুকের', এই ধরনের পর্বগুলিকে ওজনে যদি 'যমুনাবতী'রই প্রান্তবর্তী না বলি, তাহলে কানের প্রমাণ অমান্য করতে হয়।

অতএব প্রবোধচন্দ্র যাকে ব্যতিক্রম বলছেন তা রবীন্দ্রনাথে—বা অন্যান্য কবিতে—'কোথাও দেখা যায় না', এ-কথা বললে একটু বেশি বলা হ'য়ে যায়, কিংবা পুরো সত্যটি বলা হয় না।

স্বরবৃত্তে তিন সিলেবলের পংক্তিকেও প্রবোধচন্দ্র 'ব্যতিক্রম' বলেছেন। অবশ্য আমাদের গ্রাম্য ছড়ায় এই 'ব্যতিক্রমে'র সংখ্যা অত্যধিক, প্রবোধচন্দ্র নিজেই আট লাইন ছড়া থেকে সাতটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। 'এক কন্যে' 'তিন কন্যে,' 'হাত ঝুমঝুম' 'পা ঝুমঝুম'—এই ধরনের ত্রিস্বর পর্ব সম্বন্ধে তিনি কিছুটা সহনশীল, তার কারণ 'এগুলিতে অন্তত দুটি করে যুগ্মধ্বনি আছে,' এবং 'ছড়ার ছবি'র 'যোগীনদা' কবিতা থেকে রবীন্দ্রনাথের যে-ক'টি ত্রিস্বর পর্ব তিনি উদ্ধৃত করেছেন, 'সে সব কয়টিই এই ধরনের।' কিন্তু 'কুড়োতে,' 'না খেয়ে' বা 'কাজিফুল'-এর মতো ত্রিস্বর পর্ব, যাতে যুগ্মধ্বনি একটিমাত্র কিংবা একটিও নেই, প্রবোধচন্দ্রের মতে সাবালকের পঠিতব্য কবিতায় তাকে স্থান দেয়া বাঞ্ছনীয় নয়, 'সুতরাং রবীন্দ্রনাথ এ-রকম ত্রিস্বরপর্বিক ব্যতিক্রমকেও সযত্নে পরিহার করেছেন। এমনকি, কাজিফুল-এর মতো যে-সমস্ত ত্রিস্বর পর্বে একটিমাত্র ধ্বনি যুগ্ম এবং দুটি অযুগ্ম, সে-রকম পর্বও রবীন্দ্রসাহিত্যে পাওয়া যায় না।' পাওয়া যায় না, এ কথা ঠিক নয়। 'কুড়োতে' বা 'না খেয়ে'-র মতো পর্ব লক্ষ্য করেছি :

যদি খোকা না হ'য়ে
আমি হতেম কুকুর ছানা—

এখানে 'খোকা না হ'য়ে' যেমনভাবেই পড়া যাক,

যদি 'খোকা না' হ'য়ে

কিংবা

যদি খোকা 'না হ'য়ে'—

যুগ্মধ্বনিবর্জিত ত্রিস্বর পর্বই পাওয়া যাবে। আর 'কাজিফুল'-এর মতো পর্ব,

যাতে একটি যুগ্ম ও দুটি অযুগ্ম ধ্বনি, তাও 'ক্ষণিকা'য় 'পলাতকা'য় পেয়েছি :

সন্ধ্যা সকাল করবি শুধু 'এ ঘাট ও' ঘাট।

বাইরে যা পাই সমজে নেব 'তারি আইন' কানুন

'দূর হইতে' গড় করিতাম দিঙনাগাচার্যেরে

'মা বললেন' কেন ঐ যে চাটুয্যেদের পুলিন

মনে ভাবে 'এও কেন' মোদের সাথে আসে

অন্যান্য বই আমি আর খুঁজিনি, অন্য-কেউ যদি জাল ফেলেন, আরো কিছু হয়তো উঠে আসবে। দুটি যুগ্মস্বর ও একটি অযুগ্মস্বরে গঠিত ত্রিস্বর পর্বের দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ থেকে প্রবোধচন্দ্রই দিয়েছেন, অতএব আমি আর ও-বিষয়ে উদ্যোগী হলাম না।

এই প্রসঙ্গে আরো একটা কথা মনে পড়লো। স্বরবৃত্তের বিশেষ একটা রীতি আছে, 'কুড়োতে' কি 'কাজিফুল' ধরনের ত্রিস্বর পর্ব নিয়েই যার চলন। সেটি আমাদের বাউল গানের ছন্দ। জাত এর ছড়ার ছন্দেরই, কিন্তু ঢং আলাদা। রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' বইয়ে ব্যবহৃত একটি উদাহরণের অংশ তুলে দিই :

আছে যার। মনের মানুষ। আপন মনে
সে কি আর। জপে মালা

এই চরণে প্রথম ও চতুর্থ পর্ব ত্রিস্বর, আর তারই ফলে এর ধ্বনিবৈচিত্র্য। অবশ্য বাউল-সংগীতে এই ত্রিস্বরঘটিত বৈশিষ্ট্য সর্বত্র সমভাবে রক্ষিত হয়নি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই রীতিকেই যে-পরিমার্জিত রূপ দিয়েছেন, তাতে তিন সিলেবল ঘাটে-ঘাটে কায়েমি, এবং ত্রিস্বর আর চতুঃস্বরে গঠিত পর্ব হাতে

হাত ধ'রে পর-পর দাঁড়িয়ে ভারি একটি নতুন রকমের নাচন তুলেছে। এই রীতিতে রচিত সম্পূর্ণ একটি গান দেখা যাক :

আলো যে	যায় রে দেখা—	
হৃদয়ের	পুব-গগনে সোনার রেখা ;	
এবারে	ঘুচল কি ভয় এবারে হবে কি জয়।	
আকাশে	হোলো কি ক্ষয় কালির রেখা ॥	
	কারে ঐ যায় গো দেখা,	
হৃদয়ের	সাগরতীরে দাঁড়ায় একা।	
ওরে তুই	সকল ভুলে	চেয়ে থাক নয়ন তুলে,—
নীরবে	চরণ মূলে	মাথা ঠেকা ॥

লক্ষ্য করতে হবে যে এতগুলি ত্রিস্বর পর্বের মধ্যে অধিকাংশেই একটিও যুগ্মস্বর নেই। তাহ'লে আর 'কুড়োতে' বা 'না খেয়ে' নিয়ে বলবার কী রইলো।

এখন কথাটা হ'লো, গ্রাম্য ছড়ায় যার ছড়াছড়ি, বাউল-সংগীতে যা অপরিহার্য, আর রবীন্দ্র-কাব্যে যা অঙ্গীকৃত, স্বরবৃত্তের সেই সব ভঙ্গিকে ব্যতিক্রম বলি কেমন ক'রে ? বরং এ-সব উদাহরণ থেকে এই কথাটাই বোঝা গেলো যে স্বরবৃত্তের পর্বে তিন সিলেবল স্বচ্ছন্দেই স্থান পেতে পারে। এবং পাঁচ সিলেবলের কাছাকাছি যাবারও তার বাধা নেই। এর আরো একটি প্রমাণ পেশ করলে দোষের হবে না :

এল তার দৌরাত্ম্য নিয়ে এই ভুবনের চিরকালের ভোলা···
হও তুমি সাবিত্রীর মতো এই কামনা করি···

'পলাতকা'র এই পংক্তি দুটিকে

এল তার দৌ। রাত্ম্য নিয়ে।···
হও তুমি সা। বিত্রীর মতো।···

এইভাবে ভাগ-ভাগ ক'রে দেখিয়ে প্রবোধচন্দ্র নিশ্চয়ই বোঝাতে পারেন যে ওতে প্রত্যেক পর্বে চার-চার সিলেবল ঠিকই আছে, কিন্তু ঐভাবে ভাগ-ভাগ ক'রেই পড়তে হবে এ-রকম দণ্ড ছান্দসিকের দণ্ডচিহ্নের সাহায্যেও আশা করি তিনি দিতে চাইবেন না। রবীন্দ্রনাথ 'মরি মরি। অনঙ্গদেবতা' পড়তেন, আরো অনেকেই তা-ই প'ড়ে এসেছেন, একমাত্র দিলীপকুমার ছাড়া আব কেউ 'মরি মরি অ। নঙ্গ দেব। তা' পড়েন ব'লে জানি না; তেমনি 'পলাতকা'ব পংক্তি দুটিও বাঙালি পাঠকের মুখে সেই ভাবেই উচ্চারিত হয়েছে ও হবে, যেটা সবচেয়ে সহজ ও অর্থের সঙ্গে সংগত :

এল তার। দৌরাত্ম্য নিয়ে…
হও তুমি। সাবিত্রীর মতো…

এখানে প্রথম পর্বে তিনটি ও দ্বিতীয় পর্বে পাঁচটি ক'রে সিলেবল পাওয়া যাচ্ছে,* আর এ-রকমের আবৃত্তিতে কোনো সময়ে কোনো বাঙালির কান পীড়িত হয়নি। যে-সব নাম-না-জানা কবিরা মুখে-মুখে আমাদের ছেলে-ভুলোনো ছড়াগুলি বানিয়েছিলেন, তাঁরা যদিও সিলেবল কাকে বলে জানতেন না, স্বরবৃত্তেবও নাম শোনেননি, তবু স্বরবৃত্তে তাঁরা ছিলেন সিদ্ধ-কণ্ঠ, সে-কণ্ঠ থেকে তিন আর পাঁচ সিলেবলের পর্ব উৎসারিত হ'তে পাবতোই না, যদি না তাতে স্বরবৃত্তের স্বভাবেবই সম্মতি থাকতো। গ্রাম্য ছড়ায় যতটা স্বাধীনতার অবকাশ আছে, সুসংস্কৃত, সুপরিণত, এবং ছাপার অক্ষরে পঠিতব্য কবিতায় ততটা নেই সে-কথা স্বীকার করি, কিন্তু ছন্দের স্বভাব যাবে কোথায়? যদি তিন আর পাঁচ সিলেবলে কোনো গলদই থাকতো তাহ'লে ও-সব ছড়া রবীন্দ্রনাথের কানে খারাপ লাগতো, আরো খারাপ লাগতো রবীন্দ্রনাথের পরে আমাদের কানে—কিন্তু তা তো লাগলো না, বংশপরম্পবায় ছেলেবুড়ো সকলকেই ঐ আঁকাবাঁকা ছন্দ এমন ক'রে

* 'দৌরাত্ম্য নিয়ে'-কে যদি বা আইনত চার সিলেবল বলা যায়, 'সাবিত্রীর মতো'-তে এসে সে-যুক্তিও ভেঙে পড়ে : সা। বিৎ। রীর ' ম। তো—পরিষ্কার পাঁচ সিলেবল আছে, অথচ ছন্দপতন কেউ বলবে না।

ভুলিয়ে রেখেছে যে কিছুতেই মনে করতে পারি না আঁকাবাঁকা হওয়াটাই ওর স্বধর্ম নয়। কঠোরভাবে চার সিলেবলে বেঁধে দিলে, স্বরবৃত্তের প্রধান গুণ যে স্থিতিস্থাপকতা, সেই গুণটিকেই নষ্ট করা হয়।

কিন্তু এ-প্রসঙ্গে সিলেবল কথাটাই অবান্তর; ভাবতে পারি না, প্রবোধচন্দ্র ছড়ার ছন্দকে সিলেবিক ছন্দ বললেন কেমন ক'রে। বাংলায় সিলেবিক ছন্দ তো হ'তে পারে না, কেননা আমাদের অ্যাকসেণ্টবর্জিত উচ্চারণের এটুকুই বৈশিষ্ট্য যে ইংরেজিতে যাকে সিলেবল বলে তা বাংলায় কখনো এক মাত্রা, কখনো দু-মাত্রা। বাংলায় এমন কোনো ছন্দ নেই যাতে এক সিলেবলের ওজন কোনো-না-কোনো সময়ে দু-মাত্রার সমান না হয়, তাই সিলেবল দিয়ে হিশেব করতে গেলে সবই গোলমাল হ'য়ে যায়। এই জন্যই, রবীন্দ্রনাথের, এবং সাধারণভাবে বাংলা ভাষার স্বরবৃত্তে এমন পর্ব প্রায়ই পাওয়া যায়, যা গুনতে চার সিলেবল হ'লে ওজনে পাঁচেরই তুল্য-মূল্য। এর উদাহরণ আগে যা দিয়েছি, তার সঙ্গে আরো কয়েকটি যোগ করতে চাই: পাঠককে অনুরোধ করা যাচ্ছে,

যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে

এর সঙ্গে তুলনা ক'রে তিনি নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলি পড়ুন:

শেষ বসন্তের সন্ধ্যাহাওয়া শস্যশূন্য মাঠে ('ক্ষণিকা')
কন্যা তখন নিঃসংকোচে কয় ('পলাতকা')
বৈরাগ্যে মন ভারি ('পলাতকা')

'যমুনাবতী'তে আছে পাঁচ সিলেবল আর 'শেষ বসন্তে'র 'শস্যশূন্য' 'নিঃসংকোচে' 'বৈরাগ্যে মন' এ গুলির প্রত্যেকটিতে চার, কিন্তু এখানে চার সিলেবলের ওজন যে অবিকল পাঁচ সিলেবলের সমান এ-কথা নিছক কান দিয়েই বোঝা যায়, বিদ্যাবুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন হয় না। কানের কাছে চার আর পাঁচ সিলেবল-এ যদি তফাৎই না রইলো তাহ'লে এ-কথা বলার সার্থকতা কোথায় যে পর্বের ঠিক-ঠিক মাপটি হচ্ছে চার সিলেবল। পক্ষান্তরে চার সিলেবল হ'লেই যে ছন্দ ঠিক হবে তাও তো নয়:

'ওগো যৌবন'-তরী,
এবার বোঝাই সাঙ্গ ক'রে দিলেম বিদায় করি।...
সেথায় সোনা-মেঘের ঘাটে নামিয়ে দিয়ো শেষে
বহুদিনের বোঝা তোমার 'চির-নিদ্রার' দেশে।
('ক্ষণিকা'—'যৌবন-বিদায়')

'চির-নিদ্রার' নিশ্চয়ই চার সিলেবল, 'ওগো যৌবন'ও তা-ই কিন্তু শুনতে ভালো হয়নি, স্বরবৃত্ত ধরনে পড়তে অসুবিধেই হয়। যদি লেখা হ'তো

'ওগো জীবন'-তরী,
'চির ঘুমের' দেশে

তাহ'লেও এক-এক পর্বে চার সিলেবলই থাকতো, কিন্তু ছন্দ কোথাও বাধা পেতো না। চার সিলেবলেই ছন্দ কেটে যাচ্ছে, আবার চার সিলেবলেই ছন্দ ঠিক চলছে—এই থেকে বোঝা যাবে যে সিলেবলের কথাই এখানে ওঠে না। প্রাচীন কবিরা অক্ষর গুনে-গুনে ছন্দ লিখতে গিয়ে ভুল করেছিলেন শুনতে পাই, আধুনিক ছান্দসিক সিলেবল গুনে-গুনে ছন্দ বুঝতে গিয়ে ভুল করছেন দেখতে পেলাম। স্বরবৃত্তের স্বরূপ নিয়ে প্রবোধচন্দ্রকে নতুন ক'রে ভাবতে হবে।

৭

ছন্দের যে-তিনটি প্রধান বিভাগ নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করলাম, তা ছাড়াও আরো একটি ছন্দ বাংলায় পাওয়া যায়, তার আকৃতি পয়ারের, কিন্তু প্রকৃতি তিন মাত্রার, পয়ারের মতোই জোড় মাত্রায় তার চলন, কিন্তু প্রবোধচন্দ্রের 'যৌগিকে'র লক্ষণ তার নেই, যুগ্মস্বর বিষয়ে সে মাত্রাবৃত্তের সধর্মী, যে-কোনো যুগ্মস্বর তাতে দু-মাত্রা হ'তেই হবে। রবীন্দ্রনাথ 'ছন্দের অর্থ' প্রবন্ধে দুই মাত্রার চলনের প্রথম যে-দৃষ্টান্তটি দিয়েছেন তাকে এই ছন্দের ছাঁচ ব'লে গ্রহণ করা যায় :

ফিরে ফিরে আঁখিনীরে পিছু পানে চায়
পায়ে পায়ে বাধা প'ড়ে চলা হ'লো দায়।

মনে হ'তে পারে, এ তো রীতিমতো পয়ারই হ'লো, কিন্তু এর সঙ্গে যুক্তবর্ণ যোগ ক'রে পরীক্ষা করা যাক :

ফিরে ফিরে আঁখিনীরে পিছুপানে চায়
পায়ে পায়ে বাধা প'ড়ে চলা হ'লো দায়।
অঞ্চল বেধে যায় চম্পক-শাখে,
ঝ'রে-পড়া পল্লব বারে-বারে ডাকে।
আনলো তীক্ষ্ণ-কালো চক্ষে আবেশ
বন্ধুর বিরহের অশ্রুর রেশ।

সমস্তটা পড়লে কোনো সন্দেহই থাকবে না যে ছন্দের চরিত্র বদলে গেছে—পয়ারের পদাতিক চলন নয় এর, যুক্তবর্ণের ঢেউয়ে-ঢেউয়ে নেচে-নেচে চলাতেই এর আনন্দ। ঠিক মাত্রাবৃত্তের মতো ধরন। আবার হসন্তের ঘেঁষাঘেঁষিতে স্বরবৃত্তের মতো একটা আহ্লাদি চেহারাও এর হ'তে পারে।

খুব তার বোলচাল সাজ ফিটফাট
তকরার হোলে তার নাই মিটমাট,
চষমায় চমকায় আড়ে চায় চোখ,
কোনো ঠাঁই ঠেকে নাই কোনো বড়ো লোক।

এ-উদাহরণটি রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' বই থেকেই নিয়েছি, একে তিনি বলেছেন 'পয়ারের ছিবলেমির একটা পরিচয়।' এখানে স্বরবৃত্তের মতো হসন্তের তালি পড়ছে ঘন-ঘন, কিন্তু স্বরবৃত্তের মতো মাঝে-মাঝে ফাঁক রাখবার উপায় নেই, মাত্রাবৃত্ত ধরনে আগাগোড়া ভরপুর হওয়া চাই। এই 'ছিবলে' ছন্দের আভাস ছিলো ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তে :

বিবিজান চ'লে যান লবেজান ক'রে

কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের রচনায় এ-ছন্দ যুক্তবর্ণে এসেই আর টি‍ঁকলো না :

সিন্দুরের বিন্দুসহ কপালেতে উল্কি

এখানে খাঁটি পয়ার ফিরে এলো। প্রবোধচন্দ্র দেখিয়েছেন যে আলোচ্য ছন্দটি গ'ড়ে উঠলো রবীন্দ্রনাথেরই হাতে। এর নাম তিনি দিয়েছেন মাত্রিক পয়ার—পয়ার বলতে প্রবোধচন্দ্র চোদ্দ মাত্রার ছন্দোবন্ধ বোঝেন—তাঁর হিশেবে পয়ার 'তিন রকমের হতে পারে···যৌগিক···মাত্রিক···স্বরবৃত্ত।' যদি চোদ্দ মাত্রার ছন্দোবন্ধকেই পয়ার বলতে হয় তাহ'লে মাত্রাবৃত্ত পয়ারই বা পযার নয় কেন ?—

শয়ন-শিয়রে প্রদীপ নিবেছে সবে
জাগিয়া উঠেছি ভোরের কোকিল রবে

এ ছাড়াও মাত্রাবৃত্তে চোদ্দ মাত্রার আরো কত বিচিত্র বিন্যাস সম্ভব রবীন্দ্রনাথ 'ছন্দের অর্থ' প্রবন্ধে তা দৃষ্টান্ত দিয়ে-দিয়ে দেখিয়েছেন। তার প্রথমটি হচ্ছে এই :

ফাগুন এল দ্বারে কেহ যে ঘরে নাই
পরান ডাকে কারে ভাবিয়া নাহি পাই।

এটা যে 'মোটেই পয়ার নয়', তা রবীন্দ্রনাথ ব'লে না-দিলেও আমাদের কানেই ধরা পড়তো। কিন্তু প্রবোধচন্দ্র যদি 'মাত্রিক পয়ার' আর 'স্বরবৃত্ত পয়ার' স্বীকার করেন তাহ'লে এটাকে, এবং চোদ্দ মাত্রার অন্যান্য মাত্রাবৃত্ত বিন্যাসকে, পয়ার ব'লে তাঁকে মানতে হবে। পয়ারকে একটা ছন্দ না-ভেবে একটা ছন্দোবন্ধ ভাবলে এইরকম সব অসংগতি থেকে-থেকে দেখা দেবেই।

তাছাড়া অবশ্য মাত্রিক যে চোদ্দ মাত্রারই হ'তে হবে তা না, অন্যান্য ছন্দের মতো ছোটো-বড়ো নানা আকারেই তার চলাফেরা। এ-ছন্দ আট

মাত্রায় লিখতে সত্যেন্দ্রনাথ আর সুকুমার রায় দু-জনেই অভ্যস্ত ছিলেন :

প্যাঁচা কয় প্যাঁচানি
খাশা তোর চ্যাঁচানি
শুনে শুনে আনমন
নাচে মোর প্রাণমন।

চুপ চুপ ঐ ডুব
দেয় পানকৌটি
দেয় ডুব চুপ চুপ
ঘোমটার বৌটি।

আটমাত্রা থেকেই ষোলো মাত্রা পাওয়া যাচ্ছে :

বিদঘুটে জানোয়ার কিমাকার কিম্ভূত
সারাদিন ধ'রে তার শুনি শুধু খুঁতখুঁত,
মাঠপাড়ে ঘাটপাড়ে কেঁদে মরে খালি সে
ঘ্যানঘ্যান আবদারে, ঘন-ঘন নালিশে।

ঘর বার করবার দরকার নেই আর
মন দাও চরকায় আপনার আপনার।

দশ মাত্রা, যেমন : আহা তুমি পায়রাটি ফুটফুটে
আর আমি পায়রাটি মিশকালো

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এ-ছন্দে কুড়ি মাত্রা পর্যন্ত লিখেছেন :

অপ্সরী কোথা শাপভ্রষ্ট সে অশ্বিনী হায় রে

আঠারো মাত্রার কোনো উদাহরণ মনে পড়ছে না, একটা বানিয়ে দেয়া গেলো :

পৌষের সৈনিক কেড়ে নিক ফুর্তির প্রাণ
ভয় নেই আসবেই চৈত্রের শৌখিন গান।

অসমপংক্তিক তো করলেই হ'লো, মুক্তক হয় কিনা দেখা যাক :

বনে-বনে বেজে যায় সুন্দর জ্যোছনায়
চৈত্রের চঞ্চল মঞ্জীর,
পরিদের জমে ভিড়।
যত ভয় সংশয় দুঃখের শঙ্কিত মেঘ-ভার
নেই আর।
হাওয়া বয় ঝিরঝির, অস্থির-পল্লব-করতাল
নৃত্যের দেয় তাল।
একা চাঁদ
চুপ ক'রে চেয়ে থাকে নীল জলে। দেখে তার
আপনার মুখ, আর
আকাশের উজ্জ্বল উল্লাস।
মনে ভাবে বিশ্বে কি এত সুখ! উৎসুক
ঘাসে-ঘাসে কার ছোঁওয়া,
কার ছায়া
গাছে-গাছে শিহরায়, পরিদের পায়-পায়
আসে যায় কে যেন আগন্তুক।
এত সুখ! কার সুখ এই সুখ!

পদ্যটায় চার মাত্রার চলন লক্ষ্য করছি, পংক্তিগুলি চার, আট, বারো, যোলো আর কুড়ি মাত্রায় চলছে। পয়ারের মতো মুক্তক অবশ্য হ'লো না—এ-ছন্দে তা হ'তে পারে না—তবে মাত্রাবৃত্ত যতটা মুক্তক হ'তে পারে এও ততটাই হয়েছে বোধহয়।

অবহিত পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে যুক্তবর্ণের সঙ্গে এর সম্বন্ধ

বিজোড় মাত্রার ছন্দের মতো হ'লেও পয়ারের মতোই বিজোড়মাত্রিক পংক্তিকে এ আমল দেয় না।

প্যাঁচা কয় প্যাঁচানি
খাশা তোর চ্যাঁচানি

মাঠপাড়ে ঘাটপাড়ে কেঁদে মরে খালি সে
ঘ্যানঘ্যান আবদারে, ঘন-ঘন নালিশে।

অপ্সরী কোথা শাপভ্রষ্ট সে অশ্বিনী হায় রে—

এগুলিকে কেউ বিজোড়মাত্রিক ব'লে ভুল করবেন না আশা করি, শেষমাত্রায় একটু যে কম আছে, সেটুকু আমরা অচেতন অভ্যাসবশতই টেনে পুষিয়ে নিই—ঐ কমটুকুকে কম বলাই আসলে ভুল।

মাঠপাড়ে ঘাটপাড়ে কেঁদে-মরে খালি সে
ঘ্যানঘ্যান আবদারে ঘন-ঘন নালিশে

আর, মাঠপাড়ে ঘাটপাড়ে কেঁদে মরে খালি সেই
ঘ্যানঘ্যান আবদারে ঘন-ঘন নালিশেই

কানের কাছে এ-দুয়ে কোনো প্রভেদ নেই। শিশু ভোলানাথের 'তালগাছ' কবিতার প্রথম স্তবকটিকে যদি এ-ভাবে লেখা যায়

তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়েই
উঁকি মারে সব গাছ ছাড়িয়েই
মনে সাধ আকাশেতে উড়ে যায়
বাসাখানি একেবারে ফুঁড়ে হায়,
হায় তার পাখা নেই!

তাহ'লে ছন্দের রস বদলে যায় কিন্তু রূপের বদল হয় না। 'দাঁড়িয়ে' আর 'উড়ে যায়' দুটোই যে এখানে চার মাত্রার মূল্য পাচ্ছে, মূলের সঙ্গে এটি মিলিয়ে পড়লে সে-বিষয়ে সন্দেহ থাকবে না।

এই মাত্রিক ছন্দের দুটো রূপ বাংলা কবিতায় দেখা যায়। একটা রবীন্দ্রনাথের 'ছিবলে পয়ার', যুক্তবর্ণকে এড়িয়ে শুধু হসন্তের ধাক্কায় গড়িয়ে-গড়িয়ে চলে। হাসিতে ঠাট্টায় ছোটোদের কবিতায় সুশোভন, সত্যেন্দ্র দত্ত একে জাতে তুলেছিলেন, সুকুমার রায় ভালোবেসেছিলেন। 'আবোল-তাবোলে'র অনেকগুলি কবিতাই এ-ছন্দে লেখা, আর তার একটিতে এ-ছন্দ এমন আশ্চর্যরকম জমকালো হ'য়ে উঠেছে, ঠিক যেমনটি আর কোনো কবিতাতেই আমি লক্ষ্য করিনি। কবিতাটির নাম 'হুলোর গান'।

বিদঘুটে রাত্তিরে ঘুটঘুটে ফাঁকা,
গাছপালা মিশমিশে মখমলে ঢাকা।
জটবাঁধা ঝুলকালো বটগাছতলে
ধকধক জোনাকির চকমকি জ্বলে।...
পুবদিকে মাঝরাতে ছোপ দিয়ে রাঙা
রাতকানা চাঁদ ওঠে আধখানা ভাঙা।

বাইশ লাইনের এই কবিতায় যুক্তব্যঞ্জন আছে তিনটি মাত্র—ঝুপঝুপ ক'রে হসন্তের দাঁড় ফেলে ফেলে খরবেগে চলেছে হালকা নৌকো, অথচ 'বিবিজান লবেজান' কি 'খুব তার বোলচাল'-এর মতো ঠাট্টার ভাবটা নেই, বেশ একটা গা-ছমছম-করা কবিত্বের সুর লেগেছে।

এ-ছন্দের অন্য রূপটিতে যুক্তবর্ণের প্রাধান্য। একে বলা যেতে পারে বিশেষভাবে রাবীন্দ্রিক, কেননা

নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল

'মানসী'র এই প্রাথমিক পরীক্ষা থেকে আরম্ভ ক'রে 'গল্পসল্পে'র

তাই তো নিয়েছি কাজ উপদেষ্টার
এ কাজটা সবচেয়ে কম চেষ্টার

পর্যন্ত এ-রীতিতে যত কবিতা রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন, তারা অভাবনীয় বৈশিষ্ট্য পেয়েছে যুক্তবর্ণের ঝংকারে। 'বিদঘুটে রাত্তিরে ঘুটঘুটে ফাঁকা'-কে বাহবা দিতে হয়, কিন্তু এর একটা অসুবিধে এই যে ৪+৪+৪+২ ছাড়া অন্য কোনোরকম মাত্রাবিভাগ আনতে গেলেই এর তরতরে ফুর্তির ভাবটা আর থাকে না, আর প্রতি পংক্তিতে একই ধরনের যতিপাতে কান ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে সহজেই। সেইজন্য অল্পে শেষ ক'রে না-দিলে এর শেষরক্ষা হয় না। (সত্যেন্দ্র দত্তর 'ছিপখান তিন দাঁড়' সম্বন্ধে আমরা কে না মনে-মনে ভেবেছি, 'আহা, কবিতাটি যদি এর অর্ধেক হ'তো!') ছোটো আকারের মধ্যেও যদি যতিবৈচিত্র্যের দাবি থাকে, তাহ'লেও একে দিয়ে কাজ চলবে না। এ যদিও হাতের কাছেই ছিলো, রবীন্দ্রনাথ একে বড়ো একটা ডেকে পাঠাননি, শিশুপাঠ্য কবিতাতেও না। 'সহজ পাঠে'র পদ্যগুলি শুধু স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণেরই নয়, ছন্দের উদাহরণরূপেও স্মরণীয় :

আমাদের ছোট নদী চলে আঁকেবাঁকে
বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে···

গঞ্জের জমিদার সঞ্জয় সেন
দু মুঠো অন্ন তারে দুই বেলা দেন।
সাতকড়ি ভঞ্জের মস্ত দালান
কুঞ্জ সেখানে করে প্রত্যুষে গান।

যুক্তবর্ণের নূপুর বেজে উঠলো, যতিবিন্যাসও হ'লো বিচিত্র। ছোটোদের পদ্যে, লঘুরসের কবিতায় এ-ছন্দ বার-বার এসেছে রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের রচনায়, আবার এই ছন্দেই আবেগমধুর গীতিকবিতার নিদর্শন লেখা হ'লো :

ওগো বধূ সুন্দরী
তুমি মধুমঞ্জরী
পুলকিত চম্পার লহ অভিনন্দন
স্বর্ণের পাত্রে
ফাল্গুন রাত্রে
মুকুলিত মল্লিকামাল্যের বন্ধন।

শরদের ধ্বনির মতো যুক্তবর্ণ বেজে চলেছে। আর কি একে সেই 'ছিবলে পয়ার' ব'লে চেনা যায়!

না, চেনা যায় না, কিন্তু তাই ব'লে কি এর জাত আলাদা হ'য়ে গেলো, না কি এটা পয়ারেরই একটা শাখা? ফশ ক'রে ব'লে উঠতে ইচ্ছে করে—নিশ্চয়ই আলাদা। কোথায় 'মহাভারতের কথা অমৃতসমান,' আর কোথায় 'ওগো বধূ সুন্দরী'! কিন্তু যদি এই ছন্দে কখনো যুক্তবর্ণ বা হসন্ত শব্দ বিরল হয় তাহ'লেই পয়ারের সঙ্গে তার জাতের মিল আর গোপন থাকে না।

ফিরে-ফিরে আঁখি-নীরে পিছুপানে চায়
পায়ে পায়ে বাধা প'ড়ে চলা হোলো দায়

এখানে শুধু দুই-দুই মাত্রায় চলেছে ব'লে শুনতে নতুনরকমের হয়েছে, কিন্তু

যেটা যা হয়েই থাকে সেটা তো হবেই,
হয় না যা তাই হোলে ম্যাজিক তবেই।
নিয়মের বেড়াটাতে ভেঙে গেলে খুঁটি
জগতের ইস্কুলে তবে পাই ছুটি।

('গল্পসল্প')

এখানে পয়ারের সুর দুর্বারভাবে এসে পড়লো। এ ছাড়া এই ছন্দের আরো

একটা ভঙ্গি আছে, যেটা খুব বেশি পয়ার-ঘেঁষা। সেটা 'সোনার তরী' কবিতার ছন্দ, প্রবোধচন্দ্র তাকে বলেছেন উনমাত্রিক পয়ার। সমস্ত 'সোনার তরী' কবিতায় একটিমাত্র যুক্তবর্ণ আছে, কিন্তু ঐ ছন্দকেই যুক্তাক্ষরে ঝংকৃত ক'রে উত্তর-রবীন্দ্রনাথ ধ্বনির যে-ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছিলেন, প্রবোধচন্দ্র তার যথাযথ বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর ব্যবহৃত একটি কাব্যাংশই তুলে দিচ্ছি :

> তোমারে ডাকিনু যবে কুঞ্জবনে
> তখনো আমের বনে গন্ধ ছিলো,
> জানি না কী লাগি ছিলে অন্যমনে
> তোমার দুয়ার কেন বন্ধ ছিলো।

যে-কারণে প্রবোধবাবু পয়ারকে যৌগিক বলেছেন পয়ারের সেই প্রধান লক্ষণই এ-ছন্দে নেই, তবু একে আস্ত একটা রাজত্ব দিয়ে না-ফেলে পয়ারেরই একটা প্রদেশ ব'লে গণ্য করা ভালো। পুনরুক্তির আশঙ্কা সত্ত্বেও বলতে হচ্ছে যে পয়ার বলতে এখানে একটা ছন্দ বোঝাচ্ছে, ছন্দোবন্ধ নয়। প্রবোধচন্দ্রের 'মাত্রিক' নাম চলতে পারে। মনে করতে দোষ নেই যে পয়ারের দুটো রীতি আছে, একটা 'যৌগিক,' তাতে যুগ্মধ্বনি কখনো এক মাত্রা, কখনো দু-মাত্রা ; আর একটা 'মাত্রিক', যাতে যুগ্মধ্বনি সর্বদাই দু-মাত্রা।

৮

ইংরেজিতে দুটো শব্দ আছে, 'মিটার' আর 'রিদম' ; বাংলায় সাধারণ-ভাবে দুটোকেই আমরা বলি ছন্দ। কিন্তু পারিভাষিক ব্যবহারের জন্য এমন একটা কথা প্রয়োজন, যাতে রিদম বোঝায়। প্রবোধচন্দ্র বলেছেন ছন্দস্পন্দ, ধ্বনিস্পন্দন বললেও দোষ হয় না। তবে এ-পরিভাষা শুধু কাব্যছন্দের আলোচনায় চলতে পারে, ব্যাপক অর্থে ধরলে রিদমকেই ছন্দ না-ব'লে উপায় থাকে না। এতক্ষণ যে-আলোচনটা হ'লো সেটা মিটার নিয়ে, কিন্তু

কবিতার পাঠকমাত্রেই জানেন যে ছন্দের প্রাণ হ'লো রিদম। এমন পদ্য হ'তে পারে যাতে মিটার ঠিক আছে কিন্তু রিদম দুর্বল, সে-ছন্দ নিশ্চয়ই অছন্দ। কিন্তু রিদম-এর জোর যেখানে আছে সেখানে মিটার-এর জন্য ভাবতে হয় না, কেননা রিদমই ছন্দসরস্বতী, মিটার তাঁর বাহনমাত্র, দেবীর সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর রাজহাঁসটিকে পাওয়া যাবেই। এই রিদম—ছন্দই বলা যাক—আছে চিত্রে, নৃত্যে, ভাস্কর্যে, সমস্ত শিল্পকলায়, আছে জলের ঢেউয়ে, মেঘের রঙে, গাছের গড়নে, বিচিত্র বিশ্বসৃষ্টিতে। এই ছন্দোবোধ নিয়ে যিনি জন্মান তিনিই শিল্পী। বোধ না-ব'লে বোধি বলা উচিত, কারণ এটা তাঁকে শিখতে হয় না, এটা তাঁর ইন্সটিংক, রিদম তাঁর রক্তে। যাঁর প্রাণে ধ্বনির ছন্দ তিনি সুরকার, যাঁর প্রাণে রেখা-রঙের ছন্দ তিনি চিত্রকর। আর মানুষের ব্যবহৃত ভাষার ছন্দ যাঁর প্রাণে অবিরাম তরঙ্গ তোলে, তিনিই কবি হ'য়ে ওঠেন। এই ভাষার দুটো বড়ো মহল আছে—গদ্য আর পদ্য। ছন্দ, রিদম, এটা যে শুধু পদ্যেরই প্রাইভেট প্রপার্টি তা তো নয়, গদ্যের শিল্পরূপেরও তাতে অধিকার আছে। 'গদ্যছন্দ কথাটি অনর্থক ও অবাস্তব', প্রবোধবাবুর এ-কথাটিই তাই অবাস্তব ও অনর্থক হ'য়ে পড়েছে। গদ্যে পদ্যের মতো 'সুনিয়মিত, সুপরিমিত ও সুনির্দিষ্ট' ধ্বনিবিন্যাস নেই, অর্থাৎ মিটার নেই, এ তো জানা কথাই, কিন্তু ছন্দস্পন্দ আছে, রিদম আছে ; গদ্য-ছন্দকে স্বীকার না-ক'রে তাই উপায় কী। সব গদ্যে রিদম থাকে না, সব পদ্যেই কি থাকে! যাতে ধ্বনির স্পন্দন জাগেনি এমন গদ্যের পরিমাণ পৃথিবীতে যত, এমন পদ্যের পরিমাণ তার চেয়ে কিছু হয়তো কম, এর বেশি আর কী বলা যায়? কিন্তু এর সঙ্গে এ-কথাও ভাববার আছে যে বিশ্বসাহিত্য থেকে গদ্যরচনার শ্রেষ্ঠ নমুনাগুলি যদি সংগ্রহ করা যায়, তাহ'লে দেখা যাবে তার কোনোটিই ছন্দোচ্যুত নয়। গদ্য যখন সাহিত্য হয়েছে, আর্ট হয়েছে, তখন ছন্দস্পন্দন জেগে উঠেছে অনিবার্যভাবেই। গদ্যকবিতা কথাটা নতুন হ'তে পারে, কিন্তু গদ্যছন্দ চিরকালের, ইংরেজি সাহিত্যে বাইবেল থেকে বর্নার্ড শ পর্যন্ত তার কত ভঙ্গিই না দেখা গেলো। পদ্যের 'অতিনিরূপিত' ধ্বনিস্পন্দনের সঙ্গে গদ্যের অনতিব্যক্ত ধ্বনিস্পন্দনের পার্থক্যটা কী-রকম, তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন,

এখানে আমি আর সে-বিষয়ে কিছু বলতে চাই না। তবে রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার আলোচনায় প্রবোধচন্দ্রের দু-একটি মন্তব্য আমাকে অবাক করেছে ব'লেই আরো কিছু বাক্‌বিস্তার আবশ্যক হ'লো।

রবীন্দ্রনাথ গদ্যছন্দকে বলেছেন ভাবছন্দ। 'এ উক্তিটি' প্রবোধচন্দ্রের 'হেঁয়ালির মতো বোধ হয়।' তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন, 'তাহ'লে কি ও-সব কবিতার রচনাভঙ্গিতে ধ্বনিসুষমা একেবারেই নেই?' ভাবছন্দ ধ্বনিসুষমার বিরোধী এমন কথা প্রবোধচন্দ্র ভাবতে পারলেন কেমন ক'রে? আসলে শুধু গদ্যছন্দই নয়, পদ্যছন্দও ভাবছন্দ, ছন্দ সেখানেই সুন্দর, যেখানে ভাবের ধারাকে তা অনুসরণ করে, হ'য়ে ওঠে ভাবেরই ধ্বনিময় রূপ। পদ্যে মিটার-এর ঝংকার আছে ব'লে তার ছন্দের ভাবানুবর্তিতা আমরা সব সময় লক্ষ্য করি না, কিন্তু গদ্যছন্দের সেটাই সর্বস্ব ব'লে তাকে বিশেষ অর্থে বিশেষ স্থলে ভাবছন্দ বলার সার্থকতা আছে—রবীন্দ্রনাথ তা-ই বলেছেন। আবেগের আঘাত ধ্বনির যে-তরঙ্গ তোলে আমাদের মুখের কথায়, সেটাই তো ভাবছন্দ, আর গদ্যছন্দ তারই প্রতিরূপ। কথাটা রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টান্ত-সহযোগে বুঝিয়ে বলেছেন :

'মুখের কথায় আমরা যখন খবর দিই তখন সেটাতে নিশ্বাসের বেগে ঢেউ খেলায় না, যেমন,—

"তার চেহারাটা মন্দ নয়"

কিন্তু ভাবের আবেগ লাগাবামাত্র ঝোঁক এসে পড়ে, যেমন—

"কী সুন্দর তার চেহারাটি।"

একে ভাগ করলে এই দাঁড়ায়—

"কী সুন্। দর তার। চেহারাটি"।'

এই রকম আরো কয়েকটি বাক্য রবীন্দ্রনাথ রচনা ক'রে দিয়েছেন যা 'প্রতিদিনের চলতি কথার সহজ ছন্দ, গদ্য, কাব্যের গতিবেগে আত্মরচিত।' দৃষ্টান্তের সংখ্যা আমরা প্রত্যেকেই ইচ্ছেমতো বাড়িয়ে যেতে পারি, কিন্তু তার দরকার নেই, এই একটি দৃষ্টান্ত নিয়েই ভেবে দেখা যাক। 'কী সুন্দর

তার চেহারাটি' এই হচ্ছে আমাদের মুখের স্বতঃস্ফূর্ত কথা, সহজ ব'লেই ওর প্রাণশক্তি প্রবল। এই প্রাণশক্তিই তো সাহিত্যকলার কাম্য। গদ্য লিখলে হুবহু এই কথাটিই বসিয়ে দেয়া যায়, সেটা গদ্যের মস্ত সুবিধে, কিন্তু এই কথাটাই পদ্যে বলতে হ'লে কী করতাম?

আহা তার চেহারাটি কী যে সুন্দর!

পদ্য হ'লো, কিন্তু কবিতা হ'লো না, আবেগ লাগলো না।

দেহখানি তার দোহারা
কী যে সুন্দর চেহারা!

মিল-টিল সবই হ'লো, কিন্তু ঠাট্টার মতো শোনায়। 'চেহারা' কথাটাই পদ্যের জাত নামিয়ে দিচ্ছে। গদ্যের সহজ ঋজু ভঙ্গিকে পদ্য মাঝে-মাঝে ঈর্ষা করতে পারে, কিন্তু সে-ঈর্ষায় সে প্রাণত্যাগ করেনি, আবিষ্কার করেছে অন্য একটি ভাষা, যাতে অপরূপ অতিরঞ্জনের সাহায্যে সমস্ত কথার সার সত্য একেবারে চিরকালের বুকের উপর লেখা হ'য়ে যায়। 'কী সুন্দর তার চেহারাটি', এ-কথা পদ্য গদ্যের মতো ক'রে বলবার চেষ্টাই করে না, সে বলে :

জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।

—আর গদ্য অবাক হ'য়ে তাকিয়ে থাকে। তখন বোঝা যায় যে স্বভাবের অবিকল অনুকৃতির যে-শক্তি গদ্যের আছে, সেই সুবিধার দ্বারাই সে সীমাবদ্ধ, পদ্যের মতো যখন-তখন অসীমে যাত্রা করতে সে পারে না, বাস্তবিকতার শৃঙ্খলে সে মাটিতে বাঁধা। অথচ 'জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু'-র মধ্যেও 'অস্বাভাবিকতা'র চিহ্নমাত্র নেই, একে কিছুতেই বলা চলবে না 'কৃত্রিম'; 'কী সুন্দর তার চেহারাটি' যেমন বিশেষ-কোনো মুহূর্তে

. যে-কোনো মানুষের মুখের কথা, এও তেমনি বিশেষ-কোনো মুহূর্তে বিশেষ-কোনো মানুষের মুখের কথা। এই যে মুখের কথায় জোর, এই যে আবেগের আত্ম-উৎসারিত তরঙ্গ, ভাবছন্দ তো এইটেই, আর পদ্যের ছন্দোরীতির মধ্যে—মিটার-এর মধ্যে—এটাই লীন হ'য়ে থাকে; তা যদি না থাকতো তাহ'লে কবিতা হ'তো এমন একটা সৃষ্টিছাড়া পদার্থ যা কোনোকালে কোনো মানুষের প্রাণে নাড়া দিতে পারতো না। কবিতার যে-কোনো স্মরণীয় চরণ নিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে আবেগের অনিবার্য বেগের সঙ্গে এমনভাবে মিলিয়ে কথাটি বলা হয়েছে যে আটপৌরে মুখের কথাতেও ওর চেয়ে সহজ, প্রাণময় প্রকাশ সম্ভব ছিলো না। অবশ্য পদ্যছন্দের খাতিরে ভাবছন্দ কখনোই যে ব্যাহত হয় না তা নয়, কিন্তু সেটা ছন্দের দোষ, কাব্যের দুর্বলতা। কবিগুরুর রচনাতেও ক্বচিৎ এ-দুর্বলতা প্রবেশ করতে পারে, তাই ব'লে প্রবোধচন্দ্রের এ-কথা প'ড়েও স্তম্ভিত না-হ'য়ে উপায় থাকে না যে 'পদ্যরচনায় ছন্দের বন্ধনকে মেনে নিতে হয় ব'লে কবিকে অনেকাংশেই ভাবের স্বাচ্ছন্দ্য হারাতে হয়; আর গদ্যরচনায় ছন্দোবন্ধের বালাই থাকে না ব'লে রচয়িতার স্বাচ্ছন্দ্য বজায় থাকে।' বলা বাহুল্য, ছন্দটা কবির বন্ধন নয়, সেটা তাঁর উপায়। কিসের উপায়? ভাবকে পাবার, ধরবার, বলবার। ভাবের ছন্দ আর রচনার ছন্দ যদি কবির কাছে অভিন্ন না হ'তো, যদি ছন্দের জন্য 'অনেকাংশেই ভাবের স্বাচ্ছন্দ্য হারাতে' হ'তো তাঁকে, তাহ'লে ছন্দ তিনি লিখতেনই না, কেননা ভাবের প্রকাশের জন্যই তাঁর লেখা, ছান্দসিককে দৃষ্টান্ত জোগাবার জন্য নয়। কবি চিন্তাই করেন ছন্দে, কাব্যছন্দের সঙ্গে ভাবছন্দ তাঁর মনে এমনভাবে মিশে থাকে যে ভাবছন্দ কোথাও বাধা পেলে সেই রিদমও ক্ষুণ্ণ হয়, যে-রিদম ছন্দের, মানে মিটার-এর, প্রাণ।

বিপুলা এ-পৃথিবীর কতটুকু জানি

এখানে কাব্যছন্দের সঙ্গে ভাবছন্দ মিশে আছে, গদ্যে বললেও এ-ই বলতাম, কিন্তু এতটা বলা হ'তো না। এই কবিতারই অন্য দুটি পংক্তি:

আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী

এখানে কাব্যছন্দ ঠিক ভাবছন্দের অনুসরণ করতে পারেনি, 'সে সর্বত্র-গামী'তে রিদম দুর্বল হ'য়ে পড়েছে, সমস্তটায় একটু আড়ষ্ট ভাব এসেছে, পংক্তি দুটি হয়েছে যাকে ইংরেজিতে বলে 'প্রোজেইক'। সহজ গদ্যে এ-কথাটি এর চেয়ে ভালো ক'রে বলা যেতো ; এবং সেই পদ্যাংশই প্রোজেইক, গদ্যে রূপান্তরিত করলে যার সৌষ্ঠব বাড়ে।

এ-রকম অসিদ্ধার্থ পদ্য-পংক্তি রবীন্দ্র-রচনায় বিরল, এ যেমন বলবার কথাই নয়, তেমনি একটা দুটো যে আছে তাতেও অবাক হবার কিছু নেই। কিন্তু এ থেকে এ-রকম অনুমান কিছুতেই করা যায় না যে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যের আশায় রবীন্দ্রনাথ 'ছন্দোবন্ধের বালাই' না-রেখে গদ্যকবিতা লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। ছন্দোবন্ধ একটা 'বালাই' নয়, মিলও তা নয়,* ওগুলো কবির প্রয়োজন, যেমন প্রয়োজন পথিকের পক্ষে পথ কিংবা যাত্রীর পক্ষে যান ; কোনো জন্মেও কোনো কবির তাতে স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব হয়নি। রবীন্দ্রনাথ—বা অন্য যে-কোনো উল্লেখযোগ্য কবি—যে ছন্দোবন্ধের বদলে গদ্যছন্দে কবিতা লিখেছেন সেটা এই কারণেই যে কোনো-কোনো বিষয় বা ভাবের পক্ষে তখনকার মতো গদ্যছন্দই তাঁর বেশি উপযোগী মনে হয়েছে, তার মানে কবিতাটা গদ্যছন্দেই 'এসেছে'।† গদ্যছন্দে যে-স্বাধীনতা বেশি এ-কথাও ঠিক নয়, বরং তালের সাহায্য পাওয়া যায় না ব'লে এর

* মিলের কথাটা উল্লেখ করলাম এইজন্য যে প্রবোধচন্দ্র ধ'রেই নিয়েছেন যে গদ্য-কবিতা অবশ্যই মিলহারা। অধিকাংশ গদ্যকবিতা অমিল হ'লেও সমিল হবার বাধা নেই তার—ইংরাজিতে সমিল গদ্যকবিতা হয়েছে, বাংলাতেও হয়েছে। অমিল পদ্য যেমন সম্ভব, সমিল গদ্যও তেমনি। আর-একটি কথা: রবীন্দ্রনাথ গদ্যকবিতা লিখেছেন মুক্তকের ভঙ্গিতে, কিন্তু অন্যান্য কবিরা তাতে স্তবকবিন্যাসও করেছেন।

† অবশ্য বিশেষ কোনো-কোনো ক্ষেত্রে একই কবিতা গদ্যে এবং পদ্যে লেখা হ'তে পারে ; রবীন্দ্রনাথ তা 'আফ্রিকা' কবিতায় দেখিয়েছেন।

ধ্বনিস্পন্দন রক্ষার সমস্তটা ভার এসে পড়ে কবির স্বাভাবিক ছন্দোবোধের উপর, কবির দায়িত্ব বেড়ে যায়। এ থেকে কেউ আবার এ-রকম যেন ভেবে না বসেন যে গদ্যকবিতা রচনার কাজটাই বেশি শক্ত—শিল্পকলার ক্ষেত্রে কোনটা কোনটার চেয়ে দুরূহ সে-কথা ওঠেই না—কিছুই সহজ নয়, আবার সবই সহজ।

গদ্যকবিতা সম্বন্ধে প্রবোধচন্দ্র ধারণা করেছেন তা যেন ছন্দোবদ্ধ কবিতারই ভ্রূণাবস্থা—'গদ্যকবিতাকে "ছন্দোগন্ধী" বা "পদ্যগন্ধী" কবিতা ব'লে অভিহিত করাই সমীচীন।' কোনো-কোনো ক্ষেত্রে সমীচীন যে হ'তে না পারে তা নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা বিশুদ্ধ গদ্য, পদ্যের আভাসমাত্র নেই তাতে। 'আকাশ-প্রদীপে'র 'ময়ূরের দৃষ্টি' কবিতা থেকে একটি অংশ প্রবোধচন্দ্র তাঁর সপক্ষের সাক্ষীস্বরূপ দাঁড় করিয়েছেন, কিন্তু 'তোমার কণ্ঠস্বরে গদ্যে রং ধরে পদ্যের' এ-কথা কৌতুক হ'তে পারে, কবিত্ব হ'তে পারে, রাবীন্দ্রিক আবৃত্তির প্রতি উল্লেখ হ'তে পারে, গদ্যছন্দে রবীন্দ্র-ভঙ্গির বর্ণনা হ'তে পারে না। গদ্যছন্দে পদ্যের আভাস তিনি যে দোষাবহ মনে করতেন, 'পুনশ্চ', 'শ্যামলী', 'শেষ সপ্তকে'ই তার পরিচয় মেলে। যে-গদ্যে এ-সব বইয়ের কবিতা লেখা, সে-গদ্যই 'শেষের কবিতা'র, 'কালের যাত্রা'র, 'বিশ্বপরিচয়ে'র, তবু কবির নিজের জবানিতে প্রত্যক্ষ প্রমাণের যদি তলব পড়ে, সে-প্রমাণও হাজির আছে। 'কবিতা'র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত সতেরোটি কবিতার মধ্যে দশটি ছিলো গদ্যছন্দের। বোধহয় সেই কারণেই, পত্রিকাটি পেয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্পাদককে যে-চিঠি লিখেছিলেন, তাতে গদ্যকবিতা সম্বন্ধে অনেকটা মন্তব্য ছিলো। চিঠিখানা 'কবিতা'য় প্রকাশিত হয়েছিলো, তা থেকে খানিকটা উদ্ধৃত ক'রে দিই :

'অল্পদিন আগে পর্যন্ত দেখেছি বাংলায় গদ্যছন্দের কবিতা আপন স্বাভাবিক চালটি আয়ত্ত করতে পারেনি। কতকটা ছিল যেন বহুকাল খাঁচায় বন্দী পাখীর ওড়ার আড়ষ্ট চেষ্টা। গদ্যছন্দের রাজত্বে আপাতদৃষ্টিতে যে স্বাধীনতা আছে যথার্থভাবে তার মর্যাদারক্ষা কঠিন। বস্তুত সকল ক্ষেত্রেই স্বাধীনতার দায়িত্ব পালন দুরূহ। বাণীর নিপুণ-নিয়ন্ত্রিত ঝংকারে

যে মোহসৃষ্টি করে তার সহায়তা অস্বীকার করেও পাঠকের মনে কাব্যরস সঞ্চার করতে বিশেষ কলাবৈভবের প্রয়োজন লাগে। বস্তুত গদ্যে পদ্য-ছন্দের কারুশিল্পকৌশলের বেড়া নেই দেখে কলমকে অনায়াসে দৌড় করাবার সাহস অবারিত হবার আশঙ্কা আছে। কাব্যভারতীর অধিকারে সেই স্পর্ধা কখনোই পুরস্কৃত হ'তে পারে না। অনায়াসের আগাছায় ভরা জঙ্গলকে কাব্যকুঞ্জ বলে চালিয়ে দেয়া অসম্ভব। তোমরা ফাঁড়া এড়িয়ে গেছ। কেবল দেখলুম স্মৃতিশেখর উপাধ্যায়ের কবিতাটি পদ্যছন্দের মৌতাত একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। পূর্ব অভ্যাসের বাঁধন তার পায়ে জড়িয়ে আছে, গদ্যের জুতোজোড়ার উপরে ছিন্নপ্রায় ঘুণ্টিবিরল পদ্যনূপুরের উদ্বৃত্ত। ...প্রেমেন্দ্র মিত্রের "তামাসা" কবিতাটিতে পাহাড়তলির বন্ধুর ভূমির মতো গদ্যের রুক্ষ পৌরুষ লাগলো ভালো। তোমার কবিতা তিনটি গদ্যের কণ্ঠে তালমান ছেঁড়া লিরিক, এবং ভালো লিরিক। সঙ্গে সঙ্গে পদ্যছন্দের মৃদঙ্গওয়ালা বোল দিচ্ছে না বলে ভাবের ইঙ্গিতগুলি বিচ্ছুরিত হচ্ছে সহজে অথচ সহজে নয়।...সমর সেনের কবিতা কয়টিতে গদ্যের রূঢ়তার ভিতর দিয়ে কাব্যের লাবণ্য প্রকাশ পেয়েছে। সাহিত্যে এঁর লেখা টঁ্যাকসই হবে বলেই বোধ হচ্ছে।...'*

যে-গদ্যকবিতা 'পদ্যছন্দের মৌতাত একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারেনি' তার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন নেই, তিনি ভালো বলছেন সেই গদ্যছন্দকেই, যাতে 'সঙ্গে-সঙ্গে পদ্যছন্দের মৃদঙ্গওয়ালা বোল দিচ্ছে না।' রবীন্দ্রনাথের মনে গদ্যকবিতার যে-আদর্শ ছিলো, এই চিঠিতে তা স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত হয়েছে। সে-আদর্শ 'পদ্যগন্ধী' নয়, ঠিক তার উল্টো, 'বাণীর নিপুণ-নিয়ন্ত্রিত ঝংকারে যে-মোহসৃষ্টি করে, তার সহায়তা অস্বীকার' করতে হবে, গদ্যছন্দ সম্বন্ধে এইটেই রবীন্দ্রনাথের প্রধান বক্তব্য, আর এ-কথা তিনি বিভিন্ন প্রবন্ধেও বিশদভাবে বলেছেন। 'কিঞ্চিৎ ছন্দের আভাস', প্রবোধবাবু যেটা গদ্যকবিতার লক্ষণ ব'লে ধরেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাকে বলেছেন

* 'কবিতা', পৌষ ১৩৪২ ও আশ্বিন ১৩৪৯।

'বহুকাল খাঁচায় বন্দী পাখীর ওড়ার আড়ষ্ট চেষ্টা।' অবশ্য 'পদ্যগন্ধী' গদ্য-কবিতা যে হ'তে না পারে তা নয়, হয়েওছে, বাংলায় সমর সেন আর অমিয় চক্রবর্তীর রচনা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বস্তুত, বাংলা গদ্যকবিতার দুটো আলাদা ধারাই যেন দেখা যাচ্ছে: একটা রাবীন্দ্রিক রীতি, সেটা বিশুদ্ধ গদ্যের চালে, আর-একটাতে মাঝে-মাঝে পদ্যের আওয়াজ দেয়;—এই দ্বিতীয় রীতি থেকে বাংলায় ফ্রী ভর্সের উদ্ভব হবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

ফ্রী ভর্স সম্বন্ধে প্রবোধচন্দ্র কোনো আলোচনাই করেননি, কিন্তু গ্রন্থের পরিশিষ্টে কবির সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের যে-বিবৃতি দিয়েছেন তাতে একটি খবর পাওয়া গেলো যা লক্ষ্য না-ক'রে পারলুম না। একজন ফরাশি অধ্যাপক কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনি বাংলায় ফ্রী ভর্স রচনা করেছেন কি?' কবি উত্তরে বললেন, 'আমি অনেক ফ্রী ভর্স রচনা করেছি।' এখানে রবীন্দ্রনাথ 'ফ্রী ভর্স' বলতে কী বুঝেছেন জানি না, হয়তো 'বলাকা' 'পলাতকা'র ছন্দ, হয়তো 'পুনশ্চ' এবং তৎপরবর্তী গদ্যকবিতার গ্রন্থ; কিন্তু এ-কথা নির্ভয়ে বলা যায় যে কোনো ইংরেজ বা ফরাশির কাছে ফ্রী ভর্সের যা অর্থ, তা রবীন্দ্রনাথ রচনা করেননি। ওদের ফ্রী ভর্স প্রবোধচন্দ্রের মুক্তক নয়, গদ্যছন্দও নয়; ওদের ফ্রী ভর্স হ'লো মিশ্রছন্দ, যাতে একই কবিতায় একাধিক রকম ছন্দ স্থান পায়, কিংবা গদ্য-পদ্য মেশানো থাকে। ছন্দ ব্যবহারের কি অব্যবহারের স্বাধীনতা আছে ব'লেই এর নাম ফ্রী ভর্স, বাংলায় এর অন্য-কোনো সংজ্ঞা দিতে গেলে শুধু অস্পষ্টতার ক্ষেত্র বাড়ানো হবে, তাছাড়া কিছু লাভ হবে না। আর এই আদর্শে বিচার করলে সমগ্র রবীন্দ্র-রচনাবলীর মধ্যে শুধু তিনটি নৃত্যনাট্যেই মিশ্র ছন্দের কিছু আভাস এসেছে মনে করা যায়, তাও আভাস মাত্র, কারণ এ-তিনটি বই আগাগোড়া সুরে বসানো ব'লে এদের ছন্দোবন্ধ প্রায়ই ভাঙা-ভাঙা হ'তে বাধা পায়নি, গদ্য রীতিও সর্বত্র সুঠাম নয়, ছাপার অক্ষরে পড়তে মনে হয় যেন গদ্য-পদ্য মিশ্রিত না-হ'য়ে সমস্ত রচনাটাই গদ্য-পদ্যের মাঝামাঝি একটা জায়গায় বিরাজমান। প্রকৃত মিশ্র ছন্দের চেহারাটা বাংলায় কী রকম হ'তে পারে তার একটা নমুনা দৈবাৎ পেয়ে গেলুম রবীন্দ্রনাথেরই 'ছন্দ' বইতে। 'গদ্য ছন্দ' প্রবন্ধে একটা প্রাকৃত ছন্দের সঙ্গে মাত্রা মিলিয়ে তিনি লিখেছেন:

বৃষ্টিধারা শ্রাবণে ঝরে গগনে
শীতল পবন বহে সঘনে,
কনক বিজুরি নাচে রে, অশনি গর্জন করে,
নিষ্ঠুর অন্তর মম প্রিয়তম নাই ঘরে।

এখানে প্রত্যেক পংক্তি ছন্দে বাঁধা আছে, কিন্তু এক-এক পংক্তির এক-এক রকম ছন্দ। এ ছাড়া 'স্ফুলিঙ্গে' দুটি মিশ্র ছন্দের ক্ষুদ্র কবিতা আছে:

অপরাজিতা ফুটিল
লতিকার
গর্ব নাহি ধরে—
যেন পেয়েছে লিপিকা
আকাশের
আপন অক্ষরে।

এখানে প্রথম ও চতুর্থ পংক্তি তিন মাত্রার ছন্দে, অবশিষ্ট পয়ারজাতীয়, প্রবোধচন্দ্রের পরিভাষায় মাত্রাবৃত্ত ও যৌগিক। ৮৩ সংখ্যক কবিতায় মেশানো হয়েছে ছড়ার ছন্দ আর তিন মাত্রার ছন্দ কিংবা স্বরবৃত্ত আর মাত্রাবৃত্ত।

দিনের আলো নামে যখন
ছায়ার অতলে
আমি আসি ঘট ভরিবার ছলে
একলা দিঘির জলে।

এখানে প্রথম চরণ স্বরবৃত্ত, দ্বিতীয় চরণ মাত্রাবৃত্ত। সমস্ত কবিতাটিতে স্বরবৃত্তেরই প্রাধান্য, কিন্তু শেষের দিকে আবার মাত্রাবৃত্ত এসেছে:

মোর জীবনের ব্যর্থ দীপের
অগ্নিরেখার বাণী
ঐ যে ছায়াখানি।

এরই মধ্যে আবার একটু বিভঙ্গ আছে—'মোর জীবনের ব্যর্থ দীপের অগ্নিরেখার বাণী' মাত্রাবৃত্ত, 'ঐ যে ছায়াখানি' স্বরবৃত্ত। আশ্চর্য এই যে উভয় ক্ষেত্রেই দুই ছন্দ চমৎকার মিলে-মিশে আছে, বাধা নেই, বিরোধ নেই, বরং দুয়ের সংযোগে একটি অভিনব মাধুর্যেরই আভাস দিচ্ছে।* তার উল্লেখ গ্রন্থের অন্যত্র করেছি। তাছাড়া গানে কখনো-কখনো একই রচনায় দু-রকম ছন্দের আভাস এসেছে—তবে তাকে মিশ্র ছন্দ ব'লে কেউ ভুল করবে না—সুরের তাগিদে কাব্যছন্দ ভাঙা-ভাঙা হয়েছে এলোমেলো হয়েছে, ব্যাপারটা হ'লো এই। 'স্ফুলিঙ্গে'র উদাহরণ দুটি অবশ্য সচেতনভাবে রচিত, কিন্তু এই ক্ষীণ সূত্রে নির্ভর ক'রে এ-কথা বলা যায় না যে রবীন্দ্রনাথ যথোচিতভাবে মিশ্র ছন্দ লিখেছেন। একই কবিতায় দু-তিন রকমের ছন্দ বা গদ্যছন্দের সঙ্গে পদ্যছন্দকে মেশাবার পরীক্ষা আমাদের কোনো-কোনো জীবিত কবি করেছেন, কিন্তু বাংলায় মিশ্র ছন্দের স্পষ্ট কোনো স্বরূপ এখনো বিকশিত হয়েছে ব'লে মনে করা যায় না।

১৯৪৬

* শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' বইয়ে দেখিয়েছেন যে 'বৈঠিক পথের পথিক' কবিতার শেষ স্তবকে ছন্দের জাত বদলে গেছে—স্বরবৃত্ত রূপান্তরিত হয়েছে মাত্রাবৃত্তে। কিন্তু এ-কথা মনে করা যায় না যে ওখানে রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছে ক'রে ছন্দ বদলে দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক

স্বভাবকবি কথাটা প্রথম বোধহয় উচ্চারিত হয় গোবিন্দচন্দ্র দাসকে উপলক্ষ্য ক'রে। কে বলেছিলেন জানিনা, কিন্তু কোনো এক বোদ্ধা ব্যক্তিই বলেছিলেন, কেননা গোবিন্দচন্দ্রকে এই আখ্যা নির্ভুল মানিয়েছিলো, তাছাড়া এতে কবিদের মধ্যে যে-শ্রেণীবিভাগের অনুক্ত উল্লেখ আছে সেটাকেও অর্থহীন বলা যায় না। 'নীরব কবি'র অস্তিত্ব উড়িয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভালো করেছিলেন, তাতে মূক-মিল্টনী কুসংস্কারের উচ্ছেদ হ'লো, কিন্তু 'স্বভাবকবি' কথাটা যে টি'কে গেলো তার রীতিমতো একটা কারণ আছে। অবশ্য সাধারণ অর্থে কবিমাত্রেই স্বভাবকবি, যেহেতু কোনো-রকম শিল্পরচনাই সহজাত শক্তি ছাড়া সম্ভব হয় না, কিন্তু বিশেষ অর্থে অনেকে তার ব্যতিক্রম—বা বিপরীত—যদিও সেই উল্টো লক্ষণের এ-রকম কোনো সহজ সংজ্ঞা তৈরি হয়নি। এই অর্থে 'স্বভাবকবি' বলতে শুধু এটুকু বোঝায় না যে ইনি স্বভাবতই কবি—সে-কথা তো না-বললেও চলে; বোঝায় সেই কবিকে, যিনি একান্তই হৃদয়নির্ভর, প্রেরণায় বিশ্বাসী, অর্থাৎ যিনি যখন যেমন প্রাণ চায় লিখে যান কিন্তু কখনোই লেখার বিষয়ে চিন্তা করেন না, যাঁর মনের সংসারে হৃদয়ের সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির সতিনসম্বন্ধ। এ-কথা সত্য যে কবিতায় আবেগের তাপ না-থাকলে কিছুই থাকলো না, কিন্তু সেই আবেগটিকে পাঠকের মনে পৌঁছিয়ে দিতে হ'লে তার দাস হ'লে চলে না, তাকে ছাড়িয়ে গিয়ে শাসন করতে হয়। এই শাসন করার, নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি যেখানে নেই, সেখানেই এই বিশেষ অর্থে 'স্বভাবকবিত্ব' আরোপ করতে পারি। এই লক্ষণ কবিদের মধ্যে বর্তায় কখনো বা ব্যক্তিগত কারণে আর কখনো বা ঐতিহাসিক কারণে; কেউ-কেউ স্বভাবতই স্বভাবকবি, আবার কোনো-কোনো সময়ে সাহিত্যের অবস্থার ফলেই স্বভাবকবি তৈরি হ'য়ে থাকে। গোবিন্দচন্দ্র দাসকে বলা যায় স্বভাবতই স্বভাবকবি, একেবারে খাঁটি অর্থে তা-ই; কেননা, হার্দ্যরসের প্রাচুর্য সত্ত্বেও, অসংযমজনিত পতনের তিনি উল্লেখ্য উদাহরণ, উপরন্তু তাঁর রচনায় এই অদ্ভুত ঘোষণা পাই যে রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক হ'য়েও রবীন্দ্রনাথের

. অস্তিত্বসুদ্ধ তিনি অনুভব করেননি। অথচ এ-কথাও নিশ্চিত বলা যায় না যে তিনি রাবীন্দ্রিক দীক্ষা পেলেই তাঁর ফাঁড়া কেটে যেতো, কেননা ঐ দীক্ষার ফলেও দুর্ঘটনা ঘটেছে, দেখা দিয়েছেন বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্বভাবকবিরা: রবিরাজত্বের প্রথম পর্বে, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত থেকে নজরুল ইসলাম পর্যন্ত, তাঁদের সংখ্যা বড়ো কম না।

এ-কথা বললে কি ভুল হয় যে বিশ শতকের আরম্ভকালে যাঁরা বাংলার কবিকিশোর ছিলেন, স্বভাবকবিত্ব তাঁদের পক্ষে ঐতিহাসিক ছিলো, বলতে গেলে বিধিলিপি? কেন? অবশ্য রবীন্দ্রনাথেরই জন্য। রবীন্দ্রনাথের মধ্যাহ্ন তখন, তাঁর প্রতিভা প্রখর হ'য়ে উঠছে দিনে-দিনে, আর, যদিও সেই আলোকে কালো ব'লে প্রমাণ করার জন্য দেশের মধ্যে অধ্যবসায়ের অভাব ছিলো না, তবু তরুণ কবিরা অদম্য বেগে রবিচুম্বকে সংলগ্ন হয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তেমন কবি নন, যাঁকে বেশ আরামে ব'সে ভোগ করা যায়, তাঁর প্রভাব উপদ্রবের মতো, তাতে শান্তিভঙ্গ ঘটে, খেই হারিয়ে ভেসে যাবার আশঙ্কা তার পদে-পদে। তিনি যে একজন খুব বড়ো কবি তা আমরা অনেক আগেই জেনে গিয়েছি, কিন্তু যে-কথা আজও আমরা ভালো ক'রে জানি না—কিংবা বুঝি না—সে-কথা এই যে বাংলাদেশের পক্ষে বড্ড বেশি বড়ো তিনি, আমাদের মনের মাপজোকের মধ্যে কুলোয় না তাঁকে, আমাদের সহ্যশক্তির সীমা তিনি ছাড়িয়ে যান। তবু আজকের দিনে তাঁর সম্মুখীন হবার সাহস পাওয়া যায়, কেননা ইতিমধ্যে বাংলা সাহিত্যে আরো কিছু ঘ'টে গেছে—কিন্তু বিশ শতকের প্রথম দশকে—দ্বিতীয় দশকেও—কী অবস্থা ছিলো? অপরিসর, ক্ষীণপ্রাণ বাংলা সাহিত্য—তার মধ্যে এই বহ্নিবীজ, আগ্নেয় সত্তা: এ কি সহ্য করা যায়? না;—দাশরথি রায়ের নেহাৎ চাতুরী, রামপ্রসাদের কড়া পাকের ভক্তি, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ফিটফাট সাংবাদিকতা, এমনকি মধুসূদনের তূর্যধ্বনি—আগে যখন এর বেশি আর-কিছু নেই, তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবির্ভাবে বিস্মিত, মুগ্ধ, বিচলিত, বিব্রত, ক্রুদ্ধ এবং অভিভূত হওয়া সহজ ছিলো, কিন্তু সহজ ছিলো না তাঁকে সহ্য করা, এমনকি—সেই প্রথম সংঘাতের সময়—গ্রহণ করাও সম্ভব ছিলো না। এর প্রমাণ দু-দিক থেকেই পাওয়া যায়: সমালোচনার

মহলে নিন্দার অবিরাম উত্তেজনায়, আর কাব্যের ক্ষেত্রে উত্তরপুরুষের প্রতি-রোধহীন আত্মবিলোপে। উপরন্তু অন্য প্রমাণও মেলে, যদি পাঠকমণ্ডলীর মতিগতি লক্ষ্য করি। রবীন্দ্রনাথের পাঠকসংখ্যা আজ পর্যন্ত অল্প—তাঁর খ্যাতির তুলনায়, তাঁর বিচিত্র বিপুল পরিমাণের তুলনায় অল্প : আর যাঁরা বাংলা-দেশের পাঠকসাধারণ, বড়ো অর্থে পাব্লিক, তারা কিছুদিন আগে পর্যন্তও রবীন্দ্রনাথের স্বাদ নিয়েছে—রবীন্দ্রনাথে না, তাঁরই দৃষ্ট তরলিত, আরামদায়ক সংস্করণে : গদ্যে শরৎচন্দ্রে, আর পদ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তে।

বাঙালি কবির পক্ষে, বিশ শতকের প্রথম দুই দশক বড়ো সংকটের সময় গেছে। এই অধ্যায়ের কবিরা—যতীন্দ্রমোহন, করুণানিধান, কিরণধন, এবং আরো অনেকে, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যাঁদের কুলপ্রদীপ, যাঁরা রবীন্দ্রনাথের মধ্যবয়সে উদ্গত হ'য়ে নজরুল ইসলামের উত্থানের পরে ক্ষয়িত হলেন—তাঁদের রচনা যে এমন সমতলরকম সদৃশ, এমন আশুক্লান্ত, পাণ্ডুর, মৃদুল, কবিতে-কবিতে ভেদচিহ্ন যে এত অস্পষ্ট, একমাত্র সত্যেন্দ্র দত্ত ছাড়া কাউকেই যে আলাদা ক'রে চেনা যায় না—আর সত্যেন্দ্র দত্তও শেষ পর্যন্ত শুধু 'ছন্দোরাজ'ই হ'য়ে থাকলেন—এর কারণ, আমি বলতে চাই, শুধুই ব্যক্তিগত নয়, বহুলাংশে ঐতিহাসিক। এ-সব লক্ষণ থেকে সংগত মীমাংসা, এই কবিদের শক্তির দীনতা নয়, কেননা বিচ্ছিন্নভাবে ভালো কবিতা অনেকেই এঁরা লিখেছেন—সে-মীমাংসা এই যে তাঁরা সকলেই এক অনতিক্রম্য, অসহ্য দেশের অধিবাসী—কিংবা পরবাসী। অর্থাৎ তাঁদের পক্ষে অনিবার্য ছিলো রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ, এবং অসম্ভব ছিলো রবীন্দ্র-নাথের অনুকরণ। রবীন্দ্রনাথের অনতি-উত্তর তাঁরা, বড্ড বেশি কাছাকাছি ছিলেন; এ-কথা তাঁরা ভাবতে পারেননি যে গুরুদেবের কাব্যকলা মারাত্মকরূপে প্রতারক, সেই মোহিনী মায়ার প্রকৃতি না-বুঝে শুধু বাঁশি শুনে ঘর ছাড়লে ডুবতে হবে চোরাবালিতে। যাঁদের কৈশোরে যৌবনে প্রকাশিত হয়েছে 'সোনার তরী'র পর 'চিত্রা', 'চিত্রা'র পর 'কথা ও কাহিনী'; আর তার পরে 'কল্পনা', 'ক্ষণিকা', 'গীতাঞ্জলি'—সেই মায়ায় না-ম'জে কোনো উপায় ছিলো না তাঁদের;—সুর শুনে যে-ঘুম ভাঙবে সেই ঘুমই তাঁদের রমণীয় হ'লো; স্বপ্নের তৃপ্তিতে বিলীন হ'লো আত্ম-

চেতনা; জন্ম নিলো এই মনোরম মতিভ্রম যে রিনিঠিনি ছন্দ বাজালেই রাবীন্দ্রিক স্পন্দন জাগে, আর জলের মতো তরল হ'লেই স্রোতস্বিনীর গতি পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের ব্রত নিলেন তাঁরা, কিন্তু তাঁকে ধ্যান করলেন না, অনুষ্ঠানের ঐকান্তিকতায় স্বরূপচিন্তার সময় পেলেন না; তাঁদের কাছে এ-কথাটি ধরা পড়লো না যে রবীন্দ্রনাথের যে-গুণে তাঁরা মুগ্ধ, সেই সরলতা প্রকৃতপক্ষেই জলধর্মী, অর্থাৎ তিনি সরল শুধু উপর-স্তরে, শুধু আপতিক-রূপে, কিন্তু গভীর দেশে অনিশ্চিত কুটিল; স্রোতে, প্রতিস্রোতে, আবর্তে নিত্যমথিত; আরো গভীরে ঝড়ের জন্মস্থল, আর হয়তো—এমনকি—খরদন্ত মকর-নক্রের দুঃস্বপ্ন-নীড়। যে-আশ্রয়ে তাঁরা স্থিত হলেন, সেই মহাকবির জঙ্গমতা তাঁরা লক্ষ্য করলেন না, যাত্রার মন্ত্র নিলেন না তাঁর কাছে, তাঁকে ঘিরেই ঘুরতে লাগলেন, তাঁরই মধ্যে নোঙর ফেলে নিশ্চিন্ত হলেন। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ করতে গিয়ে তাঁরা ঠিক তা-ই করলেন যা রবীন্দ্রনাথ কোনোকালেই করেননি। এই ভুলের জন্য—ভুল বোঝার জন্য—তাঁদের লেখায় দেখা দিলো সেই ফেনিলতা, সেই অসহায়, অসংবৃত উচ্ছ্বাস, যা 'স্বভাবকবি'র কুললক্ষণ;—শৈথিল্যকে স্বতঃস্ফূর্তি ব'লে, আর তন্দ্রালুতাকে তন্ময়তা ব'লে ভুল করলেন তাঁরা;—আর ইতিহাসে শ্রদ্ধেয় হ'লেন এই কারণে যে রবিতাপে আত্মাহুতি দিয়ে তাঁরা পরবর্তীদের সতর্ক ক'রে গেছেন।

২

আবার বলি, এ রকম না-হ'য়ে উপায় ছিলো না সে-সময়ে, অন্তত কবিতার ক্ষেত্রে ছিলো না। এ-কথাটা বাড়াবাড়ির মতো শোনাতে পারে, কিন্তু রবিপ্রতিভার বিস্তার, আর তার প্রকৃতির বিষয়ে চিন্তা করলে এ-বিষয়ে প্রত্যয় জন্মে। আমাদের পরম ভাগ্যে রবীন্দ্রনাথকে আমরা পেয়েছি, কিন্তু এই মহাকবিকে পাবার জন্য কিছু মূল্যও দিতে হয়েছে আমাদের—দিতে হচ্ছে। সে-মূল্য এই যে বাংলা ভাষায় কবিতা লেখার কাজটি তিনি অনেক বেশি কঠিন ক'রে দিয়েছেন। একজনের বেশি রবীন্দ্রনাথ সম্ভব

নয় ; তাঁর পরে কবিতা লিখতে হ'লে এমন কাজ বেছে নিতে হবে যে-কাজ তিনি করেননি ; তুলনায় তা ক্ষুদ্র হ'লে—ক্ষুদ্র হবারই সম্ভাবনা—তা-ই নিয়েই তৃপ্ত থাকা চাই। আর এইখানেই উল্টো বুঝেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর সম্প্রদায়। তাঁদের কাছে, রবীন্দ্রনাথের পরে, কবিতা লেখা কঠিন হওয়া দূরে থাক, সীমাহীনরূপে সহজ হ'য়ে গেলো ; ছন্দ, মিল, ভাষা, উপমা, বিচিত্ররকমের স্তবক-বিন্যাসের নমুনা—সব তৈরি আছে, আর-কিছু ভাবতে হবে না, অন্য কোনো দিকে তাকাতে হবে না, এই রকম একটা পৃষ্ঠপোষিত মোলায়েম মনোভাব নিয়ে তাঁদের কবিতা লেখার আরম্ভ এবং শেষ। রবীন্দ্রনাথ যা করেননি, তাঁদের কাছে করবারই যোগ্য ছিলো না সেটা—কিংবা তেমন কিছুর অস্তিত্বই ছিলো না ; রবীন্দ্রনাথ যা করেছেন, ক'রে যাচ্ছেন, তাঁরাও ঠিক তা-ই করবেন, এত বড়োই উচ্চাশা ছিলো তাঁদের। আর এই অসম্ভবের অনুসরণে তাঁরা যে এক পা এগিয়ে তিন পা পিছনে হ'ঠে যাননি, তারও একটি বিশেষ কারণ রবীন্দ্রনাথেই নিহিত আছে। রবীন্দ্রনাথে কোনো বাধা নেই—আর এই-খানেই তিনি সবচেয়ে প্রতারক—তিনি সব সময় দু-হাত বাড়িয়ে কাছে টানেন, কখনো বলেননা 'সাবধান! তফাৎ যাও!' পরবর্তীদের দুর্ভাগ্যবশত, তাঁর মধ্যে এমন কোনো লক্ষণ নেই, যাতে ভক্তির সঙ্গে সুবুদ্ধি-জাগানো ভয়ের ভাবও জাগতে পারে। দান্তের মতো, গ্যেটের মতো, স্বর্গ-মর্ত্য-নরক ব্যাপী বিরাট কোনো পরিকল্পনা নেই তাঁর মধ্যে, নেই শেক্সপিয়রের মতো অমর চরিত্রের চিত্রশালা, এমনকি মিল্টনের মতো বাক্যবন্ধের ব্যূহরচনাও নেই। তাঁকে পাঠ করার অভিজ্ঞতাটি একেবারেই নিষ্কণ্টক—আমাদের সঙ্গে তাঁর মিলনে যেন মৃণালসূত্রেরও ব্যবধান নেই ; কোনোখানেই তিনি দুর্গম নন, নিগূঢ় নন—অন্তত বাইরে থেকে দেখলে তা-ই মনে হয় : একবারও তিনি অভিধান পাড়তে ছোটান না আমাদের, চিন্তার চাপে ক্লান্ত করেন না, অর্থ খুঁজতে খাটিয়ে নেন না কখনো। আর তাঁর বিষয়বস্তু—তাও বিরল নয়, দুষ্প্রাপ্য নয়, কোনো বিস্ময়কর বহুলতাও নেই তাতে ; এই বাংলা দেশের প্রকৃতির মধ্যে চোখ মেলে, দু-চোখ ভ'রে যা তিনি দেখেছেন তা-ই তিনি লিখেছেন, আবহমান ইতিহাস-ভূগোল লুঠ করেননি,

পারাপার করেননি বৈতরণী অলকনন্দা। এইজন্য তাঁর অনুকরণ যেমন দুঃসাধ্য, তার প্রলোভনও তেমনি দুর্দমনীয়। 'মনে হচ্ছে আমিও অমন লিখতে পারি ঝুড়ি-ঝুড়ি', এই সর্বনাশী ধারণাটিকে সব দিক থেকেই প্রশ্রয় দেয় তাঁর রচনা, যাতে আপাতদৃষ্টিতে পাণ্ডিত্যের কোনো প্রয়োজন নেই, যেন কোনো প্রস্তুতিরও না—এতই সহজে তা ব'য়ে চলে, হ'য়ে যায়—মনে হয় যেন 'ও-রকম' লেখা ইচ্ছে করলেই লেখা যায়—একটুখানি 'ভাব' আসার শুধু অপেক্ষা। অন্ততপক্ষে আলোচ্য কবিরা এই মোহেই মজেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের 'মতো' হ'তে গিয়ে রবীন্দ্রনাথেই হারিয়ে গেলেন তাঁরা—কি বড়ো জোর তাঁর ছেলেমানুষি সংস্করণ লিখলেন।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিজেই নিজেকে ব্যক্ত করে, অন্য কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হয় না; এই নির্ভারতা, এই স্বচ্ছতার জন্য, পরবর্তীর পক্ষে বিপজ্জনক উদাহরণ তিনি। যেহেতু তাঁর লেখায় পাঠকের কোনো পরিশ্রম নেই, তাই এমন ভুলও হ'তে পারে যে চোখ ফেললেই সবটুকু তাঁর দেখে নেয়া যায়; যেহেতু তাঁর বিষয়ের মধ্যে দৃশ্যমান ব্যাপ্তি নেই, তাই এমনও ভুল হ'তে পারে যে ক্ষুদ্রতর কবিদের পক্ষে তাঁর পথই প্রশস্ত। 'আমরা যাকে বলি ছেলেমানুষি, কাব্যের বিষয় হিসাবে সেটা অতি উত্তম, রচনার রীতি হিসাবেই সেটা উপেক্ষার যোগ্য'—রবীন্দ্রনাথের এই বাক্যটিতে তাঁর নিজের এবং অন্য কবিদের বিষয়ে অনেক কথাই বলা আছে। কথাটা তিনি বলেছিলেন, 'রচনাবলী'র প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় তাঁর 'মানসী'-পূর্ব কবিতাবলীকে লক্ষ্য ক'রে, যে-সব কবিতার দুষ্যতা তিনি দেখেছিলেন, উপাদানের অভাবে নয়, রূপায়ণের অসম্পূর্ণতায়। উপাদান বা বিষয়বস্তুর দিক থেকে দেখলে তাঁর পরিণত কালের অনেক কবিতাই 'সন্ধ্যাসংগীত'-'প্রভাতসংগীতের' সধর্মী, এমনকি সমগ্রভাবে তাঁর কাব্যই তা-ই; তাঁর কাব্যের কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে এই 'ছেলেমানুষি', যাকে তিনি বিষয় হিসেবে 'অতি উত্তম' আখ্যা দিয়েছেন। এই 'ছেলেমানুষি'র মানে হ'লো, তাঁর কবিতা বাইরে থেকে সংগ্রহ করা নানা রকম পদার্থের সন্নিপাত নয়, ভিতর থেকে আপনি হ'য়ে-ওঠা, যেন ঠিক মনের কথাটির অবারিত উচ্চারণ। চারদিকের প্রত্যক্ষ এই পৃথিবী

দিনে-দিনে যেমন ক'রে দেখা দিয়েছে তাঁর চোখের সামনে, নাড়া দিয়েছে তাঁর মনের মধ্যে, তাই তিনি অফুরন্ত বার বলেছেন ; প্রতিদিনের সুখ-দুঃখের সাড়া, মুহূর্তের বৃন্তের উপর ফুটে-ওঠা পলাতক এক-একটি রঙিন বেদনা—তাই ধ'রে রেখেছেন তাঁর কবিতায়, আর কবিতার চেয়েও বেশি তাঁর গানে। এইজন্য তাঁর কবিতা এমন দেহহীন, বিশ্লেষণবিমুখ ; তার 'সারাংশ' বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তাকে দেখানো যায় না ভাঁজে-ভাঁজে খুলে ; যেটা কবিতা, আর যেটা পাঠকের মনে তার অভিজ্ঞতা, ও-দুয়ে কোনো তফাৎই তাতে নেই যেন ; তা আমাদের মনের উপর যা কাজ করবার ক'রে যায়, কিন্তু কেমন ক'রে তা করে আমরা ভেবে পাই না, সমালোচনার কলকব্জা দিয়েও ধরতে পারি না সেই রহস্যটুকু ;—শেষ পর্যন্ত হার মেনে বলতে হয় তা যে হ'তে পেরেছে তা-ই যথেষ্ট, তা ভালো হয়েছে তার অস্তিত্বেরই জন্য—আর-কোনোই কারণ নেই তার।

এই রকম কবিতা জীবনের পক্ষে সম্পদ, কিন্তু তার আদর্শ অনবরত চোখের সামনে থাকলে অন্য কবিরা বিপদে পড়েন। বিপদটা কোথায় তা বুঝিয়ে বলি। সব মানুষেরই অনুভূতি আছে, ব্যক্তিগত সুখদুঃখ আছে ; যখন দেখা যায় যে তারই প্রকাশ আশ্চর্যভাবে কবিতা হ'য়ে উঠছে আর সেই প্রকাশটাও 'নিতান্তই সোজাসুজি', তার পিছনে কোনো আয়োজন আছে ব'লে মনেই হয় না, তখন যে-কোনো রকম অনুভূতির কাছেই আত্মসমর্পণের লোভ জাগে অন্য কবিদের, কিংবা—খাঁটি বস্তুটির অভাবে—নিজেরাই তাঁরা নিজের মন উশকে তোলেন। আর তার ফল কী-রকম দাঁড়ায় তারই শিক্ষাপ্রদ উদাহরণ পাই—সত্যেন্দ্রনাথ দত্তে। অনেকের মধ্যে তাঁকে বেছে নিলুম সুস্পষ্ট কারণে ; সমসাময়িক, কাছাকাছি বয়সের কবিদের মধ্যে রচনাশক্তিতে শ্রেষ্ঠ তিনি, সর্বতোভাবে যুগপ্রতিভূ, এবং রবীন্দ্রনাথের পাশে রেখে দেখলেও তাঁকে চেনা যায়। হ্যাঁ, চেনা যায়, আলাদা একটা চেহারা ধরা পড়ে, কিন্তু সেই চেহারাটা কী-রকম তা ভাবলেই আমরা বুঝতে পারবো কেন, রবীন্দ্রনাথ পড়া থাকলে, আজকের দিনে সত্যেন্দ্রনাথে আর প্রয়োজন হয় না। তফাৎটা জাতের নয় তা বলাই বাহুল্য ; একই আন্দোলনের অন্তর্গত জ্যেষ্ঠ এবং অনুজ কবির ব্যক্তি-

বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্যও নয় এটা ; আবার বড়ো কবি ছোটো কবির তফাৎ বলতে ঠিক যা বোঝায় তাও একে বলা যায় না। ইনি ছোটো কবি না বড়ো কবি, কিংবা কত বড়ো কবি—সমালোচনার কোনো-এক প্রসঙ্গে এ-সব প্রশ্ন অবান্তর ; ইনি খাঁটি কবি কিনা সেইটেই হ'লো আসল কথা। সত্যেন্দ্রনাথে এই খাঁটিত্বটাই পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের বিরাট মহাজনি কারবারের পর খুচরো দোকানদার হওয়াতে লজ্জার কিছু নেই—সেটাকে তো অনিবার্য বলা যায়, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের মালপত্রও আপাতদৃষ্টিতে এক ব'লে বাংলা কাব্যে তাঁর আসন এমন সংশয়াচ্ছন্ন। তিনি ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্রনাথেরই সাজ-সরঞ্জাম—সেই ঋতুরঙ্গ, পল্লীচিত্র, দেশপ্রেম, কিন্তু ফুল, পাখি, চাঁদ, মেঘ, শিশির, এই রকম প্রত্যেকটি শব্দের পিছনে বা বস্তুর পিছনে রবীন্দ্রনাথে যে-আবেগের চাপ পাই, যে-বিশ্বাসের উত্তাপ, যার জন্য 'যূথীবনের দীর্ঘশ্বাসে'র শততম পুনরুক্তিও আমাদের মনে নতুন ক'রে জাগিয়ে তোলে স্বর্গের জন্য বিরহবেদনা, সেই প্রাণবন্ত প্রবলতার স্পর্শমাত্র সত্যেন্দ্রনাথে পাই না, তাঁর কবিতা প'ড়ে অনেক সময়ই আমাদের সন্দেহ হয় যে তাঁর 'অনুভূতি'টাই কৃত্রিম, কবিতা লেখারই জন্য ফেনিয়ে তোলা। যে-স্বপ্ন রবীন্দ্রনাথে দিব্যদৃষ্টি, কিংবা স্বপ্ন মানেই স্বপ্নভঙ্গ, সত্যেন্দ্রনাথে তা পর্যবসিত হ'লো দিবাস্বপ্নে, যে-ফুল ছিলো বিশ্বসত্তার প্রতীক, তা হ'য়ে উঠলো শৌখিন খেলেনা, ভাবুকতা হ'লো ভাবালুতা, সাধনা হ'লো ব্যসন, আর মানসসুন্দরীর পরিণাম হ'লো লাল পরি নীল পরির আমোদ-প্রমোদে। সেই সঙ্গে রীতির দিক থেকেও ভাঙন ধরলো ; রবীন্দ্রনাথের ছন্দের যে-মধুরতা, যে-মদিরতা, তার অন্তর্লীন শিক্ষা, সংযম, রুচি, সমস্ত উড়িয়ে দিয়ে যে-ধরনের লেখার প্রবর্তন হ'লো তাতে থাকলো শুধু মিহি সুর, ঠুনকো আওয়াজ, আর এমন একরকম চঞ্চল কিংবা চটপটে তাল, যা কবিতার অ-পেশাদার পাঠকের কানেও তক্ষুনি গিয়ে পৌঁছয়। এইজন্যই সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর সময়ে এত জনপ্রিয় হয়েছিলেন ; রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে তিনি ঠিক সেই পরিমাণে ভেজাল ক'রে নিয়েছিলেন, যাতে তা সর্বসাধারণের উপভোগ্য হ'তে পারে। তখনকার সাধারণ পাঠক রবীন্দ্রনাথে যা পেয়েছিলো, বা রবীন্দ্রনাথকে যেমন ক'রে চেয়েছিলো, তারই প্রতিমূর্তি

সত্যেন্দ্রনাথ। শুধু কর্ণসংযোগ ছাড়া আর-কিছুই তিনি দাবি করলেন না পাঠকের কাছে; তাই তাঁর হাতে কবিতা হ'য়ে উঠলো লেখা-লেখা খেলা বা ছন্দঘটিত ব্যায়াম। খেলা জিনিশটা সাহিত্যরচনায় অনুমোদনযোগ্য, যতক্ষণ তার পিছনে কোনো উদ্দেশ্য থাকে, সেটি না-থাকলে তা নেহাৎই ছেলেখেলা হ'য়ে পড়ে।* আর এই উদ্দেশ্যহীন কসরৎ, শুধু ছন্দের জন্যই ছন্দ লেখা, এই প্রকরণগত ছেলেমানুষি, কোনো-এক সময়ে ব্যাপক হ'য়ে দেখা দিয়েছিলো বাংলা কাব্যে; সত্যেন্দ্রনাথের খ্যাতির চরমে, যখন, এমনকি, তাঁর প্রভাব রবীন্দ্রনাথকেও ছাপিয়ে উঠেছিলো, সেই সময়ে যে-সব ভূরিপরিমাণ নির্দোষ, সুশ্রাব্য এবং অন্তঃসারশূন্য রচনা 'কবিতা' নাম ধ'রে বাংলা ভাষার মাসিকপত্রে বোঝাই হ'য়ে উঠেছিলো, কালের করুণাময় সম্মার্জনী ইতিমধ্যেই তাদের নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা, প্রথমে সত্যেন্দ্রনাথের, তারপর তাঁর শিষ্যদের হাতে সাত দফা পরিস্রুত হ'তে-হ'তে শেষ পর্যন্ত যখন ঝুমঝুমি কিংবা লজঞ্চুষের মতো

* এই উদ্দেশ্য মানে সুস্পষ্ট কোনো বিষয় নাও হ'তে পারে; অনেক সময় শুধু একটি অনুভূতি থেকেই লক্ষ্য পায় রচনা, পায় সার্থকতার পক্ষে প্রয়োজনীয় সংহতি। উদাহরণত তুলনা করা যাক সত্যেন্দ্রনাথের 'তুলতুল টুকটুক। টুকটুক তুলতুল। কোন ফুল তার তুল। তার তুল কোন ফুল। টুকটুক রঙ্গন। কিংশুক ফুল্ল। নয় নয় নিশ্চয়। নয় তার তুল্য', আর রবীন্দ্রনাথের 'ওগো বধূ সুন্দরী। তুমি মধু মঞ্জরী। পুলকিত চম্পার লহো অভিনন্দন। স্বর্ণের পাত্রে। ফাল্গুন রাত্রে। মুকুলিত মল্লিকা মাল্যের বন্ধন।' এ-দুটি একই ছন্দে লেখা, প্রায় একই রকম খেলাচ্ছলে রচিত, আর কোনোটিতেই স্পর্শসহ কোনো বক্তব্য নেই। কিন্তু কেন যে দ্বিতীয়টি ছন্দের আদর্শহিশেবেও অতুলনীয়রূপে বেশি ভালো হয়েছে তার কারণ শুধু অনুপ্রাস আর যুক্তবর্ণের বিতরণ দিয়েই বোঝানো যাবে না, তার কাব্যগুণের কথাটাই এখানে আসল। প্রথম উদাহরণটি অনুভব ক'রে লেখা হয়নি, নেহাৎই যান্ত্রিকভাবে বানানো হয়েছে, তাই ওর ছন্দটাও এমন কাঁচা, এমন বালকোচিত। 'ওগো বধূ সুন্দরী'তে প্রাণের যে-স্পর্শটুকু আছে, যার জন্য ওটি কবিতা হ'তে পেরেছে, তার ছন্দোনৈপুণ্যেরও মূল কারণটা সেখানেই খুঁজতে হবে। কথাটা এই যে ভালো কবি না-হ'লে ভালো ছন্দও লেখা যায় না; যিনি যত বড়ো কবি কলাকৌশলেও তত বড়োই অধিকার তাঁর; আর যিনি শুধু ছন্দ লেখেন, আর সেইজন্য 'ছন্দোরাজ' আখ্যা পেয়ে থাকেন, তাঁর কাছে—শেষ পর্যন্ত—ছন্দ বিষয়েও শেখবার কিছু থাকে না।

পদ্যরচনায় পতিত হ'লো, তখনই বোঝা গেলো যে ওদিকে আর পথ নেই—এবার ফিরতে হবে।

৩

সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর সম্প্রদায়ের নিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য নয়, আমি শুধু ঐতিহাসিক অবস্থাটি দেখাতে চাচ্ছি। তাঁদের সপক্ষে যা-কিছু বলবার আছে তা আমি জানি; প্রবন্ধের প্রথম অংশে পরোক্ষভাবে তা বলাও হয়েছে। সময়টা প্রতিকূল ছিলো তাঁদের, বড্ড বেশি অনুকূল ব'লেই প্রতিকূল ছিলো; রবিরশ্মিকে প্রতিফলিত করা—এছাড়া আর কবিকর্মের ধারণাই তখন ছিলো না। গদ্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অনতিপরেই দু-জন রবিভক্ত অথচ মৌলিক লেখকের সাক্ষাৎ পাই আমরা—প্রমথ চৌধুরী আর অবনীন্দ্রনাথ; কিন্তু কবিতায় রবীন্দ্রনাথের উত্থান এমনই সর্বগ্রাসী হয়েছিলো যে তার বিস্ময়জনিত মুগ্ধতা কাটিয়ে উঠতেই দু-তিন দশক কেটে গেলো বাংলা দেশের। এই মাঝখানকার সময়টাই সত্যেন্দ্র-গোষ্ঠীর সময়; রবীন্দ্রনাথের প্রথম এবং প্রচণ্ড ধাক্কাটা তাঁরা সামলে নিলেন—অর্থাৎ পরবর্তীদের সামলে নিতে সাহায্য করলেন; তাঁদের কাছে গভীরভাবে ঋণী আমরা। এই শেষের কথাটা শুধু বিচার ক'রে বলছি না, এ-বিষয়ে কথা বলার অভিজ্ঞতাপ্রসূত অধিকার আছে আমার। কৈশোরকালে আমিও জেনেছি রবীন্দ্রনাথের সম্মোহন, যা থেকে বেরোবার ইচ্ছেটাকেও অন্যায় মনে হ'তো—যেন রাজদ্রোহের শামিল; আর সত্যেন্দ্রনাথের তন্দ্রাভরা নেশা, তাঁর বেলোয়ারি আওয়াজের জাদু—তাও আমি জেনেছি। আর এই নিয়েই বছরের পর বছর কেটে গেলো বাংলা কবিতার; অন্য কিছু চাইলো না কেউ, অন্য কিছু সম্ভব ব'লেও ভাবতে পারলো না—যতদিন না 'বিদ্রোহী' কবিতার নিশেন উড়িয়ে হৈ-হৈ ক'রে নজরুল*

* অবশ্য একটি বিরুদ্ধ ভাবও দেশের মধ্যে একই সময়ে সক্রিয় ছিলো, কিন্তু তার সমস্তটাই সমালোচনার ক্ষেত্রে, আর সেই সমালোচনাও বুদ্ধিমান নয়, শুধু ছিদ্রান্বেষী।

ইসলাম এসে পৌঁছলেন। সেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের মায়াজাল ভাঙলো।

নজরুল ইসলামকেও ঐতিহাসিক অর্থে স্বভাবকবি বলেছি; সে-কথা নির্ভুল। পূর্বোক্ত প্রকরণগত ছেলেমানুষি তাঁর লেখার আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে; রবীন্দ্রনাথের আক্ষরিক প্রতিধ্বনি তাঁর 'বলাকা' ছন্দের প্রেমের কবিতায় যেমনভাবে পাওয়া যায়, তেমন কখনো সত্যেন্দ্রনাথে দেখি না; আর সত্যেন্দ্রনাথেরও নিদর্শন তাঁর রচনার মধ্যে প্রচুর। নজরুলের কবিতাও অসংযত, অসংবৃত, প্রগল্‌ভ; তাতে পরিণতির দিকে প্রবণতা নেই, আগাগোড়াই তিনি প্রতিভাবান বালকের মতো লিখে গেছেন, তাঁর নিজের মধ্যে কোনো বদল ঘটেনি কখনো, তাঁর কুড়ি বছর আর চল্লিশ বছরের লেখায় কোনোরকম প্রভেদ বোঝা যায় না। নজরুলের দোষগুলি সুস্পষ্ট, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সমস্ত দোষ ছাপিয়ে ওঠে; সব সত্ত্বেও এ-কথা সত্য যে রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথম মৌলিক কবি। সত্যেন্দ্রনাথ, শিল্পিতার দিক থেকে, অন্তত তাঁর সমকক্ষ, সত্যেন্দ্রনাথে বৈচিত্র্যও কিছু বেশি; কিন্তু এ-দু'জন কবিতে পার্থক্য এই যে সত্যেন্দ্রনাথকে মনে হয় রবীন্দ্রনাথেরই সংলগ্ন কিংবা অন্তর্গত, আর নজরুল ইসলামকে রবীন্দ্রনাথের পরে অন্য একজন কবি—ক্ষুদ্রতর নিশ্চয়ই, কিন্তু নতুন। এই যে নজরুল, রবিতাপের চরম সময়ে রাবীন্দ্রিক বন্ধন ছিঁড়ে বেরোলেন, বলতে গেলে অসাধ্যসাধন করলেন, এটাও খুব সহজেই ঘটেছিলো, এর পিছনে সাধনার কোনো ইতিহাস নেই, কতগুলো আকস্মিক কারণেই সম্ভব হয়েছিলো এটা। কবিতার যে-আদর্শ নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, নজরুলও তা-ই, কিন্তু নজরুল বৈশিষ্ট্য পেয়েছিলেন তাঁর জীবনের পটভূমিকার ভিন্নতায়। মুসলমান তিনি, ভিন্ন একটা ঐতিহ্যের মধ্যে জন্মেছিলেন, আবার সেই সঙ্গে হিন্দু মানসও আপন ক'রে

যেটা সাহিত্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিলো, সেটা রবীন্দ্রনাথের 'বিরুদ্ধে' যাওয়া নয়, রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত রূপ চিনিয়ে দেয়া। এইখানে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বা বিপিনচন্দ্র পাল কোনো সাহায্য করেননি ব'লেই বাংলা কবিতার ভাঙা-গড়ায় তাঁরা একটুও আঁচড় কাটতে পারলেন না।

নিয়েছিলেন—চেষ্টার দ্বারা নয়, স্বভাবতই। তাঁর বাল্য-কৈশোর কেটেছে—শহরে নয়, স্কুল-কলেজে 'ভদ্রলোক' হবার চেষ্টায় নয়, যাত্রাগান লেটো গানের আসরে, বাড়ি থেকে পালিয়ে রুটির দোকানে, তারপর সৈনিক হ'য়ে। এই যেগুলো সামাজিক দিক থেকে তাঁর অসুবিধে ছিলো, এগুলোই সুবিধে হ'য়ে উঠলো যখন কবিতা লেখায় তিনি হাত দিলেন। যেহেতু তাঁর পরিবেশ ছিলো ভিন্ন এবং একটু বন্য ধরনের, আর যেহেতু সেই পরিবেশ তাঁকে পীড়িত না ক'রে উল্টে আরো সবল করেছিলো তাঁর সহজাত বৃত্তিগুলোকে, সেইজন্য, কোনোরকম সাহিত্যিক প্রস্তুতি না-নিয়েও শুধু আপন স্বভাবের জোরেই রবীন্দ্রনাথকে পলাতে পারলেন তিনি, বাংলা কবিতায় নতুন রক্ত আনতে পারলেন। তাঁর কবিতায় যে-পরিমাণ উত্তেজনা ছিলো সে-পরিমাণ পুষ্টি যদিও ছিলো না, তবু অন্তত নতুনের আকাঙ্ক্ষা তিনি জাগিয়েছিলেন; তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাব যদিও বেশি স্থায়ী হ'লো না, কিংবা তেমন কাজে লাগলো না, তবু অন্তত এটুকু তিনি দেখিয়ে দিলেন যে রবীন্দ্রনাথের পথ ছাড়াও অন্য পথ বাংলা কবিতায় সম্ভব। যে-আকাঙ্ক্ষা তিনি জাগালেন, তার তৃপ্তির জন্য চাঞ্চল্য জেগে উঠলো নানাদিকে; এলেন 'স্বপনপসারী'র সত্যেন্দ্র দত্তীয় মৌতাত কাটিয়ে, পেশীগত শক্তি নিয়ে মোহিতলাল, এলো যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের অগভীর কিন্তু তখনকার মতো ব্যবহারযোগ্য বিধর্মিতা, আর এইসব পরীক্ষার পরেই দেখা দিলো 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর নতুনতর প্রচেষ্টা, বাংলা সাহিত্যের মোড় ফেরার ঘণ্টা বাজলো।

৪

নজরুল ইসলাম নিজে জানেননি যে, তিনি নতুন যুগ এগিয়ে আনছেন: তাঁর রচনায় সামাজিক রাজনৈতিক বিদ্রোহ আছে, কিন্তু সাহিত্যিক বিদ্রোহ নেই। যদি তিনি ভাগ্যগুণে গীতকার এবং সুরকার না-হতেন, এবং যদি পারস্য গজলের অভিনবত্বে তাঁর অবলম্বন না-থাকতো, তাহ'লে রবীন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্রনাথেরই আদর্শ মেনে নিয়ে তৃপ্ত থাকতেন তিনি। কিন্তু যে-অতৃপ্তি তাঁর নিজের মনে ছিলো না, সেটা তিনি সংক্রমিত ক'রে

দিলেন অন্যদের মনে; যে-প্রক্রিয়া অচেতনভাবে তাঁর মধ্যে শুরু হ'লো, তা সচেতন স্তরে উঠে আসতে দেরি হ'লো না। যাকে 'কল্লোল'-যুগ বলা হয়, তার প্রধান লক্ষণই বিদ্রোহ, আর সে-বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই রবীন্দ্রনাথ। এই প্রথম রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে অভাববোধ জেগে উঠলো—বন্ধ্য প্রাচীনের সমালোচনার ক্ষেত্রে নয়, অর্বাচীনের সৃষ্টির ক্ষেত্রেই। মনে হ'লো তাঁর কাব্যে বাস্তবের ঘনিষ্ঠতা নেই, সংরাগের তীব্রতা নেই, নেই জীবনের জ্বালাযন্ত্রণার চিহ্ন, মনে হ'লো তাঁর জীবন-দর্শনে মানুষের অনতিক্রম্য শরীরটাকে তিনি অন্যায়ভাবে উপেক্ষা ক'রে গেছেন। এই বিদ্রোহে আতিশয্য ছিলো সন্দেহ নেই, কিছু আবিলতাও ছিলো, কিন্তু এর মধ্যে সত্য যেটুকু ছিলো তা উত্তরকালের অঙ্গীকরণের দ্বারা প্রমাণ হ'য়ে গেছে। এর মূল কথাটা আর-কিছু নয়—সুখস্বপ্ন থেকে জেগে ওঠার প্রয়াস, রবীন্দ্রনাথকে সহ্য করার, প্রতিরোধ করার পরিশ্রম। প্রয়োজন ছিলো এই বিদ্রোহের—বাংলা কবিতার মুক্তির জন্য নিশ্চয়ই, রবীন্দ্রনাথকেও সত্য ক'রে পাবার জন্য। লক্ষ্য করতে হবে, এই আন্দোলনে অগ্রণী ছিলেন সেই সব তরুণ লেখক, যাঁরা সবচেয়ে বেশি রবীন্দ্রনাথে আপ্লুত; অন্তত একজন যুবকের কথা আমি জানি, যে রাত্রে বিছানায় শুয়ে পাগলের মতো 'পূরবী' আওড়াতো, আর দিনের বেলায় মন্তব্য লিখতো রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ ক'রে। অত্যধিক মধুপানজনিত অগ্নিমান্দ্য ব'লে উড়িয়ে দেয়া যাবে না এটাকে, কেননা, চিকিৎসাও এরই মধ্যে নিহিত ছিলো, ছিলো ভাবসাম্যের আকাঙ্ক্ষা আর আত্মপ্রকাশের পথের সন্ধান। 'নিজের কথাটা নিজের মতো ক'রে বলবো'—এই ইচ্ছেটা প্রবল হ'য়ে উঠেছিলো সেদিন, আর তার জন্যই তখনকার মতো রবীন্দ্রনাথকে দূরে রাখতে হ'লো। ফজলি আম ফুরোলে ফজলিতর আম চাইবো না, আতা-ফলের ফরমাস দেবো—'শেষের কবিতা'র এই ঠাট্টাকেই তখনকার পক্ষে সত্য ব'লে ধরা যায়।* অর্থাৎ, রবীন্দ্রতর হ'তে গেলে যে রবীন্দ্রনাথের

* এর আগের লাইনেই অমিত রায় বলছে, 'এ-কথা বলবো না যে পরবর্তীদের কাছ থেকে আরো ভালো কিছু চাই, বলবো অন্য কিছু চাই।' এটা একেবারেই খাঁটি কথা।

ভগ্নাংশ মাত্র হ'তে হয়, এই কথাটা ধরা পড়লো এতদিনে ;—'কল্লোল'-গোষ্ঠীর লক্ষ্য হ'য়ে উঠলো—রবীন্দ্রেতর হওয়া।

অবশ্য এইভাবে কথাটা বললে ব্যাপারটাকে যেন যান্ত্রিক ক'রে দেখানো হয়, খানিকটা জেদের ভাব ধরা পড়ে। জেদ একেবারেই ছিলো না তা নয়, স্রোতের টানে জঞ্জালও কিছু ভেসে এসেছিলো, কিন্তু এই বিদ্রোহের স্বচ্ছ রূপটি ফুটে উঠলো, যখন, 'কল্লোলে'র ফেনা কেটে যাবার পরে, চিন্তায় স্থিতিলাভের চেষ্টা দেখা দিলো সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'পরিচয়ে', আর 'কবিতা' পত্রিকায় নবীনতর কবিদের স্বাক্ষর পড়লো একে-একে। সুধীন্দ্রনাথের সমালোচনা হাওয়ার ধোঁয়া কাটাতে সাহায্য করলো ; এদিকে, নজরুলের চড়া গলার পরে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের হার্দ্য গুণের পরে, বাংলা কবিতায় দেখা দিলো সংহতি, বুদ্ধিঘটিত ঘনতা, বিষয় এবং শব্দচয়নে ব্রাত্যধর্ম, গদ্য-পদ্যের মিলনসাধনের সংকেত। বলা বাহুল্য, সাহিত্যের ক্ষেত্রে এইরকম পরিবর্তন কালপ্রভাবেই ঘ'টে থাকে, কিন্তু তার ব্যবহারগত সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন কবির ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যেরই প্রয়োজন হয়। আর বাঙালি কবির পক্ষে, বিশ শতকের তৃতীয় এবং চতুর্থ দশকে, প্রধানতম সমস্যা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে পারস্পরিক বৈসাদৃশ্য

কবিতার সঙ্গে কবিতার তুলনা করলে ভালো আর আরো-ভালোর তফাৎটা তেমন জরুরি নয়, সমগ্রভাবে কবির সঙ্গে কবির তুলনাই এই তারতম্যের প্রয়োগের ক্ষেত্র। অর্থাৎ অন্যান্য বাঙালি কবিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যদিও অপরিমেয় ব্যবধান, তবু যে-কোনো ক্ষুদ্র কবির কোনো-একটি ভালো কবিতা রবীন্দ্রনাথেরই 'সমান' ভালো হ'তে পারে, যদি তাতে বৈশিষ্ট্য থাকে, থাকে চরিত্রের পরিচয়। আর এ-বিষয়েও সন্দেহ নেই যে ফজলি আম ফুরোবার পর চালান-দেয়া মান্দ্রাজি আম অথবা আম্রগন্ধী সিরাপের চাইতে ঢের ভালো ঋতুপন্থী, প্রকৃতিজাত আতাফল, যেমন ভালো, মাইকেলের পরে, 'বৃত্রসংহারে'র চাইতে 'সন্ধ্যাসংগীত।' 'শেষের কবিতা'য় অমিত রায়ের সাহিত্যিক বক্তৃতাটিকে 'কল্লোল'কালীন আন্দোলনেরই একটি বিবরণ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ—যদিও পরিহাসের ছলে, আর অবশ্য সাহিত্যের ইতিহাসের একটি সাধারণ নিয়মও লিপিবদ্ধ করেছেন। নিবারণ চক্রবর্তীর ওকালতি ভালোই হয়েছিলো, কিন্তু বক্তৃতার পর কবিতাটি যথেষ্ট পরিমাণে অ-রাবীন্দ্রিক হ'লো না ব'লেই তার মামলা ফেঁশে গেলো শেষ পর্যন্ত।

প্রচুর—কোনো-কোনো ক্ষেত্রে দুস্তর; দৃশ্যগন্ধস্পর্শময় জীবনানন্দ আর মননপ্রধান অবক্ষয়চেতন সুধীন্দ্রনাথ দুই বিপরীত প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন, আবার এ-দু'জনের কারো সঙ্গেই অমিয় চক্রবর্তীর একটুও মিল নেই। তবু যে এই কবিরা সকলে মিলে একই আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত, তার কারণ এঁরা নানা দিক থেকে নতুনের স্বাদ এনেছেন, এঁদের মধ্যে সামান্য লক্ষণ এই একটি ধরা পড়ে যে এঁরা পূর্বপুরুষের বিত্ত শুধু ভোগ না-ক'রে, তাকে সাধ্যমতো সুদে বাড়াতেও সচেষ্ট হয়েছেন, এঁদের লেখায় যে-রকমেরই যা-কিছু পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথে ঠিক সে-জিনিশটি পাই না। কেমন ক'রে রবীন্দ্রনাথকে এড়াতে পারবো—অবচেতন, কখনো বা চেতন মনেই এই চিন্তা কাজ ক'রে গেছে এঁদের মনে, কোনো কবি, জীবনানন্দের মতো, রবীন্দ্রনাথকে পাশ কাটিয়ে স'রে গেলেন, আবার কেউ-কেউ তাঁকে আত্মস্থ ক'রেই শক্তি পেলেন তাঁর মুখোমুখি দাঁড়াবার। এই সংগ্রামে—সংগ্রামই বলা যায় এটাকে—এঁরা রসদ পেয়েছিলেন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে, পেয়েছিলেন উপকরণরূপে আধুনিক জীবনের সংশয়, ক্লান্তি, বিতৃষ্ণা। এঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধসূত্র অনুধাবন করলে ঔৎসুক্যকর ফল পাওয়া যাবে: দেখা যাবে, বিষ্ণু দে ব্যঙ্গানুকৃতির তির্যক উপায়েই সহ্য ক'রে নিলেন রবীন্দ্রনাথকে; দেখা যাবে সুধীন্দ্রনাথ, তাঁর জীবনভুক্ পিশাচ-প্রমথর বর্ণনায়, রাবীন্দ্রিক বাক্যবিন্যাস প্রকাশ্যভাবেই চালিয়ে দিলেন, আবার অমিয় চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথেরই জগতের অধিবাসী হ'য়েও, তার মধ্যে বিস্ময় আনলেন প্রকরণগত বৈচিত্র্যে, আর কাব্যের মধ্যে নানা-রকম গদ্য বিষয়ের আমদানি ক'রে। অর্থাৎ, এঁরা রবীন্দ্রনাথের মোহন রূপে ভুলে থাকলেন না, তাঁকে কাজে লাগাতে শিখলেন, সার্থক করলেন তাঁর প্রভাব বাংলা কবিতার পরবর্তী ধারায়। 'বেলা যে প'ড়ে এলো জলকে চল'-এর বদলে 'গলির মোড়ে বেলা যে প'ড়ে এলো', আর 'কলসী কাঁখে ল'য়ে পথ সে বাঁকা'র বদলে 'কলসি কাঁখে চলছি মৃদু তালে'—এই রকম আক্ষরিক অনুকরণেরই উপায়ে একটি উৎকৃষ্ট এবং মৌলিক কবিতা লেখা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো এঁদের উদাহরণ সামনে ছিলো ব'লেই; দশ বছর আগে এ-রকমটি হ'তেই পারতো না। সত্যেন্দ্র-

গোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি করতেন নিজেরা তা না জেনে—সেইটেই মারাত্মক হয়েছিলো তাঁদের পক্ষে; আর এই কবিরা সম্পূর্ণরূপে জানেন রবীন্দ্রনাথের কাছে কত ঋণী এঁরা, আর সে-কথা পাঠককে জানতে দিতেও সংকোচ করেন না, কখনো-কখনো আস্ত-আস্ত লাইন তুলে দেন আপন পরিকল্পনার সঙ্গে মিলিয়ে। এই নিষ্কুণ্ঠতা, এই জোরালো সাহস—এটাই এঁদের আত্মবিশ্বাসের, স্বাবলম্বিতার প্রমাণ। ভাবীকালে এঁদের রচনা যে-রকমভাবেই কীটদষ্ট হোক না, এঁরা ইতিহাসে শ্রদ্ধেয় হবেন অন্তত এই কারণে যে বাংলা কবিতার একটি সংকটের সময়ে এঁরা এই মৌল সত্যের পুনরুদ্ধার করেছিলেন যে সত্য-শিব-সুন্দরকে গুরুর হাত থেকে তৈরি অবস্থায় পাওয়া যায় না, তাকে জীবন দিয়ে সন্ধান করতে হয়, এবং কাব্যকলাও উত্তরাধিকারসূত্রে লভ্য নয়, আপন শ্রমে উপার্জনীয়।

নজরুল ইসলাম থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী অবকাশ—এই কুড়ি বছরে বাংলা কবিতার রবীন্দ্রাশ্রিত নাবালক দশার অবসান হ'লো। এর পরে যাঁরা এসেছেন এবং আরো পরে যাঁরা আসবেন, রবীন্দ্রনাথ থেকে আর-কোনো ভয় থাকলো না তাদের, সে-ফাঁড়া পূর্বোক্ত কবিরা কাটিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য অন্যান্য দুটো-একটা বিপদ ইতিমধ্যে দেখা দিয়েছে; যেমন জীবনানন্দর পাক, কিংবা বিষ্ণু দে'র বা অন্য কারো-কারো আবর্ত, যা থেকে চেষ্টা ক'রেও বেরোতে পারছেন না আজকের দিনের নবাগতরা। এতে অবাক হবার বা মন-খারাপ করার কিছু নেই; এই রকমই হ'য়ে এসেছে চিরকাল; পুনরাবৃত্তির অভ্যাসের চাপেই পুরোনোর খোশা ফেটে যায়, ভিতর থেকে নতুন বীজ ছড়িয়ে পড়ে। নতুন যাঁরা কবিতা লিখছেন আজকাল, তাঁরা অনেকেই দেখছি প্রথম থেকেই টেকনীক নিয়ে বড্ড বেশি ব্যস্ত;—সেটা কোথা থেকে এসেছে, তা আমি জানি, যথাসময়ে তার সমর্থনও করেছি, কিন্তু এখন সেটাকে দুর্লক্ষণ ব'লে মনে না-ক'রে পারি না। 'চোরাবালি' কিংবা 'খসড়া' লেখার সময় যে-সব কৌশল ছিলো প্রয়োজনীয়, আজকের দিনে অনেকটাই তার মুদ্রা-দোষে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে; আর তাছাড়া যখন ভঙ্গি নিয়ে অত্যধিক দুশ্চিন্তা দেখা যায়—যেমন চলতিকালের ইংরেজ-মার্কিন কাব্যে—তখনই বুঝতে

হয় মনের দিক থেকে দেউলে হ'তে দেরি নেই। আমি এ-কথা ব'লে কলাসিদ্ধির প্রাধান্য কমাতে চাচ্ছি না, কিন্তু কলাকৌশলকে পুরো পাওনা মিটিয়ে দেবার পরেও এই কথাটি বলতে বাকি থাকে যে কবিতা লেখা হয়—স্বরব্যঞ্জনের চাতুরী দেখাতে নয়, কিছু বলবারই জন্য, আর সেই বক্তব্য যেখানে যত বড়ো, যত স্বচ্ছন্দ তার প্রকাশ, প্রকরণগত কৃতিত্বও সেখানেই তত বেশি পাওয়া যায়। মনে হয় এখন বাংলা কবিতায় স্বাচ্ছন্দ্য-সাধনার সময় এসেছে নতুন ক'রে, প্রয়োজন হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তিকে ফিরে পাবার। আর এইখানে রবীন্দ্রনাথ সহায় হ'তে পারেন, এ-কথাটি বলতে গিয়েও থেমে গেলুম, যেহেতু আদি উৎস বিষয়ে কোনো পরামর্শ নিষ্প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের কথাটা আজকের দিনে যে আর না-তুললেও চলে, সেটাই বাংলা কবিতার পরিণতির চিহ্ন, এবং রবীন্দ্রনাথেরও 'ভক্তিবন্ধন থেকে পরিত্রাণে'র প্রমাণ। বাংলা সাহিত্যে আদিগন্ত ব্যাপ্ত হ'য়ে আছেন তিনি, বাংলা ভাষার রক্তে-মাংসে মিশে আছেন; তাঁর কাছে ঋণী হবার জন্য এমনকি তাঁকে অধ্যয়নেরও আর প্রয়োজন নেই তেমন, সেই ঋণ স্বতঃসিদ্ধ ব'লেই ধরা যেতে পারে—শুধু আজকের দিনের নয়, যুগে-যুগে বাংলা ভাষার যে-কোনো লেখকেরই পক্ষে। আর যেখানে প্রত্যক্ষভাবে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘ'টে যাবে, সেখানেও, সুখের বিষয়, সম্মোহনের আশঙ্কা আর নেই; রবীন্দ্রনাথের উপযোগিতা, ব্যবহার্যতা, ক্রমশই বিস্তৃত হ'য়ে, বিচিত্র হ'য়ে প্রকাশ পাবে বাংলা সাহিত্যে। তাঁরই ভিত্তির উপর বেড়ে উঠতে হবে আগামী কালের বাঙালি কবিকে; বাংলা কবিতার বিবর্তনের পরবর্তী ধাপেরও ইঙ্গিত আছে এইখানে।

১৯৫২

রবীন্দ্র-জীবনী ও রবীন্দ্র-সমালোচনা

রবীন্দ্র-জীবনী এবং রবীন্দ্র-সমালোচনা লেখবার একটি বাধা আছে আমাদের। সে-বাধা অদ্ভুত, অসাধারণ, এবং পর্বতপ্রমাণ, কেননা সে-বাধা রবীন্দ্রনাথ। একে তো আত্মজৈবনিক গ্রন্থে ও পত্রাবলীতে তিনি সাক্ষাৎ কল্পতরু, তার উপর—স্বেচ্ছায় কিংবা দায়ে প'ড়ে—নিজেই নিজের মল্লিনাথের কাজ অসংখ্য বার করেছেন ব'লে বর্তমান বাংলাদেশে তাঁর জীবনীকার বা সমালোচকদের অনেক সময়ই সংগ্রাহকমাত্র মনে হয়—কি বড়ো জোর সম্পাদক; অর্থাৎ তাঁরই রচনা আর চিঠিপত্র থেকে বিস্তারিত উদ্ধৃতি, এবং সেই উদ্ধৃতিরই রোমন্থন পেরিয়ে আমাদের রবিচর্চা আর বেশি দূর এগোয় না। বাংলা ভাষার পাঠকমাত্রেই জানেন যে রবীন্দ্র-বিষয়ক গ্রন্থের সাধারণ সুখপাঠ্যতার প্রধান কারণ আদি উৎস থেকে উদ্ধৃতির বহুলতা: আর যদিও তার কোনো-কোনোটি—যেমন সদর স্ট্রিটের স্বপ্ন-ভঙ্গের বর্ণনা—পুনরুক্তির শরশয্যায় শতচ্ছিন্ন, তবু কখনো-কখনো এমন-কোনো পংক্তি বা পত্রাংশের সাক্ষাৎ মেলে যা পাঠক হয়তো তৎপূর্বে লক্ষ্য করেননি—আর তারই জন্য গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ জানাতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু সংকলনের নৈপুণ্যে সমালোচকের কাজ ফুরোয় না; যে-লেখা রবীন্দ্রনাথকে চিনিয়ে দেবে, তাঁর বই প'ড়ে যা পাওয়া যায়, তার উপরেও আরো কিছু যোগ করবে, সে-রকম সমালোচনায় সিদ্ধি বড়ো দুরূহ, কেননা প্রণয়নের পদে-পদে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষ্যকারের প্রতিযোগী। এ-রকম আশঙ্কা সর্বদাই বিদ্যমান যে 'জীবনস্মৃতি' বা 'ছিন্নপত্রে'র কোনো অংশের পাশে আমাদের পদাতিক গদ্যের খঞ্জতা যেমন প্রকট হবে, তেমনি ধরা পড়বে যে তাতে বক্তব্য কিছু নেই, আসলে তা উদ্ধৃত পদেরই সম্প্রসারণ মাত্র। ফলত, পাঠকের হয়তো ধারণা হবে যে সমালোচকের দ্বারস্থ হওয়া বৃথা; রবীন্দ্রনাথকে আরো বেশি জানতে হ'লে আরো একবার রবীন্দ্রনাথ পড়াই সদুপায়। আর এ-ধারণার বশবর্তী হ'লে কেউ ভুল করবে সে-কথাও এখনো বলা যায় না, কেননা রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিমাণ ও বৈচিত্র্যগুণে এখনো স্বয়ংসম্পূর্ণ হ'য়ে আছেন; অর্থাৎ, তাঁর রচনাবলী অন্তঃস্থ হ'লেই

তাঁর জীবনের সঙ্গে পরিচয় হয়; শুধু তা-ই নয়, তাঁর চিন্তার সঙ্গে আমাদের উপলব্ধির সেতুনির্মাণ করে তাঁর নিজেরই পত্রাবলী, প্রবন্ধাবলী। রবীন্দ্রনাথ নিজেই নিজের ব্যাখ্যাতা হ'য়ে পরবর্তীদের যে-সুবিধে ক'রে দিয়েছেন সেই সুবিধেটাই বিপজ্জনক; তাঁর আপন ভাষ্যের সীমানার বাইরে তাঁকে দেখতে পাওয়া আজ পর্যন্ত সহজ হয়নি। এর একটা উদাহরণ এই যে তাঁর জীবন সম্বন্ধে যে-সব তথ্য সত্যই জ্ঞাতব্য, অথচ তিনি প্রকাশ করেননি, অন্য কেউ তার ধার দিয়েও ঘেঁষেননি এখনো; কিংবা তিনি পরোক্ষে যেটুকু জানিয়েছেন, অন্য কেউ প্রত্যক্ষভাষণেও পৌঁছতে পারেননি সেখানে—সুবৃহৎ 'রবীন্দ্র-জীবনী'র প্রণেতা শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও না।

এতৎসত্ত্বেও এ-কথা সত্য যে ভালোবাসা ভাষার প্রত্যাশী; অতএব স্বর্গত অজিতকুমার চক্রবর্তী থেকে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী পর্যন্ত রবীন্দ্র-বিষয়ক গ্রন্থকর্তারা এইজন্যেই আমাদের শ্রদ্ধেয় যে তাঁদের পরিশ্রম তাঁদের রবিপ্রেমেরই প্রতিমূর্তি। এ-কথা অজিতকুমার সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রযোজ্য, কেননা এই স্বল্পায়ু রসজ্ঞ তাঁর বই দু-খানা যখন লিখেছিলেন, তখন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রবাবু বলা হ'তো, এবং রবিভক্তি—অন্তত তার মৌখিক প্রকরণ—ভব্যতার অপরিহার্য অনুষঙ্গ ব'লে গণ্য হয়নি। যদিও রবীন্দ্রনাথ তখন বয়ঃক্রমে পঞ্চাশোত্তর, আর গ্রন্থসংখ্যায় শতাধিক, তবু সরবে তার পক্ষপাতী হওয়া তখন পর্যন্ত দুঃসাহসিক ছিলো; উপরন্তু, ক্ষয়িষ্ণু ব্রাহ্ম-সমাজের বন্ধ্যাত্ব, আর যুযুৎসু হিন্দুসমাজের অন্ধতা, এই উভসংকট অতিক্রম ক'রে রবিপ্রতিভার স্বরূপ চেনা সহজ ছিলো না। এই ডবল ফাঁড়া কাটিয়ে গিয়েছিলেন অজিতকুমার; তাঁর সম্বন্ধে উল্লেখ্য শুধু এ-ই নয় যে তিনি বাংলাদেশের প্রথম প্রতিশ্রুত রবিপূজকদের অন্যতম, তাঁর প্রধান কৃতিত্ব এইখানে যে রবীন্দ্রনাথকে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন স্থানীয়, অস্থায়ী এবং সাময়িকের পরপারে, কোনো-এক ধ্রুব আদর্শের পটভূমিকায়। অবশ্য সে-আদর্শ তিনি সংগ্রহ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথেরই কাছে—আর সেখানেই তাঁর সমালোচনার ন্যূনতা—কিন্তু তার জন্য অজিতকুমারকে দোষ না-দিয়ে দোষ দিতে হয় আমাদের ভাগ্যকে—যে-ভাগ্যে আমরা রবীন্দ্রনাথকে পেয়েছি

তার মস্ত মাশুল এই দিতে হচ্ছে যে তাঁর বিষয়ে তারই ভাষায় কথা বলতে হয়। আদর্শের যে-পূর্বপ্রস্তুত স্বকীয়তায় সমালোচনা মেরুদণ্ড পায়, যার জোরে নিজের পায়ে সে দাঁড়াতে পারে, তারই অভাব আমাদের রবিচর্চার প্রায় সামান্য লক্ষণ। বাঙালির সাধারণ সাহিত্যচিন্তার সংকীর্ণতা থেকে রবিপ্রতিভার সার্বভৌমতা এতই সুদূরে যে তাঁর বিষয়ে কিছু বলতে হ'লে—শুধু অজিতকুমার কেন—অনেকেই আমরা আজ পর্যন্ত গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা সারি। এটা পরিতাপের বিষয়, কিন্তু বিস্ময়ের নয়, কেননা গুল্মবহুল বাংলা সাহিত্যের এঁদো জমিতে রবীন্দ্রনাথের অভ্যুত্থান এত বড়োই আশ্চর্য ঘটনা যে তার টাল সামলাতেই আমাদের প্রায় দম ফুরোয়। কার্যত, এই অনন্য বনস্পতির ছায়ায় ব'সেই দিন কাটে আমাদের, মাপজোক নেবার কলকব্জা খুঁজে পাই না। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে আধুনিক মনের থই মেলে না, স্বদেশী ঐতিহ্যে তুল্য কোনো কবি নেই, আবার পশ্চিমী আদর্শ প্রয়োগ করতে গেলেও ভুল হবে—যদিও এই বিশ্বমানবের আলোচনায় বিশ্ববোধ অপরিহার্য প্রয়োজন। এই বিশ্ববোধের আভাস দেখা যায় অজিতকুমারে, কেননা 'উর্বশী'-বিষয়ক চলতি বুলির তিনিই যদিও জন্মদাতা,* তবু অন্তত এ সত্য তিনি অনুভব করেছিলেন যে রবীন্দ্র-কাব্য 'বিশ্বের জন্য বিরহ-বেদনা'য় চঞ্চল।

উপরন্তু অজিতকুমার বুঝেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও জীবন 'একই রচনার অন্তর্গত'; তাঁর লক্ষ্য ছিলো ইংরেজি লাইফ অ্যাণ্ড লেটার্স গ্রন্থমালার পদ্ধতিতে জীবনের সঙ্গে কাব্যের অন্বয়। তবু যে জীবনীর দিকে তাঁর আগ্রহ জাগেনি, সেটা তাঁর ভাগ্য; কেননা রবীন্দ্র-বিষয়ক গ্রন্থরচনার পূর্বোল্লিখিত সাধারণ বাধা ছাড়াও জীবনীবিন্যাসে বিশেষ বিপত্তির কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথ যে একবার একটি চিঠিতে লিখেছিলেন যে তাঁর জীবন সম্বন্ধে বিশেষ-কিছু বলবার নেই, সে-কথা বিনয়প্রসূত অতিশয়োক্তি নয়,

* ভেবে অবাক লাগে যে অজিতকুমার, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে অভিজ্ঞ হ'য়েও, কেমন ক'রে এমন কথা লিখতে পেরেছিলেন যে '"উর্বশী"র ন্যায় সৌন্দর্যবোধের এমন পরিপূর্ণ প্রকাশ সমগ্র ইউরোপীয় সাহিত্যে কোথাও আছে কি না সন্দেহ'!

একদিক থেকে খাঁটি সত্য। একদিক থেকে, তাঁর জীবন নিছকরকম গতানু-গতিক; মধুসূদনের মতো নাটকীয় নয়, শেলির মতো বাণবিদ্ধ বা কীটসের মতো তীক্ষ্নকরুণও না; আবার গ্যেটের হেঁয়ালিবহুল অনৈতিকতা কিংবা টলস্টয়ের দ্বন্দ্বপীড়িত উত্তালতারও চিহ্ন নেই তাতে। শিল্পীজীবনের প্রথাগত বৈশিষ্ট্য কিছুই বর্তায়নি তাঁর জীবনে: দারিদ্র্যে প্রহৃত হননি কখনো, ব্যর্থতার শৈত্যসঞ্চার অনুভব করেননি, উদ্‌ভ্রান্ত হননি কোনো পারিবারিক অনিয়ন্ত্রণে কি সাংসারিক দুর্বিবেচনায়, কোনো বয়সে, কোনো অবস্থাতেই উন্মত্ততার কোনো লক্ষণ দেখাননি, উচ্ছৃঙ্খলতারও না। শান্ত, সংযত, সমতল তাঁর জীবন একটি স্থির লক্ষ্যের দিকে তীরের মতো তন্ময়; লক্ষ্যের যত কাছে আসছেন ততই গভীর হ'য়ে তার রেখা পড়ছে পার্থিবের মানচিত্রে; নিরবচ্ছিন্ন আত্ম-উপলব্ধি আর সমানুপাতিক জাগতিক স্বীকৃতি তাঁকে উপহার দিয়েছে রাজকীয় উত্তরজীবন, মহিমান্বিত মৃত্যু। এদিক থেকে, তাঁর সুন্দর, সম্পূর্ণ বৃত্ত জীবনীকারের পক্ষে ততটা উৎসাহজনক নয়, যতটা—ধরা যাক—শেলির অসমাপ্ত উন্মাদনা, বা গ্যেটের বক্রবন্ধুর মানসভূগোল। পক্ষান্তরে, রবীন্দ্রজীবনের কর্মসূচী বাইরের দিক থেকে এতই বিচিত্রবহুল, ব্যক্তিগত জীবনে মৃত্যুশোক আর কবিজীবনে নবজন্ম এমন পৌনঃপুনিক, তাঁর বিশ্বজয়ী ভ্রমণকাহিনীর তালিকা এত সুদীর্ঘ, এমনই নিঃসংশয়ে তিনি বিশ শতকের প্রথমার্ধের অন্যতম বিশ্বপ্রধান—আর তা শুধু কবি ব'লে নয়, জীবনের সব ক্ষেত্রেই—এক কথায়, তাঁর মধ্যে সর্বতোমুখী প্রতিভার ছবি এমনভাবেই ভাস্বর যে তার প্রতি জীবনীকারের পক্ষপাত অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু এই শ্রীক্ষেত্রে আহূত হ'লেও বৃত হবার সম্ভাবনা কম; কেননা এখানেও রবীন্দ্রনাথ অন্তরায়, অন্তরায় তাঁর কর্মের আয়োজন বিস্তৃতি। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত কথা লিখতে গেলে পৃষ্ঠাসংখ্যা পাঠক ভাগাবে, তার উপর সেই বহুবিভক্ত বহুবিক্ষিপ্ত উপাখ্যানের বিশৃঙ্খলতার, অতএব অপাঠ্যতার, আশঙ্কাও অনেকখানি।

সাহসী প্রভাতকুমার সেই চেষ্টাই করেছেন; তাঁর গ্রন্থের পরিবর্ধিত সংস্করণটির আকার দেখলেই সম্ভ্রম জাগে। প্রথম খণ্ডের সুবৃহৎ ঘনমুদ্রিত ৪০০ পৃষ্ঠায় তিনি পৌঁচেছেন মাত্র ১৩০৮ সালে, অর্থাৎ কবির চল্লিশ বছর

পর্যন্ত। অথচ, তথ্যের এই আধিক্য সত্ত্বেও, কিংবা সেইজন্যই, রবীন্দ্রনাথ কোনো-একটি পৃষ্ঠাতেও জীবন্ত হ'য়ে ওঠেননি, কোথাও নিশ্বাস পড়েনি তাঁর, একবারও শুনতে পেলাম না তাঁর হৃৎস্পন্দন। ভিক্টরীয় ইংলণ্ডের 'সরকারি' জীবনীর অনুসরণে প্রভাতকুমার অধিগম্য সকল তথ্যই একত্র করেছেন, তার উপর নায়ককে অবতীর্ণ করেছেন প্রথম থেকেই মহত্ত্বের ইস্পাত-জামা পরিয়ে। অবশ্য এ-বিষয়ে তিনি সচেতন যে জীবনী-কারের অতিভক্তি জীবনীর অভিব্যক্তির প্রতিকূল; তিনি প্রশংসনীয় চেষ্টা করেছেন অভিভূত না-হ'তে, সুযোগ পেলেই রবীন্দ্রনাথের মতের বিরুদ্ধে তর্ক তুলেছেন, রচনার দুর্বল অংশগুলিকে দুর্বল ব'লেই ঘোষণা করতে দ্বিধা করেননি—তবু-যে বিগ্রহে প্রাণসঞ্চার করতে পারেননি তার কারণই এই যে গ্রন্থটি ক্রমবিকশিত নয়, নির্মিত, অর্থাৎ লেখক প্রকৃতির অনুকরণে তাঁর পাত্রকে উন্মোচিত করেননি, প্রথম থেকেই ধ'রে নিয়েছেন, এবং পাঠককে বুঝতে দিয়েছেন, যে তিনি মহাপুরুষ, তার উপর একটি মহৎ বংশের রত্নোত্তম।

ঐ শেষোক্ত বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজের কিঞ্চিৎ আপত্তি ছিলো। 'রবীন্দ্রজীবনী' প্রথম বেরোবার পর—প্রভাতকুমার তাঁর দ্বিতীয় সংস্করণের 'সূচনা'য় জানিয়েছেন—রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে বইখানা রবীন্দ্রনাথের জীবনী হয়নি, হয়েছে দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্রের কাহিনী। এই আর্ষ বাক্য মেনে না-নিয়ে উপায় থাকে না, যখন অতিবিস্তৃত বংশপরিচয়ের পরেও প্রভাতকুমার ঘন-ঘন দ্বারকা-দ্বারস্থ হন, এমনকি রবীন্দ্রনাথের বিবাহপ্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে 'সামাজিক আর্থিক আধ্যাত্মিক কোনো দিক "হইতেই" অভিজাত ঠাকুর-পরিবারের সহিত ইঁহাদের [অর্থাৎ কবিপত্নীর পিত্রালয়ের] তুলনা হইতে পারে না।' সত্যি বলতে, বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথকে এখনো অনেকটা আচ্ছন্ন ক'রে আছে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি, তিনি যেন ঠাকুরবাড়িরই কৃতিত্ব, কিংবা ঠাকুরবাড়ির ব'লেই তিনি রবীন্দ্রনাথ, এইরকম মোহপ্রসূত বাক্য মাঝে-মাঝেই শোনা যায়। 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথে'র লেখিকা এক জায়গায় কবির আভিজাত্য ইত্যাদি নিয়ে উচ্ছ্বসিত; এমনকি শ-ভক্ত প্রমথনাথ বিশীও এ-কথা ভেবে

রোমাঞ্চিত যে 'দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র' এমন অনেকের সঙ্গে বনভোজনে বেরিয়েছেন, যারা 'দ্বারকানাথের পৌত্রের চেয়ে ধন ও বংশমর্যাদায় অনেক নিচে।' একেই ইংরেজিতে বলে স্নবিশ।

সমালোচনার ক্ষেত্রে বিশী-মহাশয় অজিতকুমারের সধর্মী ; তাঁরও প্রয়াস জীবনের সঙ্গে সাহিত্যকর্ম মিলিয়ে দেখানো। এই পদ্ধতির উপযোগ আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এখানে খুব সতর্ক না-হ'লে এমন বিষয় প্রশ্রয় পায়, যা সমালোচনায় অবৈধ, বা অবান্তর। বংশপরিচয় জায়গা জোড়ে, খামকা ফেঁপে ওঠে আত্মীয়-বন্ধুর তালিকা, আর তার ফলে যে কাব্যজিজ্ঞাসাব ক্ষতি হয়, তার দৃষ্টান্ত মেলে বিশী-মহাশয়ের জীবনীঘটিত সমালোচনায়। এই রবিসাধক যদি ভুলতে পারতেন যে রবীন্দ্রনাথ দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র, যদি কবির উপর প্রত্যেক পারিবারিক ও সাহিত্যিক অগ্রজের, এবং বিদেশী কবিদের, 'প্রভাব'-সন্ধানে শ্রান্ত না-হতেন, তাহ'লে 'রবীন্দ্র-কাব্য-নির্ঝরে' বালার্কবর্ণনার কাহিনীর অংশ তাঁর হাতে আরো রমণীয় হ'তো, আরো গ্রহণীয় হ'তো সমালোচনা। বলা বাহুল্য, সাহিত্যশাস্ত্রে পারদর্শিতা মানেই সারদর্শিতা নয়, রবিজ্ঞতাও বৃহত্তর অভিজ্ঞতার মুখাপেক্ষী ; সেই অভিজ্ঞতার অভাববশতই বাংলাদেশে রবীন্দ্র-বিষয়ক কিছু প্রবচনের উদ্ভব হয়েছে, বাস্তবে যার ভিত্তি নেই, অথচ মুখে-মুখে যার পুনরুক্তিও কিছুতেই থামছে না ;—আজকের দিনেও বিশী-মহাশয় আমাদের শুনিয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথ শেলির সগোত্র, আর শেলি কীট্স নাকি 'আদি-পর্বে' কাহিনী-কাব্য লিখে থাকলেও শেষে বুঝেছিলেন যে দীর্ঘ কাব্য তাঁদের 'যথার্থ বাহন' নয়, উপরন্তু কাহিনী-কাব্যে তাঁরা 'সাফল্যলাভ' করতে পারেননি 'বাস্তব সংসারের সঙ্গে পরিচয়ের অভাবে।' বস্তুটাকে বাদ দিয়ে শাস্ত্র মেনে চললে তার ফলাফলটা কেমন দাঁড়ায় তা জানবার সুযোগ আমরা আরো পেয়েছি ; বাঙালি অধ্যাপকের মুখে এমন কথাও আমাদের শুনতে হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথে হাস্যরস নেই—কেননা রবীন্দ্রনাথ গীতিকবি, এবং গীতিকাব্যের কেতাবি লক্ষণে হাস্যরস গণ্য হয় না। উপরি-উদ্ধৃত মন্তব্যটিও ফর্মুলা-মাফিক নিঃসৃত হয়েছে : শেলি কীট্স রোমান্টিক জাতের কবি, এবং রোমান্টিকদের লিরিক লেখাই নিয়ম—অতএব চোখ বুজে ব'লে

দেয়া যায় যে কাহিনীকাব্যে তাঁরা ব্যর্থকাম। অবশ্য যাঁরা কানন ভুলে কবিতাটারই সাক্ষ্য নেন তাঁরাই জানেন যে কীটসের কবিপ্রকৃতির প্রবল উন্মুখতা ছিলো দীর্ঘ কাব্যেই, শুধু কাহিনী-কবিতায় নয়, নাটকে এপিকেও সুস্পষ্ট, 'দি চেঞ্চি'তেও নাট্যপ্রতিভার স্বাক্ষর আছে, তাছাড়া শেলির সর্বশেষ অসমাপ্ত 'ট্রায়াম্ফ অব লাইফ', যার তুল্য গভীর কবিতা তিনি আর লেখেননি, সেটি অস্ত্যর্থেই দীর্ঘ, শেষ হ'লে সুদীর্ঘ হ'তো। যেখানে কীটসের বৈশিষ্ট্য, আর শেলিরও কৃতিত্ব, ঠিক সেখানেই তাঁদের 'সাফল্যে'র অভাব কারণসুদ্ধ, কেউ দেখিয়ে দিলে সমালোচনার ভিৎ ভেঙে পড়ে।*

এ-কথাটা মুখ ফুটে এখন বলা দরকার যে ইংরেজ 'রোমান্টিক' কবিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রচলিত সাদৃশ্যে কোনো ভিত্তি নেই, ওটা কিংবদন্তী মাত্র। শেলি রবীন্দ্রনাথের প্রিয় কবি ছিলেন এতে কিছুই প্রমাণ হয় না; তাঁর প্রিয় কবি ব্রাউনিংও ছিলেন, হাইনেও ছিলেন—দান্তেও ছিলেন; আমাদের সকলের মতোই তাঁকেও মুগ্ধ করেছে জীবনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিদেশী কবি। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, এবং সম্পূর্ণ সুখের বিষয়ও নয়, তাঁর রচনায় প্রত্যক্ষ প্রভাব প্রত্যেকটি ভারতীয়;† উপনিষদ্, কালিদাস, বৈষ্ণব কবিতা, বাউল-গান আর বাংলার লৌকিক ছড়া—এই ক-টি ছাড়া আর-কোনো প্রভাব আবিষ্কার করতে হ'লে পাতা ওল্টাতে হয় তাঁর বাল্যরচনার, প্রভাবের প্রসঙ্গই যেখানে অবাস্তব, আর সেখান থেকে পংক্তি তুলে-তুলে প্রমাণ করা শক্ত হয় না যে তিনি কখনো বিহারীলালের

* এখানে উল্লেখ্য যে শেলির ঘোরতর অভক্ত টি. এস. এলিয়ট সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন যে দান্তের প্রভাব শেলির মধ্যে যে-রকম সার্থক হয়েছিলো, ইংরেজি ভাষার আর-কোনো কবিতেই সে-রকম হয়নি। বাঙালি পাঠকসমাজে শেলি সম্বন্ধে যে-ধারণা প্রচলিত, এই উক্তির সামনে তা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে।

† প্রত্যক্ষ প্রভাব কাকে বলছি তা একটু বুঝিয়ে বললে ভালো হয়। কবিতার আকারে-প্রকারে বিদেশী কবিদের পরামর্শ তিনি পেয়েছিলেন; হয়তো বলা যায় যে 'নারীর উক্তি', 'পুরুষের উক্তি' প্রভৃতি কবিতায় ব্রাউনিঙের ধরনটা তাঁর মনে ছিলো; হয়তো 'ক্ষণিকা'র হালকা চালটি হাইনে কিঞ্চিৎ এগিয়ে দিয়েছিলেন; তাছাড়া 'আমি নাববো

প্রভাবে চিহ্নিত, কখনো শেলির—এমনকি কখনো হেমচন্দ্রের। কিন্তু স্বভাব যতদিন প্রতিষ্ঠা না পায়, প্রভাব ততদিন অনুকরণেরই সমার্থক, এবং যে-বয়সে পূর্বসূরীর অনুকরণ অবশ্যম্ভাবী, কিংবা অনুকরণই শুধু সম্ভব, সেই বয়সের রচনাকে 'প্রভাব' কিংবা 'সাদৃশ্যে'র সাক্ষীরূপে দাঁড় করালে উদ্‌ভ্রান্তির সীমানা শুধু বেড়ে যায়। উদাহরণত, 'কবি-কাহিনী' আর 'অ্যালাস্টরে'র সাদৃশ্যের অর্থ শুধু এ-ই হ'তে পারে যে প্রথমোক্ত শেষোক্তের অনুকরণ; এ থেকে যদি এমন ধারণা প্রশ্রয় পায় যে ও-দুই কবিকে বিধাতা 'একই ছাঁচে' গড়েছিলেন, তাহ'লে এই সত্যটাই চাপা পড়ে যে রবীন্দ্রনাথের তুলনায় শেলি নাবালকমাত্র হ'লেও শেলির আত্মহারা তীব্রতা রবিপ্রকৃতির দূরবর্তী। প্রতিভার ক্রিয়াকলাপ রহস্যময়, স্বতোবিরোধ তার কুললক্ষণ; তাই দেখতে পাই যে রবীন্দ্রনাথ—যদিও আমাদের দেশজ সাহিত্যের ক্ষীণ ধমনীতে পাশ্চাত্ত্য শোণিতসঞ্চার তিনিই করেন, তবু তাঁর রচনাবলীতে প্রতীচীর প্রত্যক্ষ উপস্থিতি নেই, আর—তার চেয়েও যা আশ্চর্য—তাঁর প্রবন্ধাদি প্রমাণ করে যে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সঙ্গে প্রাণসূত্রে তিনি বাঁধা পড়েননি কখনোই, * ওতে তাঁর বুদ্ধির আগ্রহ ছিলো, কিন্তু স্বভাবের সমর্থন ছিলো না। উপরন্তু লক্ষ্যণীয় যে তাঁর বয়স, এবং প্রতীচীর সঙ্গে ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা যত বেড়েছে, ততই তাঁর রচনায় ক'মে এসেছে

মহাকাব্য সংরচনে'-র সঙ্গে অস্টিন ডবসনের 'I intended an ode, Rose turned it to a sonnet'-এর সম্বন্ধ এতই স্পষ্ট যে সেটা উল্লেখ্যই নয়। কিন্তু আঙ্গিক—এমনকি আক্ষরিক সাদৃশ্যেও—প্রত্যক্ষ প্রভাব প্রমাণ হয় না; প্রত্যক্ষ প্রভাব ভাবগত, মনের গভীরতম স্তরে তার ক্রিয়াকলাপ। সেই কবিরই প্রত্যক্ষ প্রভাবে পড়ি আমরা, যাঁকে আমরা অনুভব করি একাত্ম ব'লে, চিনতে পারি পরিচালক এবং প্রতিযোগী ব'লে, যাঁকে আমরা দেখামাত্র ব'লে উঠি—'ঐ তো আমি!' কিংবা, 'আহা! আমি যদি উনি হতুম!' ঠিক এই ভাবটি কোনো পশ্চিমী কবির বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের জাগেনি; 'বর্ষশেষে'র সঙ্গে 'ওড টু দি ওয়েস্ট উইণ্ড'-এর অপ্রতিরোধ্য তুলনাতেও মানস-সম্বন্ধ পাওয়া যায় না, প্রকরণগত সাদৃশ্য শুধু ধরা পড়ে।

* 'জীবনস্মৃতি'তে শেক্সপিয়র-প্রসঙ্গ স্মরণীয়। তখনকার বাঙালিরা ইংরেজি সাহিত্য থেকে 'মাদকতা যতটা পেয়েছিলো খাদ্য ততটা পায়নি' সে-কথা সত্য, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রসঙ্গ ; ও-বিষয়ে উল্লেখ সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় তাঁর বাল্যরচনায়। বলা বাহুল্য, সে-সব কৈশোরক পঠনপাঠন এবং তৎ-প্রসূত অনুবাদ ও নিবন্ধাদি বয়সোচিত সাহিত্যিক ব্যায়ামের পর্যায়ভুক্ত, রবীন্দ্রনাথের মনোলোকের সন্ধানে তাদের প্রয়োজন অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু প্রভাতকুমার আর প্রমথনাথ দু-জনেই তাদের মাত্রা-ছাড়ানো মূল্য দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবন সম্বন্ধে এই লেখক দু-জন পরস্পরের সমর্থক ; বিশী-মহাশয়ের ধারণা যে কবির বালভাষণ 'গুরুত্বপূর্ণ', আর প্রভাতকুমারের মতেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন 'precocious child'। অথচ রবীন্দ্র-চরিত্রে মনঃসংযোগ করলে তৎক্ষণাৎ ধরা পড়ে যে তিনি ছিলেন অকালপক্কতার পরপারে ; তাঁর জীবনে আকস্মিকতা নেই, চমক নেই, আছে ক্রমবিকাশের অন্বর নিশ্চয়তা। যদি কীটসের বয়সে তাঁর মৃত্যু হ'তো, তাহ'লে তিনি বাঙালি গৌণ কবিদের মধ্যে কোনোরকমে গণ্য হ'তে পারতেন ; শেলির বয়সে হ'লে, তিনি হতেন আমাদের রম্য কবিদের অন্যতম, বিবিধ কাব্য-চয়নগ্রন্থের বিশেষ উপযোগী, পরবর্তী কবিরা কুড়ি বছর পর-পর তাঁকে নতুন ক'রে 'আবিষ্কার' করতেন। অবশ্য তিনি নিজেই একবার নিজেকে 'quick-witted' আখ্যা দিয়েছিলেন—আর সেই সঙ্গে এ-কথা জুড়তেও ভোলেননি যে সেটা সদ্‌গুণ নয়—কিন্তু আসলে তাঁর উপর ঈশ্বরের দয়া এতটাই ছিলো যে তিনি দ্রুতধী ছিলেন না, চতুর ছিলেন না, মাইকেলের মতো রাতারাতি কোনো হুলুস্থুল ঘটাননি ; তাঁর কৈশোর যৌবনে দেখতে পাই—বিদ্রোহ না, বিস্ময় না—প্রথাপালন, রীতিরক্ষা, অগ্রজের শান্ত, মৃদু অনুসরণ। বিদেশে—এমনকি স্বদেশেও—কৈশোরেই স্মরণীয় কবিতা লিখেছেন এমন কোনো-কোনো কবি, যাঁরা হয়তো সমগ্রভাবে রবীন্দ্রনাথের শতাংশতুল্য ; কিন্তু রবিপ্রতিভা সেই জাতের, যার বৈশিষ্ট্য অবিরল বেড়ে

মন্তব্যে শেক্সপিয়র সম্বন্ধেই অনুকম্পার, অতএব দৃষ্টির, অভাব ধরা পড়ে, যদিও তাঁর পূর্ব-জীবনের নাটকের গড়ন অনেকাংশেই শেক্সপিরীয়। শেক্সপিয়র-শতবার্ষিকার কবিতাটিতেও অন্য অনেক-কিছু আছে, শুধু শেক্সপিয়র নেই।

ওঠায়, অবিরল 'হ'য়ে ওঠা'য়, যার তার বাঁধতে কিছু দেরি হয়, কিন্তু বাঁধা হ'য়ে গেলে গান আর থামে না। তাই তাঁর বাষ্পজড়িত কিশোরকাব্যে আশাতীতের আস্বাদ নেই, তাঁর স্বাক্ষর প্রথম স্পষ্ট হ'লো 'মানসী'তে—আর 'মানসী' তাঁর যে-বয়সের লেখা, কীটস ততদিন বেঁচে থাকেননি। কীটস প্রায় বালক বয়সেই পূর্ণপরিণত, শেলি তিরিশে অসমাপ্ত হ'য়েও কৃতকর্ম, আবার ওঅর্ডস্বর্থের দীর্ঘজীবন ব্যর্থতারই দৃষ্টান্তস্থল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ—তাঁর সমসাময়িক ইএটসের মতো—তাঁর দীর্ঘায়ু শুধু-যে সার্থক করেছিলেন তা নয়, তাতে তাঁর প্রয়োজন ছিলো, কেননা মুখমণ্ডলের প্রতিটি কালকুঞ্চনের সঙ্গে আরো বড়ো হয়েছেন তিনি, তাঁর সম্ভাবনার যেন সীমা ছিলো না।

মনোবিজ্ঞানীর মতে মানুষের শৈশবই তার চরিত্রনিয়ন্তা ; তবু প্রতিভা অদ্যাবধি কোনো বিজ্ঞানের বশবর্তী হয়নি, তার হেতু অজ্ঞাত, উৎপত্তি যত্রতত্র, তার বিবর্তন তারই ক্রিয়াকলাপ থেকে অনুমেয়। ঈশ্বরের এই একটি সৃষ্টি এখনো এতটাই রহস্যময় আছে যে তার সম্বন্ধে যে-কোনো গণনাই ফেল পড়ে, সংখ্যাতত্ত্ব বা সুজনবিদ্যা, ইতিহাস বা মনোবিজ্ঞান, কোনো শাস্ত্র প্রয়োগ ক'রেই প্রতিভার প্রকৃতিকে নিয়মাবলীর অধীন করা যায় না, তার উৎপাদন তো অসম্ভব। তাই আমি বিশ্বাস করি যে প্রতিভাবানের বাল্যজীবন অনেক সময় রমণীয় উপাখ্যান হ'লেও অধিকাংশ স্থলেই তাৎপর্যহীন ; অর্থাৎ প্রতিভা যখন প্রকাশ পায় তখন থেকেই প্রতিভার আরম্ভ ; আমি বিশ্বাস করি যে প্রতিভাবানের পূর্বপুরুষ, পিতামাতা, আত্মীয় বা বাল্যসঙ্গীতে তাঁর আভাস বা অঙ্কুর বা উপাদান অন্বেষণ করা বিড়ম্বনা ; বিশ্বাস করি যে রবীন্দ্রনাথ বস্তিতে জন্মালেও রবীন্দ্রনাথই হতেন—আকারে-প্রকারে অন্য রকম, কিন্তু ফলত একই। শীতের শেষ-রাত্রে লেপের তলা ছেড়ে ঠাকুর-বাড়ির আর-কোনো ছেলে উঠে যায়নি নারকেল গাছের মাথায় প্রথম রোদের ঝিকিমিকি দেখতে, আবার এমন অনেকে হয়তো গিয়েছে যারা বড়ো হ'য়ে কিছুমাত্র কবি হয়নি। বাল্যে আর বয়ঃসন্ধিতে অনেকেই কবিতা লেখে, তাদের মধ্যে কোনোরকমে কবি-নামের যোগ্য হ'য়ে উঠবে একশোতে কোন-একজন,

তাও যখন নিশ্চত বলা দুরূহ, তখন মহাকবির কোষ্ঠী গুণতে কে বসবে? কার্যত কেউ তা বসেও না; সমালোচকরা ঘটনার ঘোটকে মন্তব্যের শকট জুড়ে দেন, অর্থাৎ যাঁর মহত্ত্ব ইতিমধ্যেই সংশয়াতীত, তাঁরই বাল্যজীবন ও বাল্যরচনা থেকে মহত্ত্বের লক্ষণাবলী উদ্ধার করেন। এ-কাজটি ইচ্ছে করলেই পারা যায়, তাই বোধহয় গবেষকের পক্ষে বালক-রবির আকর্ষণ প্রবল।

অজিতকুমারের সময় থেকে আজ পর্যন্ত যাঁরা রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যাতা, তাঁরা সকলেই তাঁর মর্ত্য রূপের পরিচয় পেয়েছিলেন, কেউ-কেউ ঘনিষ্ঠভাবে। এটা সুবিধে, কিন্তু অসুবিধেও, বোধহয় অসুবিধেই বেশি। তিনি-যে কত বড়ো—শুধু কবিত্বে নয়, ব্যক্তিত্বেও—সে-কথা চেষ্টা ক'রেও ভুলে থাকা বর্তমান কালের লেখকের পক্ষে দুঃসাধ্য, আর এই আনুক্ষণিক মহত্ত্ব-চেতনা জীবনীরচনার বিঘ্ন, সমালোচনায় অন্তরায়।* অন্তত জীবনীতে, যেখানে প্রকৃতিপন্থী উপন্যাসের মতোই নায়কের চরিত্র সৃষ্টি করতে হয়; আগে কিছু ব'লে না-দিয়ে, কিছু ধ'রে না-নিয়ে, একটু-একটু ক'রে প্রত্যয় জন্মাতে হয় পাঠকের মনে, সেখানে আশু ভবিষ্যতে লক্ষ্যভেদের আশা দেখি না। জীবনীরচনাও এক রকমের শিল্পরচনা; জীবনীকারকে নির্মম হ'তে হয়, নির্লোভ হ'তে হয়, ভূরিপরিমাণে উপকরণ সংগ্রহ ক'রে ফেলে দিতে হয় অনেকটাই, বাছাই ক'রে-ক'রে সাজাতে হয় একাধারে সত্য আর সৌষম্যের দিকে লক্ষ্য রেখে; মনে রাখতে হয় ভালো ক'রে বলাই সবচেয়ে বেশি বলা, আর সার কথা মানেই সব কথা। অবশ্য নায়কের

* এটা লক্ষ্যণীয় যে আমাদের রবিচর্চায় সবচেয়ে সুফল ফলেছে এখন পর্যন্ত 'বেল-লেত্‌র'-এর সীমানার মধ্যে; যা জীবনীও নয়, সমালোচনাও নয়, অথচ যাতে দুয়েরই কিছু আভাস কিংবা উপাদান আছে, এ-রকম লেখায় কৃতিত্বের পরিচয় আছে বাংলা ভাষায়। তার কারণ এ-সব ক্ষেত্রে মহত্ত্ববোধ বিঘ্ন হয় না, তাছাড়া প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ লিখতে বিশেষ-কোনো প্রস্তুতিরও প্রয়োজন নেই। রবীন্দ্রনাথের জীবন্ত কোনো মুহূর্ত যেখানে ধরা পড়েছে, কিংবা যে-গ্রন্থ তাঁরই সুবচনের মঞ্জুষা, সেখানে রবীন্দ্রনাথ প্রতিযোগী হ'য়ে দাঁড়ান না, সহকর্মী হন, অনেকাংশে গ্রন্থকর্তা। 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' বা 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ'কে বলা যায় রবীন্দ্রনাথেরই আত্মকথা-পত্রাবলীর ক্রোড়পত্র।

জীবদ্দশায়, কিংবা মৃত্যুর অনতিপরে, এ-আদর্শে জীবনীরচনার সম্ভাবনা বেশি থাকে না; কেননা একজন অমৃতপুত্রকে আমরা তখনই আবার সহজভাবে তাঁর মর্ত্য রূপে ভাবতে পারি, যখন সময়ের ব্যবধানে অনেক অবান্তর সঞ্চয় ঝ'রে পড়ে, আবার সমস্ত তথ্য প্রকাশিত হবারও বাধা থাকে না। রবীন্দ্রনাথকে তাই অপেক্ষা করতে হবে, হয়তো দীর্ঘকাল—অন্তত যতদিন-না 'রবীন্দ্র-জীবনী' পরিবর্ধিত হবার পরেও নতুনতর তথ্য নিয়ে অনুরূপ গ্রন্থ আরো বেরোয়। এই অপেক্ষা ব্যর্থ হবে ভাবতে পারি না, কেননা রবীন্দ্রনাথ যদিও জানাতে ভোলেননি, 'তুমি মোর পাও নাই পরিচয়', তবু উল্টো আশাও তিনিও দিয়ে গেছেন—'একদিন চিনে নেবে তারে'।

১৯৪৭

সাংবাদিকতা, ইতিহাস, সাহিত্য

মানবস্বভাব সীমাহীনরূপে শোধনীয় ব'লে মানবসমাজে প্রগতিমাত্রই আপতিক, কোনো মঙ্গলই অমিশ্র নয়, ভালোর বিশুদ্ধতা, অন্তত ব্যতিক্রম-রূপে, সম্ভব শুধু ব্যক্তির জীবনে, কিন্তু যৌথ-জীবনে তার মিশ্রতাই নিয়ম ; আর যেহেতু সকল মানুষের, এমনকি অনেক মানুষের, বিশুদ্ধ ভালোত্ব এখন পর্যন্ত অচিন্তনীয় প্রস্তাব, তাই মানবসমাজে এমন-কোনো ভালোর উদ্ভব হ'তেই পারে না, কালক্রমে মন্দের মাশুল দিয়ে যার দেনা ডবল শুধতে না হয়। উদাহরণত, সংস্কৃতির উপর মুদ্রাযন্ত্রের ও গণতন্ত্রের প্রভাবের কথা যদি ভাবি ? মাতৃভাষায় বর্ণপরিচয় সকলের পক্ষে আবশ্যিক হবে, এ-ব্যবস্থা কি ভালো নয় ? পাঠ্যবস্তুর দ্রুত, সুলভ ও বহুল প্রচার কি অকাম্য ? নিশ্চয়ই ভালো, নিশ্চয়ই কাম্য।···কিন্তু দুঃখের বিষয়, ফলিত বিজ্ঞান মানুষকে এমন একটা অসহায় অবস্থায় নিয়ে এসেছে যে নিজের ক্ষমতার সীমা সে টানতে পারে না ; কোনো-একটা শক্তি একবার ছাড়া পেলে কোথায় গিয়ে থামবে, এবং পথে-পথে কী কাণ্ড ঘটাবে তা স্বয়ং উদ্‌ভাবকের অজ্ঞাত। আমাদের পুরাণে দেখতে পাই, দারুণ অস্ত্র প্রভুর আজ্ঞায় দুঃসাধ্যসাধনে বেরোলো, এবং ঠিক-ঠিক প্রয়োজনটুকু সম্পন্ন ক'রেই ভালোমানুষের মতো ফিরে এলো তূণে। এই প্রত্যাহরণ বিদ্যাটা আধুনিক মানুষ হারিয়েছে : পুরাকালে, বীরেরা অন্তত উপায়ের কর্তা ছিলেন, এ-যুগে দিগ্বিজয়ীরাও উপায়ের দাস। মুদ্রাযন্ত্র জন্ম দিলো সংবাদপত্রকে, সর্বজনীন প্রথম পাঠ তাকে লালন করলো, তারপর দেখতে-দেখতে তা হ'য়ে উঠলো প্রজাবৃন্দের প্রধান পাঠ, জনগণের একমাত্র মানসিক খাদ্য। বর্তমান পৃথিবীর সাক্ষর জনসংখ্যার প্রায় সকলের পক্ষে প্রতিদিনের প্রথম প্রাতঃকৃত্য হ'লো পত্রিকাপাঠ, অনেকের পক্ষে ত্রিসন্ধ্যার আহ্নিক অনুষ্ঠান ; আর বয়স্কদের মধ্যে এমন ব্যক্তির সংখ্যাও আজ নগণ্য নয়, যাঁরা জীবন কাটিয়ে দেন পত্রিকাদি ছাড়া অন্য কোনো মুদ্রিত বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাতমাত্র না-ক'রে।

বর্তমান জগতে সংবাদপত্রের অপরিহার্যতা স্বতঃসিদ্ধ। পৃথিবী আজ ভৌগোলিক অর্থে এমন সংকুচিত, ঐতিহাসিক অর্থে এমন একীকৃত যে

কোনো-এক দেশে এমন-কিছু প্রায় ঘটতেই পারে না, যার প্রভাব ছড়িয়ে না পড়ে অন্য সব দেশের আশু কিংবা ভবিষ্যৎ সুখদুঃখে। অতএব বিশ্ব-ব্যাপারে দৈনন্দিন অনুসন্ধিৎসা আধুনিক মানুষের পক্ষে অদম্য। পূর্বযুগে দেশে-দেশে, এমনকি জনপদে-জনপদে, ভৌগোলিক ব্যবধান দুরতিক্রম্য ছিলো ব'লে মানুষের কৌতূহলেরও গণ্ডি ছিলো ছোটো, এবং ক্ষেত্রভেদে বিভিন্ন; তখন সংবাদপত্র রচিত হ'তো মানুষের মুখে-মুখে, হাটের কোলাহলে, ঘাটের কলরবে, চণ্ডীমণ্ডপের চর্চায় কিংবা শুঁড়িখানার হল্লায়—এই শেষোক্তেরও বৃত্তান্ত আর এগোতো না নাবিকের উপবাদের পরে। এর বিলুপ্তি, বলা বাহুল্য, নাগরিক সমাজেও এখনো ঘটেনি; আর এই মৌখিক সংবাদপত্র সম্বন্ধে এমার্সনের উক্তি মেনে নিতে কারোরই আপত্তি হবে না যে সংবাদমাত্রেই পরচর্চা, 'all news is gossip'। এমনকি, এর সামাজিক স্বীকৃতি দেখতে পাই এই ভিক্টরীয় প্রবচনে যে ভদ্র-লোকেরা কথা বলেন নানা বিষয়ে, আর ভৃত্যেরা কথা বলে ব্যক্তিদের নিয়ে। কিন্তু যে-খবর ছাপার অক্ষরে ওঠে, তার প্রতি এমার্সনীয় সংজ্ঞাটি আরোপ করতে অনিচ্ছুক হবেন প্রায় সকলেই, যদিও তাতে মিথ্যার পরিবেশন স্নানের ঘাটের বা চায়ের পার্টির পরচর্চার তুলনায় গুরুত্বেও বড়ো, ব্যাপ্তিতেও বহুগুণ বেশি। ইংলণ্ডে অ্যাডিসন যখন প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন, তাঁর প্রতিশ্রুত ও প্রযুক্ত উদ্দেশ্য ছিলো সরসতার দ্বারা নীতির উজ্জীবন, আর নীতির দ্বারা সরসতার সংশোধন; কিন্তু এ-সূত্র গ্রহণ করলে আজকের দিনের বাণিজ্য-সেবক পার্টিপোষিত সংবাদপত্রের অস্তিত্বই দুঃসাধ্য হ'য়ে ওঠে।

আধুনিক সংবাদপত্রের তিনটি অংশ: সংবাদ, মন্তব্য ও বিজ্ঞাপন। তিনটিই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সত্যের অপলাপী। প্রত্যক্ষ অপলাপ ঘটে সংবাদের নির্বাচনে; অর্থাৎ অন্যগুলি বাদ দিয়ে শুধু সে-সব খবর সাজানো হয়, যা বিশেষ-একটি সামাজিক শ্রেণীর কিংবা রাজনৈতিক দল বা উপদলের স্বার্থসাধক। অর্থাৎ, যে-সব তথ্য নির্বাচিত হয়, আর নির্বাচিত হ'য়ে যে-ভাবে তারা পরিবেশিত হয়, তাতেই প্রচ্ছন্ন থাকে অপলাপী মন্তব্য। খবর সাজাবার কৌশলে পাঠকের মন প্রথমে তৈরি করা হলো, তারপর এলো

সম্পাদকীয় মন্তব্য দ্বারা পরোক্ষ অপলাপ ; ফলত লোকচিত্তে সেই তথ্যের অধিকতর বিকৃতি ঘটে, যার উপর নির্ভর ক'রে মানুষ 'সত্য কথাটা' জানতে চায়। এই অপলাপের ব্যতিক্রম সংবাদে ও মন্তব্যে যতটা দেখা যায়, বিজ্ঞাপনে তার চেয়ে অনেক কম ; বিজ্ঞাপনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় অপলাপই অনেক বেশি সক্রিয়, আবেদনেও অনেক বেশি প্রবল। আধুনিক বিজ্ঞাপন চতুর্বিধ : প্রথমত, যেখানে তথ্য আর মীমাংসা দুটোই যথার্থ ; দ্বিতীয়, যেখানে তথ্য ভ্রান্ত কিন্তু মীমাংসা গ্রহণীয় ; তৃতীয়, যেখানে তথ্যে ভুল নেই, কিন্তু মীমাংসা কাল্পনিক ; চতুর্থ, যেখানে তথ্য আর মীমাংসা দুটোই ভ্রান্ত। প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞাপন অত্যল্প, কেননা সেটা সম্ভব শুধু সেই ক্ষেত্রে যেখানে প্রতিযোগিতা অনুপস্থিত বা নগণ্য, কিংবা যেখানে পণ্যবস্তুর নামটা জানানোই যথেষ্ট ; যেমন সংগ্রন্থের বা—পূর্বযুগে—কুইনিনের বিজ্ঞাপন। চতুর্থ শ্রেণীর বিজ্ঞাপনও পরিমাণে অপেক্ষাকৃত অল্প এবং—অন্তত শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে—প্রতিপত্তিতে দুর্বল ; এখন পর্যন্ত এই শ্রেণীটা নিতান্তই যুবকীকরণী ভেষজে আর সন্তাননিবারিকা বটিকায় আবদ্ধ। আধুনিক সংবাদপত্রে প্রচারিত অধিকাংশ বিজ্ঞাপন দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় শ্রেণীর : যেমন, 'রাত্রিকালীন অপুষ্টি' তথ্য-হিশেবে ভ্রান্ত, কিন্তু এই অলীক ব্যাধির প্রতিকাররূপে যে-পানীয়টি প্রচারিত, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে তাতে উপকার হ'তেও পারে ; কিংবা, নিয়মিত স্নান যে স্বাস্থ্যকর এ-তথ্য অকাট্য হ'লেও, সাবান না-মাখলে, তার উপর বিশেষ কোনো-একটি সাবান না-মাখলেই স্নান ব্যর্থ হ'লো, এ-মীমাংসা সাধারণ বুদ্ধিতেই অগ্রাহ্য। অতএব অধিকাংশ বিজ্ঞাপনই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-ভাবে সত্যের অপলাপী ; অথচ প্রত্যেক সংবাদপত্রের একটি প্রধান অংশ ব'লে, এবং কোনো-কোনো পত্রিকার সুপাঠ্যতম অংশ ব'লে, প্রতিপত্তিতে বিজ্ঞাপন আজ সংবাদ ও সম্পাদকীয় স্তম্ভের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। এ-যুগের সাক্ষর জনসাধারণ তার কাজ চালাবার মতো জীবনদর্শন সংবাদপত্র থেকেই সংগ্রহ করে (যেহেতু মোটের উপর সে আর-কিছুই প্রায় পড়ে না), কিছুটা তার 'পাঠ্য বস্তু' থেকে, কিছুটা বিজ্ঞাপন থেকে—বোধহয় বিজ্ঞাপন থেকেই বেশি, কেননা অনেক পত্রিকার 'পাঠ্য বস্তু'ও তাদের প্রতিপালক বিজ্ঞাপনদাতারই

.প্রচারক, অর্থাৎ ছদ্মবেশী বিজ্ঞাপন। এ-অবস্থায়, যতই মন-খারাপ হোক, এ-সিদ্ধান্তে না-এসে তো উপায় দেখি না যে এই অতি-বৈজ্ঞানিক যুগে, জনগণের সমস্ত ধারণা ও অনুমান, অতএব সমস্ত ব্যবহার, অসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

পুরাকালীন মৌখিক সংবাদপত্র এত মারাত্মক নিশ্চয়ই ছিলো না। লোকে পরচর্চা করতো, কিন্তু তাকে পরচর্চা ব'লেই জানতো, পরাবিদ্যা ব'লে ভ্রম করতো না। তাতে বিশ্বাস ছিলো না, শুধু বিনোদন ছিলো। বিশ্বাস সংগ্রহের অন্য ক্ষেত্র ছিলো তখন, ছিলো ভিন্ন-ভিন্ন দেশে নিত্য-ক্রিয়াশীল ভিন্ন-ভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ও আদিকাব্য। আধুনিকের দৃষ্টিতে বাইবেল কিংবা রামায়ণ মহাভারত তথ্যের দিক থেকে যতই অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত হোক, বিজ্ঞানের তৎকালীন অপরিণতির পরিমাপে মানুষের সর্বাঙ্গীণ শিক্ষারই ব্যবস্থা ছিলো তাতে; তাছাড়া, যে-সংশ্লেষণ-শক্তির বা জ্ঞানের সহায় ব্যতীত কোনো বিশেষ জ্ঞান, বিশ্লেষণী জ্ঞান, অর্থাৎ বিজ্ঞান শুভপ্রসূ হ'তে পারে না, এ-সব গ্রন্থ সেই জ্ঞানেরই ভাণ্ডার ব'লে তাতে জীবনের মৌল মূল্যবোধ সম্বন্ধে স্বীকৃতির পরাকাষ্ঠা আজ পর্যন্ত আমাদের বিস্ময় জাগায়। সেকালে মানুষ তার প্রতিদিনের কাজ-চালানো জীবনদর্শন যে-উৎস থেকে সংগ্রহ করতো, সেই উৎসটা অন্তত সত্যাভিমুখী ছিলো, একালে উৎসটাই মিথ্যাশ্রয়ী। প্রভেদটা নিঃসন্দেহে নিদারুণ।

সংবাদ যে মিথ্যা, বিজ্ঞাপন যে ততোধিক, এ-কথা মনে-মনে অনেকেই জানেন, মুখেও মানেন, কিন্তু কার্যত এ-কথা মনে করতে অনেকেই সীমাহীনরূপে অক্ষম যে রটারিযন্ত্রের রটনাও হাটের চ্যাঁচামেচি বা ঘাটের কিচিমিচির মতোই 'গসিপ'। একে তো মুদ্রাক্ষর সম্বন্ধে ছেলেবেলার অন্ধ আস্থা অনেকেই আজীবন কাটিয়ে উঠতে পারেন না, তার উপর আপাত-দর্শনে আধুনিক সংবাদপত্রের তথ্যাবলী এতই প্রামাণিক, তার সংগ্রহে মানুষের উপায়নৈপুণ্য এতই চমকপ্রদ যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনাস্থার অস্থায়ী অপনোদন—যদিও কোলরিজীয় অর্থে নয়—অনিবার্য। বস্তুত, এই তথ্যাবলী অনেক ক্ষেত্রেই অতথ্য নয়, তবু সত্যের অপলাপী; কেননা সংবাদপত্র শুধু জীবনের বিভিন্ন বিভাগের ক্রিয়াকাণ্ডের বিবৃতি দেয়,

কোনো সংশ্লেষণী নীতির দ্বারা ঘটনাবলীকে সুসংবদ্ধ ও অর্থমণ্ডিত করার কোনো চেষ্টাই করে না। রাজনীতি, ঘোড়দৌড়, রঙ্গালয়, বিচারালয়, মৃদু-মধুর পরচর্চা ও বিবিধ বিচিত্র পণ্যপ্রচার—এই সব পরস্পর-বিচ্ছিন্ন বিষয়ের দিন-পঞ্জীতে তথ্যের যাথার্থ্য যদি থাকেও, এই বিচ্ছিন্নতাকে একসূত্রে গাঁথবার মতো কোনো মূলনীতির প্রয়োগ নেই ব'লে তথ্য আর অতথ্য মানুষকে সমপরিমাণেই উদ্‌ভ্রান্ত করে। অর্থাৎ, কোথায় কী ঘটছে তা আমরা কাগজ প'ড়ে জানতে পারি, কিন্তু ঘটনাবলীর তাৎপর্য বুঝতে পারি না, আর সেটা না-বুঝলে আমরা-যে যত জানবো ততই মূঢ় হবো, মানব-জাতির সাম্প্রতিক ইতিহাসই তার তর্কাতীত প্রমাণ। বিজ্ঞান ও দর্শনের গ্রন্থও বিবিধ বিষয়ে তথ্যের আধার; কিন্তু সে-সব তথ্য একটি একাভিমুখী উদ্দেশ্যে, একটি সত্যান্বেষী মূলনীতির দ্বারা সংবদ্ধ ও সংশ্লিষ্ট ব'লে সেখানে তথ্যাবলীর তাৎপর্য এতদূর সুপরিস্ফুট যে অতথ্যও সর্বত্র সত্যনির্ণয়ের অন্তরায় হয় না। যেমন, বস্তুবিশ্ব সম্বন্ধে প্রাচীন দার্শনিকদের অনেক ধারণাই ভ্রান্ত ছিলো, আজ আমরা এ-কথা জেনেছি ব'লে তাঁদের মুখ্য মীমাংসা, তাঁদের সামগ্রিক উপলব্ধি আমাদের কাছে অনর্থক হ'য়ে যায়নি। উদ্দেশ্য সংবাদপত্রেরও আছে, কিন্তু সে-উদ্দেশ্য সত্যান্বেষী নয়, একাভিমুখীও নয়, কেননা তার আশ্রয় দিনানুদৈনিক রাজনীতি, অর্থাৎ আজ-নীতি। আজ-নীতি বলি তাকেই, যার কাছে আজকের মুহূর্তটাই সবচেয়ে প্রধান, কোনো কিছু হয়েছে কিংবা হচ্ছে ব'লেই সেটা ভালো, এই রকম যার ভিতরকার ভাবটা, যাতে বিচার নাই—অর্থাৎ, 'ঘটনা' আর 'সত্য' যার কাছে সমার্থক। সংবাদপত্র-সেবিত মানুষের কাছে নীতি মানেই যেহেতু আজ-নীতি, বর্তমান জগতে এ-ধারণা প্রায় সর্বব্যাপী যে সত্য তথ্যেরই নামান্তর মাত্র, অতএব শিক্ষা মানেই তথ্যসংগ্রহ। সামাজিক মূল্য সবচেয়ে বেশি আজ 'well-informed' মানুষের, অর্থাৎ সবজান্তার। উদারতম শিক্ষাব্যবস্থাতেও কোনো সত্যান্বেষী সংশ্লেষণী নীতির প্রভাব নেই; শুধু খবর, শুধু কতগুলি খবর কুড়োতে পারলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধিলাভ সম্ভব। আমরা যারা সে-সব উপাধি পেয়েছি, কখনো, কোনো উপলক্ষ্যে কোনো শিক্ষকের মুখে এমন পরামর্শের আভাসও আমরা শুনিনি

যে খবর সংবাদ হ'য়ে ওঠে শুধু তখনই যখন তাকে কোনো-এক সমগ্রের অংশ ব'লে উপলব্ধি করি, আর সেই সমগ্র থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিলে যে-কোনো খবরই 'গসিপ' ছাড়া কিছু নয়। কেউ আমাদের বলেননি যে আমাদের শিক্ষার লক্ষ্য ধাতুগত অর্থে সংবাদ, অর্থাৎ আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছি সংবিদ হ'তে, সম্বিৎ জাগাতে, জ্ঞানের অন্বেষণে। দৈনিকপত্রের মতো বিভিন্ন, পরস্পর-বিচ্ছিন্ন, তাৎপর্যহীন খবর কুড়োনোকেই আমরা জেনেছি শিক্ষা ব'লে। যে-সমগ্রের অংশরূপে না-দেখলে সব খবরই 'গসিপ', সেই সমগ্রের অস্তিত্বের কথাও শুনিনি আমরা। তবু আমাদের সময়ে তথ্য-তৃষ্ণা অপেক্ষাকৃত অনুগ্র ছিলো; সাধারণত, সাহিত্যের ছাত্র সাহিত্যের খবরই শুধু রাখতো, আর বিজ্ঞানের ছাত্র বিজ্ঞানের। এই বিষয়-বিভক্ত শিক্ষা জ্ঞানের অন্তরায়, কিন্তু এর চেয়েও বড়ো অন্তরায় অধুনা-প্রবর্তিত তথ্যোন্মাদনা—শুধু ছাত্ররা নয়, অগ্রগামী বয়স্করাও এ-ধারণার বশবর্তী যে যত বেশি তথ্য তাঁরা জানবেন আর তার বিষয় যত বহুল-বিচিত্র হবে, ততই তাঁরা শিক্ষিত হবেন, ততই পাল্লা দিতে পারবেন আধুনিক জীবনের জটিলতার সঙ্গে। এই তথ্যোন্মাদনার পরিচয় পাই রীডর্স ডিজেস্ট ধরনের বটিকাপত্রিকার পৃথিবীব্যাপী পরার্ধ-প্রচারে, আর রাজনীতি, সমাজ-তত্ত্ব, দর্শন ও বিবিধ বিজ্ঞান বিষয়ে গণপাঠ্য গ্রন্থ ও পুস্তিকা-সংখ্যার অফুরন্ত গুণনে। বলা বাহুল্য, এই পত্রিকা ও পুস্তিকারাশি দৈনিক পত্রেরই করিৎকর্মা সহযোগীমাত্র, কেননা স্বল্পপরিসরে, জলবৎ ভাষায় এ-সব বিষয়ে কতগুলি তথ্যই শুধু জানানো যায়, সে-সব তথ্যের সংশ্লেষণ, মূল্যবিচার, তাৎপর্যনির্ণয়, অর্থাৎ তথ্যে নির্ভর ক'রে সত্যের অন্বেষণ, লেখকের অভিপ্রেত এবং শক্তির অধিগম্য হ'লেও (বস্তুত, প্রায়ই তা হয় না) কার্যত সম্ভব হয় না। সাধারণ মানুষের চিন্তার জগতে, তাই, নৈরাজ্য আজ ঘোরতর; কুড়ি বছর আগেকার তুলনায় আজকের দিনের উৎসাহী ছাত্র কিংবা অগ্রগামী মধ্যবয়সী খবর রাখেন ভূরিপরিমাণে বেশি, কিন্তু কোনো-এক সমগ্রের অংশরূপে না-দেখলে সব খবরই যে 'গসিপ' এ-বিষয়ে অচেতনতা আরো ব্যাপ্ত, আর সেই সমগ্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতা আরো নীরন্ধ্র। ফলত, তথ্যের আধিক্যের পরিমাপে আরো ঘনীভূত হচ্ছে প্রমাদ;

তথ্য যত পাচ্ছে, সত্য থেকে তত দূরে স'রে যাচ্ছে মানুষ; বুদ্ধিমানেরাও তাজ্জব সবজান্তার বেশি কিছু হ'তে পারছেন না। আর এই অবস্থাটাই অনেকের মতে প্রগতি, আর-কোনো কারণে নয়, আমাদের জৈব জীবনের বর্তমান ব্যবস্থা এরই অনুকূল ব'লে, আজকের দিনে আর্থিক মূল্য ও সামাজিক মর্যাদা সবজান্তারই সবাধিক ব'লে।

মুদ্রাযন্ত্র ও গণতন্ত্রের ফলে সংবাদপত্রের উত্থান ও প্রতিপত্তি; সংবাদ-পত্রের উত্থান ও প্রতিপত্তির ফলে সাধারণের তথ্যোন্মাদনা, সাধারণের তথ্যোন্মাদনার ফলে সংস্কৃতির অধঃপাত—আমাদের আপতিক প্রগতি বলতে গেলে মাত্র এক শতকের মধ্যে এতদূর নিয়ে এসেছে আমাদের। শেষোক্ত প্রস্তাবের প্রমাণস্বরূপ এখানে এটুকুমাত্র বলবো যে তথ্যোন্মাদনার সংক্রমণ আজ সাহিত্যের ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়। এটা উল্লেখযোগ্য এইজন্য যে সাহিত্য, কল্পনাপ্রবণ সাহিত্য, বিজ্ঞান নয়, অর্থাৎ বিশেষ-কোনো জ্ঞান নয়; সাহিত্য-রচনার জন্য কোনো তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয় না—কিংবা, এমন-কোনো তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয় না, যা সাধারণ মানুষের অনায়ত্ত। বলা বাহুল্য, নতুন কোনো খবর পাবো ব'লে আমরা কবিতা গল্প উপন্যাসাদি পড়ি না, কেননা আমরা সকলেই জানি ওতে যে-সব খবর পাওয়া সম্ভব, তা সাধারণত আমাদের সকলেরই জানা। অবশ্য নতুন খবর আমরা পেতে না পারি তা নয়; যেমন, 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' প'ড়ে আমি জেনেছি যে সেকালের কলকাতার বাবুরা পাড় ছিঁড়ে ঢাকাই ধুতি পরতেন, কিংবা চেহ্‌হ্ব প'ড়ে জেনেছি যে সেকালের রুশদেশে বৃদ্ধ কৃষক-দম্পতী পরস্পরকে সম্বোধন করতো 'মা' এবং 'বাবা' ব'লে। এ-রকম ক্ষেত্রে আমি সাহিত্যপাঠের উপফলস্বরূপ খানিকটা ইতিহাসও জেনে গেলুম; এই ইতিহাসটা, বলা বাহুল্য, সাহিত্যের মধ্যে মুখ্য নয়, গৌণ; প্রাথমিক নয়, প্রাসঙ্গিক; সারবস্তু নয়, শুধু বিস্তারের ক্ষেত্র। সাহিত্যের শরীরে—বিশেষত গল্প উপন্যাস নাটকে—ইতিহাসের অংশ কিছু-না-কিছু থাকেই, কিন্তু সেটা একেবারে বর্জন ক'রেও যে সাহিত্য হয়, শুধু তা-ই নয়, সাহিত্যহিশেবে তার কাজ অতুলনীয়রূপে সম্পন্ন করতে পারে, গীতিকবিতাই তার প্রমাণ। কখনো এমনও হয় যে দেশে কিংবা

কালে দূরবর্তী কোনো লেখকের রচনা আমরা পড়ি—কষ্ট ক'রেও পড়ি—শুদ্ধু সেই দেশের বা কালের জীবন্ত ইতিহাস জানবার জন্য (পৃথিবীর রাশি-রাশি অনুত্তম পদ্য বা গদ্য কাহিনীর সার্থকতা একবার স্বকাল পেরোলে এতেই পর্যবসিত হয়); কিন্তু এ-ক্ষেত্রে আমরা সাহিত্যকে খাটিয়ে নিচ্ছি ইতিহাসের কাজে, সাহিত্য আর সাহিত্য নেই আমাদের কাছে, হ'য়ে উঠেছে ছদ্মবেশী ইতিহাস। সাহিত্যের কাছে সাহিত্যের প্রার্থনা নিয়ে যখন আমরা যাই, সাহিত্যের কাছে সাহিত্যেরই ফল যখন আকাঙ্ক্ষা করি, তখন এই ইতিহাসের অংশটা অবান্তর, বড়ো জোর প্রাসঙ্গিক মাত্র।

অথচ আজকের দিনের অধিকাংশ মানুষের শিক্ষা আর মানসিক অভ্যাস এই রকমের হ'য়ে পড়েছে যাতে সাহিত্যের কাছে সাহিত্যের ফল চাইতে তারা ভুলে যাচ্ছে। দৈনিকপত্র আর বটিকা-পত্রিকার সম্পাদকরা তাঁদের কোটি-কোটি ক্রেতার মনে এই ধারণা-সঞ্চারে কৃতকার্য হয়েছেন যে গুছিয়ে-লেখা খবরকেই বলে 'স্টোরি'। কাহিনীরঞ্জিত তথ্য প'ড়ে-প'ড়ে এমন অভ্যেস তাদের হয়েছে যে তারা যখন খবর-কাগজের শানানো গল্প ছেড়ে বইয়ের পাতার বানানো গল্পে মন দেয়, তখনও প্রত্যাশা করে তথ্যাকীর্ণ কাহিনী। অর্থাৎ, সাহিত্যের কাছে ইতিহাসের ফল চায় তারা। শুধু চায় না, দাবি করে। শুধু-যে বহুল তথ্যাংশ না-থাকলে সে-বই তারা প্রত্যাখ্যান করে, তা নয়; উপরন্তু এ-ইচ্ছাও তারা ঘোষণা করে যে নতুন যত সাহিত্য জন্মাবে সবই হবে আজ-নীতির অনুগত, সমসাময়িক ঘটনাবলীর রং-ফলানো বিবরণ। স্বভাবত এবং ন্যায়ত সাহিত্যের যা কাজ নয়, সাহিত্যের কাছে সেই কাজের দাবি দিনে-দিনে প্রবল হ'য়ে উঠছে, আর সে-দাবি নিয়মিত মিটিয়েও চলেছে পৃথিবীর সমস্ত ভাষায় রাশি-রাশি সাংবাদিক গল্প, সাংবাদিক নাটক এমনকি সাংবাদিক কবিতা। শুধু সাধারণ পাঠকের মধ্যেই নয়, শিক্ষিত সমাজেও অনেকের মনে আজ এ-বিভ্রম জন্মেছে যে সাহিত্য সাংবাদিকতারই নামান্তর কিংবা উচ্চ স্তর, যে সেই লেখাই ভালো যা হালখবরের হালখাতা, আর সেই লেখাই দূষ্য যাতে সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর কোনো উল্লেখ নেই।

সাহিত্যবেশী, কিংবা সাহিত্যের মধ্যে গ্রথিত, সাংবাদিকতা পৃথিবীতে

অবশ্য নূতন নয়, বরং অত্যন্তই প্রাচীন। খবরের কাগজ যখন ছিলো না, তখনও যেহেতু খবর ছিলো, সেই খবর কোনো-না-কোনো উপায়ে লিপিবদ্ধ না-ক'রেও মানুষ পারেনি। আর পুরাকালে উপায়ের বৈচিত্র্য বেশি ছিলো না; ছন্দোবদ্ধ কাব্যই ছিলো প্রধান বাহন, এইজন্য ছন্দোবদ্ধ, যাতে পুঁথির অভাব স্মৃতি দিয়ে পূরণ করা যায়। মহাভারতের কাহিনীর মধ্যে যেমন দর্শন, সমাজনীতি, বিবিধ বিজ্ঞান যথেচ্ছভাবে বিক্ষিপ্ত ও প্রক্ষিপ্ত, তথ্যও তেমনি পর্বতপ্রমাণ; বস্তুত, প্রাচীন ভারতের সর্ববিদ্যার সংগ্রহের নামই মহাভারত। একই গ্রন্থের মধ্যে কাব্য, কাহিনী ও ইতিহাসের, আর সেই সঙ্গে ধর্মতত্ত্ব থেকে অশ্ববিদ্যা পর্যন্ত সর্ববিষয়ে উপদেশের অঙ্গীকরণ আজ আমাদের কাছে অচিন্ত্য; মুদ্রাযন্ত্রের উদ্‌ভাবনার পর থেকে শুধু যে ছন্দোবন্ধনের আবশ্যিকতা ঘুচে গিয়ে গদ্যের প্রসার বেড়েছে তা নয়, সাহিত্যরূপের বিভেদীকরণ এবং বিশেষীকরণও সম্ভব হয়েছে; (দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি তত্ত্ব, তথ্যে যার নির্ভর, সেগুলি সাহিত্যশরীর থেকে চ্যুত হ'য়ে স্বতন্ত্র স্থান ক'রে নিয়েছে, যার ফলে সাহিত্য বলতে আমরা আধুনিক যুগে বুঝি শুধু কল্পনাপ্রবণ রচনা, সংস্কৃত পরিভাষায় রস-সাহিত্য।) বিশেষীকরণ এখানেই থামেনি; রস-সাহিত্যের মধ্যেও ভেদ বেড়েছে, কাহিনী (মোটের উপর) বিচ্ছিন্ন হয়েছে কাব্য থেকে, আর গীতিকাব্য (বহুলত) সংগীত থেকে, আবার কাব্য আর কাহিনী উভয়েই শাখান্বিত হয়েছে ভিন্ন-ভিন্ন আকার ও আকৃতি নিয়ে। কবিতা, ছোটোগল্প, নাটক, উপন্যাস, আধুনিক রস-সাহিত্যের এই সব স্থূল বিভাগের পরেও আরো বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা এনে দিয়েছে প্রবন্ধাদি উপসাহিত্য, ফরাশিরা যাকে বলে রূপ-সাহিত্য। সাহিত্যরূপের এই বৈচিত্র্য আধুনিক জগতের একটি প্রধান ঘটনা।

সাহিত্য আর সাংবাদিকতার ভেদ ভুলে যাওয়া মানেই এই বৈচিত্র্যকে বাতিল করে দেয়া, মুদ্রাযন্ত্রের যথার্থ উপকারিতাকে প্রত্যাখ্যান করা। এই বৈচিত্র্য যে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পেরেছে তার অন্যতম কারণ নিশ্চয়ই মুদ্রাযন্ত্রের প্রয়োগ, আবার সেই মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহারের ফলেই কি বৈচিত্র্যবিলোপের আন্দোলন? সাহিত্যে তথ্য চাই, তারিখমাফিক খবর-সরবরাহ চাই, এই

সূত্রের একমাত্র ন্যায়সম্মত পরিণতি হ'তে পারে সাহিত্য আর ইতিহাসের পুনরঙ্গীকরণে। সেই সঙ্গে যদি মহাভারতের মতো কোনো-একটি সংশ্লেষণী জ্ঞানের প্রভাব থাকতো, থাকতো কোনো সার্বভৌম বিশ্বাসের ভিত্তি, তাহ'লে এর ফলে সাহিত্য অবাস্তবতায় ভারাক্রান্ত আর ইতিহাস সংশয়াচ্ছন্ন হ'লেও কোনো নৈতিক বিকৃতির আশঙ্কা থাকতো না। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় সে-রকম কোনো সম্ভাবনা দেখি না; মানুষের বিশ্বাস আজ সার্বভৌমতা হারিয়ে নানা শিবিরে বিভক্ত, কিংবা তার জীবন্ত কোনো বিশ্বাসই নেই; তাই সাহিত্য-শরীরে ইতিহাসকে গ্রথিত করতে গেলে তার ফল হবে ভিন্ন-ভিন্ন দল বা উপদলের আপন স্বার্থান্বেষী অপলাপ, কিংবা নিতান্তই খবুরে-কাগজে তথ্যপ্রলাপ। হবে কেন, তা-ই হচ্ছে।

সাহিত্যে এই ঐতিহাসিকতার আন্দোলন শুধু যে নীতিবিকারী তা নয়, তদুপরি অনর্থক। অনর্থক এইজন্য যে আন্দোলনের প্রবক্তারা লেখককে দিয়ে যা করিয়ে নিতে চাচ্ছেন, কোনো-এক অর্থে লেখক তা না-ক'রে মোটে পারেনই না। যে-দেশে, যে-সময়ে তিনি বাঁচেন, সেটা তাঁর নিশ্বাসের হাওয়া; তাঁর দেহ যেমন সেই দেশের মাটিতে গড়া, তাঁর মনও তেমনি সেই সময়ের হাওয়ার মধ্যেই ফুটে ওঠে। তাঁর বিষয়বস্তু, তাঁর চিন্তার উপকরণ, তাঁর জীবৎকালের পরিধি থেকেই এ-সব তিনি সংগ্রহ করেন, উপরন্তু, রচনার রূপ ও রীতি, অর্থাৎ তার কলাকৌশলও কালাদিষ্ট। বর্নার্ড শ শেক্সপিয়রের সমসাময়িক হ'লে অমিত্রাক্ষরে ছাড়া নাটক লিখতে জানতেন না, ব্রাউনিং তাঁর সময়কারই ফ্রান্সে জন্মালে খুব সম্ভব হতেন মনস্তত্ত্বঘটিত উপন্যাসে অগ্রণী। কিন্তু তাই ব'লে এমন কথা বলা যায় না যে লেখকরা ইতিহাসের এক-একটি উপসর্গ বা কালতরঙ্গের এক-একটি বিক্ষেপ মাত্র, কেননা উপায় আর উপকরণ জুটলেই সাহিত্য হয় না, ঐ দুই বস্তু অন্বিষ্ট, সুসংবদ্ধ, অর্থময় হ'য়ে উঠে তৃতীয় যে-সত্তাটিকে জন্ম দেয়, তা কোনো দেশ-কালের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। শিল্পীনামযোগ্য লেখকমাত্রেরই মন কিছু পরিমাণে দেশকালাতীত হ'তেই হবে; যাঁর মন যত মুক্ত, তিনিই, শেষ পর্যন্ত, তত বড়ো লেখক। কিপলিঙের ছিলো উপকরণে অগাধ অধিকার, কলাকৌশলে চমকপ্রদ

দক্ষতা, তবু তাঁর মন নিতান্তই দেশে-কালে আবদ্ধ ছিলো ব'লে লেখক হিশেবে তাঁর ক্ষুদ্রত্ব কিছুতেই ঘুচলো না। পক্ষান্তরে, তাঁরই সমসাময়িক ইএটস, যদিও কিপলিঙের তুলনায় উপকরণের পরিধি তাঁর অনেক সংকীর্ণ, কলাকৌশলেও আপাতবৈচিত্র্য ও আপাতরমণীয়তার অভাব, তবু তাঁর দেশকালাতীত মুক্ত মনের অমৃতক্ষরণে তিনি সাহিত্যের ধ্রুবলোকে বৃত হলেন।

কলাকৌশলকেই কলাকৈবল্য ব'লে গ্রহণ ক'রে ইংলণ্ডের 'নব্বুই'-যুগের সমালোচনা যেমন ভুল করেছিলো, তেমনি, বা হয়তো তার চেয়েও মারাত্মক ভুল করছে এ-যুগের এক শ্রেণীর সমালোচনা উপাদানকেই সর্বস্ব ব'লে ভেবে। উপাদানকেই যদি ক'রে তুলি সাহিত্যবিচারের মানদণ্ড, তাহ'লে উদ্‌ভ্রান্তি অনিবার্য হ'য়ে ওঠে : তাহ'লে, অন্তত পরোক্ষে, এ-কথাই বলতে হয় যে মঙ্গলকাব্য যেহেতু ইতিহাসের উপাদানে সমৃদ্ধ, তাই অশরীরী বৈষ্ণব কাব্যের চেয়ে তার সাহিত্যিক মূল্যও বেশি, আর একই কারণে 'সংবাদপ্রভাকর' 'সন্ধ্যাসংগীত' অপেক্ষা গরীয়ান। আবার বলি, সাহিত্যে সমসাময়িকতা চাই, এ নিয়ে আলাদা ক'রে একটা দাবি উত্থাপন করাই বাহুল্য ; আর-কোনো কারণে নয়, লেখক মানুষ ব'লেই সেটা না-হ'য়েই পারে না ; স্মরণীয় ও বরণীয়দের অনেকের মধ্যেই এই সমসাময়িকতার স্বাদ খুব নিবিড়, যদিও কোনো-কোনো ক্ষেত্রে তার আভাসমাত্র পাওয়া যায় না। পোপ বা টেনিসনের স্বকালের স্বাক্ষর তাঁদের রচনার প্রতি পৃষ্ঠায় অঙ্কিত, কিন্তু (ইংরেজি সাহিত্যে ব্লেক যে আঠারো শতকের, আর হপকিন্স যে ভিক্টরীয় যুগের, তাঁদের রচনায় তার প্রমাণ কিছু নেই) কিংবা নামমাত্র আছে। অবশ্য যাঁরা ঘনিষ্ঠরূপে সমসাময়িক তাঁদের মধ্যে আছেন দান্তে, শেক্সপিয়র—এবং রবীন্দ্রনাথ—আর এঁদের উদাহরণ দেখে আমাদের মনে কখনো-কখনো এ-রকম মোহসঞ্চারও সম্ভব যে বড়ো লেখক তাঁকেই বলে, যাঁর লেখায় আপন কালের বিবরণ সুপ্রচুর। কিন্তু আসলে, অমর কবিদের অধ্যয়নের ফলে এই শিক্ষাই আমরা পাই যে সমসাময়িকতা ততক্ষণই গুণ, যতক্ষণ লেখক সেটাকে অতিক্রম করতে পারেন ; আর তারই মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে পড়লে প্রণম্যদেরও

পতন ঘটে। শুদ্ধশীলা শকুন্তলার প্রেমিক-স্বামীরূপে হারেমবিলাসী দুষ্যন্ত আমাদের আধুনিক ধারণায় অসহ্য, কিন্তু কালিদাসের যে কখনোই অসহ্য লাগেনি, সেটুকুই কালিদাসত্বে তাঁর ন্যূনতা। ইহুদি শাইলককে চরম দণ্ড দেবার পরেও শেক্সপিয়রের মনে তার জন্য কোনো বেদনাবোধ নেই, বিধবা বিনোদিনী যখন অপরাধের ভার নিয়ে হ্রস্বকেশে নতশিরে কাশীধামে নির্বাপিত হ'লো, তখন রবীন্দ্রনাথ এতটুকু করুণা করলেন না তাকে। এ-সব ক্ষেত্রে কালিদাস, শেক্সপিয়র, রবীন্দ্রনাথ খর্ব হয়েছেন তাঁদের আপন-আপন সময়ের গণ্ডি, সমাজের নির্দেশ, অতিক্রম করতে পারেননি ব'লেই। সমসাময়িকতাই লক্ষ্য নয়, সেটা পথ, যে-পথ চ'লে গেছে চিরন্তনের দিগন্ত রেখার দিকে, আর সেই পথে যিনি যত অগ্রসর, ততই তিনি মহৎ ব'লে মান্য।

আধুনিক কালের কোনো-কোনো কবিকে দেখতে পাই, যাঁরা সমসাময়িকের রঙ্গালয় থেকে ইচ্ছে ক'রে, এমনকি চেষ্টা ক'রে, কিছুটা দূরে স'রে গিয়েছেন, বেছে নিয়েছেন প্রতীকী পন্থা, আত্মরোপণ করেছেন কোনো পুরাণ বা রূপকথার অখণ্ড উপলব্ধির ভূমিতে। দৃষ্টান্ত আছেন ইএটস, রিলকে, ভালেরি, এ-যুগের শ্রেষ্ঠ তিনজন পশ্চিমী কবি। সমসাময়িক ঘটনার বর্ণনা ছাড়া আধুনিকতার আর-কোনো সংজ্ঞা যাঁরা মানেন না, এঁদের লেখা প'ড়ে তাঁদের হতাশ হ'তে হবে। আর তার উপর সমগ্রভাবে সাহিত্যের দিকে তাকালে, সাহিত্যের নির্লিপ্ততাই বড়ো হ'য়ে চোখে পড়ে, অর্থাৎ, ইতিহাসের বড়ো-বড়ো ঘটনার প্রত্যক্ষ প্রতিফলন অনেক সময়ই দেখা যায় না সেখানে—কিংবা যেখানে দেখা যায় সেখানে শিল্পের মর্যাদারক্ষা হয় না। ইংরেজি সাহিত্য থেকে দুটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করি। ইংলণ্ডে প্লেগের মহামারী আর তৎপরবর্তী কৃষক-বিপ্লব দুটোই ঘটেছিলো চসারের জীবদ্দশায়, কিন্তু এই বহুপ্রসবী প্রতিভাবানের সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে প্লেগের নামগন্ধ নেই, আর কৃষক-বিপ্লবের একটিমাত্র সকৌতুক উল্লেখ আছে। এদিকে তাঁর সমসাময়িক ল্যাংল্যাণ্ডের কাব্য তৎকালীন দুঃখ-দুর্দশার বর্ণনায় পরিপূর্ণ, অর্থাৎ সাম্প্রতিক পরিভাষায় তিনি চসারের চাইতে অনেক বেশি সমাজচেতন, কিন্তু ল্যাংল্যাণ্ডের কাব্য কি তাতে

বাঁচলো ? কার্যত দেখা গেলো, চসারের মধুচক্রেই ইঙ্গজন নিরবধি আনন্দে সুধাপান করলো, আর ল্যাংল্যাণ্ডের স্থান হ'লো পণ্ডিতমহলে, উপাধিপ্রার্থীর ক্লেশকর অধ্যয়নে, ইতিহাসের তথ্যান্বেষীর পরিশ্রমে। তারপর স্প্যানিশ আরমাডার পরাজয়ের মতো এত বড়ো একটা ঘটনাও একটি কবিতারও উপলক্ষ্য হ'লো না, যদিও স্পেনসর আর মার্লো দুজনেই তখন বেঁচে, এলিজাবিথান গীতবিতান কলমুখর, আর ঠিক সেই সময়েই সাহিত্যক্ষেত্রে শেক্সপিয়রের আবির্ভাব। যে-সব লেখক স্বকালের আত্মাকে ধারণ করেন, তাঁরা অনেকেই ঘটনালোকের নেপথ্যবিহারী।

এই শেষের কথাটা অবশ্য রবীন্দ্রনাথের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। ভালেরি বা রিলকের মতো কবি নন তিনি, সমসাময়িকের ঘটনাস্থল থেকে দূরে স'রে যাননি কখনোই, বরং তিনি সর্বত্র এবং সব সময় একটু যেন অধিক পরিমাণেই উপস্থিত। তাঁর জীবৎকালের ইতিহাসের এমন-কোনো তথ্যই বোধহয় নেই, তাঁর রচনাবলীর কোনো-না-কোনো অংশে যার উল্লেখ না আছে। অপঘাতের আশঙ্কা যেমন ছিলো, তেমনি তিনি জন্মেওছিলেন রক্ষাকবচ নিয়ে। সে-কবচ আর-কিছুই নয়; মহাকবিদের সহজাত সংশ্লেষণশক্তি, এই সহজবোধ যে-কোনো-এক সমগ্রের অংশ ক'রে না-দেখলে সব তথ্যই অর্থহীন, খবরমাত্রেই গুজব এবং ইতিহাস মাত্রেই অসার। তাই—দান্তের মতো, বা শেক্সপিয়রের মতো,* তিনিও তাই ইতিহাসকে বানিয়ে ছেড়েছেন সেই করুণ রঙিন পথ, যে-পথে বেরোলে চোখের তারায় অরণ্য-পর্বতের গান শোনা যায়; স্বকালকে অবলম্বন ক'রে ব্যক্ত করেছেন চিরকালকে, স্বদেশের জীবনের মধ্যে প্রকাশ করেছেন বিশ্বজীবন। মহাকবিদের সমসাময়িকতার বৈশিষ্ট্য এইখানে যে সমসাময়িক প্রসঙ্গকে

* অবশ্য অন্য কোনো বিষয়েই দান্তে বা শেক্সপিয়রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা করছি না আমি; ও-দুই কবির সঙ্গে তাঁর প্রভেদ কোথায় এবং কতখানি সে-বিষয়ে আমি সচেতন। এখানে আমার উদ্দেশ্য শুধু এইটুকু বলা যে এই তিনজনেই ঘনিষ্ঠভাবে দেশগত, যুগধর্মী—অথচ তাই ব'লে একটুও প্রাদেশিক নন—আপন-আপন ইতিহাস-ভূগোল অবলম্বন ক'রেই তার সামানা ছাড়িয়ে গেছেন এঁরা, বিশ্বমনের প্রতিভূ হ'য়ে উঠেছেন।

উপলক্ষ্য ক'রে তাঁরা যা বলেন, ভিন্ন দেশে ভিন্ন সময়েও তার সার্থকতা নষ্ট হয় না, যে-কোনো দেশের, যে-কোনো কালের বিশেষ প্রসঙ্গের মধ্যে তা যেন মানিয়ে যায়, ভিন্ন-ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন-ভিন্ন ব্যঞ্জনা তার বিচ্ছুরিত হয়। এইজন্যই তাঁরা স্থায়ী, এইজন্যই যুগে-যুগে বিচিত্র তাঁদের আবেদন।

সমসাময়িক থেকে চিরন্তনে পৌঁছবার দিগন্ত-দীর্ঘ পথে রবীন্দ্রনাথের জয়যাত্রা বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। এ-বিষয়ে তাঁর এমনই স্বাচ্ছন্দ্য ছিলো যে শুধু সমসাময়িককে নয়, সাময়িককেও নিশ্চিন্তে স্থান দিয়েছেন, আর তাতেও বিস্ময়কর রূপান্তর ঘটিয়েছেন। 'সম্রাটের জয়গান রচনার জন্যে' অনুরুদ্ধ হ'য়ে তাঁর মনে 'বিস্ময়ের সঙ্গে উত্তাপেরও সঞ্চার' হ'লো, আর তারই 'প্রবল প্রতিক্রিয়ার ধাক্কায়' লিখে ফেললেন 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটি—'যুগযুগান্তরের মানবভাগ্যরথচালকে'র দেশকালাতীত বন্দনা-গান।* আর 'সংকোচের বিহ্বলতা' তিনি রচনা করেছিলেন শান্তি-নিকেতনের সংকুচিতা ছাত্রীদের জিউ-জুৎসু শিক্ষায় উৎসাহিত করার জন্য। কিন্তু কিসে থেকে কী হ'লো। শুধু বাংলার 'স্বদেশী' উদ্দীপনার যুগেই নয়, আজীবন কত রাষ্ট্রিক আর সামাজিক প্রসঙ্গে, কত বিবাহে, উৎসবের অনুষ্ঠানে, আর কত দিক থেকে কত বিচিত্র অনুরোধ রক্ষার্থে কত কবিতা, কত গান তিনি গেঁথেছেন নিছক সাময়িকতার প্ররোচনায়, শুধুমাত্র কোনো উপলক্ষ্যের ক্ষণিক চাহিদা মেটাতে—কিন্তু তার অধিকাংশই উপলক্ষ্য পেরিয়ে লক্ষ্যে পৌঁচেছে, স্থায়ী হয়েছে সাহিত্যে। প্রণাম করি এই লোকোত্তর প্রতিভাকে, কিন্তু সেই সঙ্গে এও বলি যে তুলনীয় প্রতিভা যেহেতু অন্যদের মধ্যে আশাতীত, সেইজন্য এ-বিষয়ে তাঁকে অনুকরণ করতে যাওয়া মারাত্মক ; ক্ষুদ্রতর কবিদের হাতে উপলক্ষ্যঘটিত কবিতা কী-রকম দাঁড়াতে পারে, তার মন-খারাপ-করা প্রচুর নমুনা সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রেখে গেছেন।

সাময়িক প্রসঙ্গকে, ঘটনাকে, কবিতাদ্বারা চিহ্নিত করার প্রথাটা আসলে প্রাচীনকালের। যেকালে রাজাই ছিলেন কবির ভরণকর্তা,

* রবীন্দ্রনাথের যে-পত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি, সেটি শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনের 'ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত' পুস্তিকায় মুদ্রিত আছে।

সেকালে রাজবাড়ির ক্রিয়াকর্মে শোকে উৎসবে পুরোহিতের মতো কবিরও কিছু করণীয় ছিলো, কিন্তু আজকের দিনের সমাজব্যবস্থায় সে-রকম কোনো কথাই আর ওঠে না। যে-কোনো উপলক্ষ্যে কবিরও ডাক পড়ুক, এমন কি নতুন রঙ্গালয় বা মোদকভাণ্ডারের উদ্বোধনেও, এই সামাজিক স্বীকৃতির ইচ্ছাটুকুতে দোষ নেই, কিন্তু আধুনিক জগতে সেই স্বীকৃতিটা অন্য রকম হওয়াই সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয় মনে করি। ইংলণ্ড আজও অবশ্য একজন রাজকবিকে রেখেছে, বিগ্রহে বিবাহে অভিষেকে তাঁর কাছে কিছু প্রত্যাশাও থাকে; তবে এটুকু সুবুদ্ধিও ইংরেজের হয়েছে যে অ্যালফ্রেড টেনিসনের পরে আর কোনো মুখ্য কবিকে ঐ আসনে তারা বসায়নি। বাংলাদেশের সার্বজনীন রাজকবির যে-পদটি রবীন্দ্রনাথ উত্তরজীবনে পেয়েছিলেন, সেটাও ঠিক কবি ব'লে পাননি, পেয়েছিলেন বিশ্ববিশ্রুত একজন ব্যক্তি ব'লে, এমন একজন ব্যক্তি, যাঁর নামের সঙ্গে যে-কোনোরকম সংশ্রবই একটা বিরাট বিজ্ঞাপন। আশ্চর্য এই যে রবীন্দ্রনাথের কর্ণকুণ্ডল এ-দুর্বিপাকেও তাঁকে রক্ষা করেছে, কেননা যদিও দক্ষিণ কলকাতার দধিকারের প্রশংসাপত্রে তাঁর প্রতিভাও ম্রিয়মাণ হ'য়ে পড়েছে, তবু সিনেমাবিষয়ক গদ্য-কবিতাটিতে চিহ্নিত হয়েছে তাঁর তুলনাহীনতার অন্যতম উদাহরণ।*

'তুলনাহীন' কথাটির বিশেষ একটি তাৎপর্য আছে এখানে। রবীন্দ্র-অভ্যুদয়ের পরে বহুদিন পর্যন্ত রাশি-রাশি প্রাসঙ্গিক কবিতা লিখেছেন প্রত্যেক বাঙালি কবি; তার কোনোটাই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনীয় হ'লো না, কোনো-কোনোটি আজকের দিনে কোনোরকমে পাঠযোগ্য হ'লেও অধিকাংশ ধুলো হ'য়ে গেলো গত চৈত্রের ঝরা পাতার মতোই। পুরীতে গিয়ে সমুদ্র, দারজিলিং গিয়ে হিমালয়, আর আগ্রাতে গিয়ে তাজমহলকে উপলক্ষ্য ক'রে উচ্ছ্বাস, উপরন্তু যে-কোনো ব্যক্তিগত আত্মীয়ের বা প্রখ্যাত

* 'চিররূপের বাণী', 'পুনশ্চ'র পরবর্তী সংস্করণের অন্তর্গত। 'রূপবাণী' প্রেক্ষাগৃহের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে রচিত এই উৎকৃষ্ট কবিতাটি এখনো পাঠকসমাজের তেমন লক্ষ্যগোচর হয়নি।

পুরুষের মৃত্যুতে শোকগাথা—আমাদের ছেলেবেলায় এ-সব ছিলো কবিত্বের নিত্যকর্ম। বড়ো হ'য়ে এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলুম আমরা, অন্তত এ-ধরনের কৃত্রিমতাকে তাড়িয়েছিলুম সাহিত্য থেকে। কিন্তু গত যুদ্ধের বছরগুলি ভ'রে তারই একটি হালফ্যাশনের নতুন নমুনাকে উগ্র হ'য়ে উঠতে দেখা গেলো—এখনো তার অবসান ঘটেছে বলতে পারি না।

বাংলা সাহিত্যের কি তবে প্রাসঙ্গিকতার দিকে, সাংবাদিকতার দিকে স্বাভাবিক একটু প্রবণতাই আছে? না কি এটা রবীন্দ্র-প্রভাবের একটা শোকাবহ বিকৃতি? দুটোই সম্ভব; কিন্তু আরো একটা কারণ এর আছে ব'লে মনে হয়; সেটা এই যে আমরা পরাধীন—মানে, এতদিন ছিলুম। পরাধীন দেশেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূত্রপাত, পরাধীন দেশেই এপর্যন্ত তার পরিণতি। দুর্বল ও দুর্গত দেশে স্বদেশপ্রেমের আবেগপ্রাবল্য অনিবার্য, এবং দুর্বল ও দুর্গত দেশেই স্বদেশপ্রেম সহনীয়। কিপলিঙের সমালোচনা-প্রসঙ্গে এলিয়ট লিখেছেন যে দেশপ্রেম কখনো কবিতার বিষয় হ'তে পারে না। সত্য কথা। ইংলণ্ডের মতো প্রবল সমৃদ্ধ দেশে দেশ-প্রেমের কবিতা মানেই 'রুল ব্রিটানিয়া'র দাম্ভিক চীৎকার কিংবা বড়ো জোর তার কিপলিঙীয় সংস্করণ।* দেশপ্রেমের কবিতা সম্ভব হ'তে পারে শুধু

* এখানে স্মর্তব্য যে কিপলিঙ যেমন খাশ ইংরেজ, ইএটসও তেমনি খাঁটি আইরিশ, কিন্তু এঁদের স্বাদেশিকতার প্রকারভেদেই প্রতিভাব ব্যবধান বোঝা যায়। কিপলিঙের আবেদন তাঁর স্বজাতির মধ্যে, এবং স্বজাতিরও বিশেষ-একটি শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ; তাঁকে ভালোবাসতে হ'লে সাম্রাজ্যবাদে বিশ্বাসী হওয়া চাই, সে-বিশ্বাসে অংশী হ'তে যাঁরা পারেন না এমন ইংরেজ সমালোচকও তাঁর কোনো-কোনো কবিতাকে 'ডিটেসটেবল' আখ্যা দিয়েছেন। পক্ষান্তরে, ইএটস তাঁর স্বদেশপ্রেমের সূত্র ধ'রেই বিশ্বমানসে পৌঁচেছেন, আয়র্লণ্ডকে ক'রে তুলেছেন সৌন্দর্যের, মহিমার প্রতীক; তাঁর 'কাউন্টেস ক্যাথলীন' বা 'ঈস্টর, ১৯১৬' যদিও আইরিশ ইতিহাসের তৎকালীন সংলগ্নতার মধ্যে রচিত, তবু সর্বমানবের নিগূঢ় একটি বেদনাই তাতে ব্যক্ত হয়েছে। সমগ্রভাবে ইএটসকে দেখলে বোঝা যায় যে এই দেশপ্রেমকে তিনি উপায়হিশেবে ব্যবহার করেছেন, আত্মপ্রকাশের, আত্মবিকাশের উপায়; তাঁর কাব্য-সাধনায় ওটি একটি স্তর মাত্র, যে-স্তর ছাড়িয়ে যথাসময়ে তিনি বেড়ে উঠেছিলেন। তেমনি, রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেমও অনতিপরেই তাঁর ভগবৎবোধে, বিশ্ববোধে মিলিত হ'লো, অসহযোগ

দুঃস্থ পরাধীন দেশে, কিংবা স্বাধীন দেশের সংকটের সময়ে; সম্ভব হয়েছে, আয়র্লণ্ডে আর বাংলাদেশে—আর 'প্রতিরোধ' আন্দোলনকালীন ফ্রান্সে। স্বদেশ-বন্দনার পরিমাণ বাংলা সাহিত্যে যত বেশি, আয়তনে অত বৃহত্তর ইংরেজি সাহিত্যে তার অংশ মাত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। জাঁক করবার মতো কিছু নয় এটা, এটা আমাদের দুর্দশারই পরিমাপ। দেশপ্রেমের এক মুঠো উৎকৃষ্ট কবিতা রবীন্দ্রনাথ যদি দিয়ে থাকেন, সেই সঙ্গেই দেশ ছেয়ে গেছে সেন্টিমেণ্টাল বিলাপে-প্রলাপে। পরাধীনতা মানুষকে হীনতাবোধে বিদ্ধ করে, আপ্লুত করে ভাবালুতায়; সে লুব্ধ হয় অতিরঞ্জনে, অতিকথনে, আত্মপ্রদর্শনে, নিজের গৌরব রটনার এতটুকু সুযোগ পেলে সেটাকে তুলোধুনো না-করা পর্যন্ত ছাড়ে না; তখন এমন অদ্ভুত অর্থহীন কথাও তার মুখ দিয়ে বেরোয় যে সর্বজীবের মাতা যে-পৃথিবী, সেই পৃথিবী ধন্য হ'লো তার মাতৃ-ভূমির পদস্পর্শ ক'রে। অবিশ্রাম আমরা খুঁজে বেড়িয়েছি আমাদের বন্ধন-দশার দুঃখপ্রকাশের সুযোগ; ছোটো-বড়ো কোনো উপলক্ষ্যই ব্যবহার করতে ভুলিনি; সম্ভবত সেইজন্যই আমাদের দেশে প্রাসঙ্গিক, সাময়িক, বা সাংবাদিক রচনার পরিমাণ সমগ্র সাহিত্যের পরিমাপে এখনো অত্যধিক। রবীন্দ্রনাথ যখন নোবেল প্রাইজ পেলেন, তৎকালীন সম্ভ্রান্ত জীবিত কবিরা প্রত্যেকে কবিতা লিখেছেন সে-উপলক্ষ্যে—সে তো কবিপ্রশস্তি নয়, ইঙ্গ-শাসিত হ'লেও বঙ্গভূমি যে আসলে কত বড়ো, তারই গৌরব-ঘোষণার কলরব। মনের এই দুর্বলতা অবশ্য মার্জনীয়, কিন্তু রচনার দুর্বলতার তো মার্জনা নেই। আমাদের দুঃখ আমাদের তাড়না ক'রে বেড়িয়েছে চলতি মুহূর্তের ক্ষণিক আবেগ লিপিবদ্ধ করতে; সহজ উত্তেজনায় সহজে কিছু-একটা লিখে ফেলে আমাদের নিজেদের মন হালকা হয়েছে তখনকার মতো—কিন্তু সাহিত্য কি দুঃখপ্রকাশের বাহন, দুঃখলাঘবের উপায়? এইভাবে, পরাধীনতার পরোক্ষ অভিশাপে, এতদিন ধ'রে প্রচুর

আন্দোলন বিশ্ববিমুখ ব'লে তাকে প্রত্যাখ্যান করলেন তিনি। এদিক থেকে ইএটস-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের, এবং আয়র্লণ্ডের 'সেলটিক পুনরুজ্জীবনে'র সঙ্গে বাংলার 'স্বদেশী' আন্দোলনের সুন্দর একটি তুলনা ধরা পড়ে।

অপব্যয় হয়েছে আমাদের সাহিত্যশক্তির ; দুই বিঘা জমি সংক্রান্ত উচ্ছ্বাসে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের স্বর নেমে গেছে।

কিন্তু আর কেন ? আজ তো দেশে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা স্থাপিত হ'লো, আমরা আত্মমর্যাদা ফিরে পেলাম ; আমরা যে খুব বড়ো, খুব ভালো, কিংবা খুব দুঃখী, এ-কথা সকলকে ডেকে চেঁচিয়ে বলবার আবেগের তাড়নাটা অন্তত রইলো না। আর কেন ঘটনার বিবৃতি, রটনার অনুলিখন, উচ্ছ্বাস, সদিচ্ছা, আত্মকরুণা ? চলতি মুহূর্তের ক্ষণিক আবেগকে লিপিবদ্ধ করার কর্তব্য-পরায়ণতা থেকে মুক্তির সময় কি এখনো আসেনি ? এই ক্ষণিক আবেগের উপলক্ষ্য যখন ছিলো পুরীর সমুদ্র কি আত্মীয়ের মৃত্যু, অর্থাৎ ব্যক্তিগত, তখন বিলাপে-প্রলাপে নিরীহতা অন্তত ছিলো, কিন্তু আত্মজীবনের বদলে যাঁরা আজ সমাজ-জীবনের তথ্যানুগামী, ঘটনাপ্রসূত উত্তেজনার বশবর্তী হ'য়ে তাঁরা যা লিখছেন, তা অনেক সময় হ'য়ে উঠছে—শুধু সাহিত্য নিয়ে পরিহাস নয়, মানুষের দুঃখকেও অপমান। বিষয়হিশেবে গণজীবনকে অবলম্বন ক'রেও তাঁরা প্রকাশ করছেন সেই ক্ষণিক, ব্যক্তিগত আবেগের বুদ্বুদ, চলতি মুহূর্তের উত্তেজনা, ব্যক্তিগত ক্রোধ, কি ব্যক্তিগত দুঃখ ; দুঃখটা কখনো-কখনো এত চড়া গলায় এত বেশি ক'রে বলা যে আমাদের মনে প'ড়ে যায় রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক অ-সাহিত্যের উদাহরণ-স্বরূপ উদ্ধৃত 'দুঃখ করো অবধান, দুঃখ করো অবধান, আমানি খাবার গর্ত দেখো বিদ্যমান', কিংবা এমনও মনে হয় এ যেন বাংলা সাহিত্যের একদা-খ্যাত 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে'র শোকোচ্ছ্বাসের আধুনিক প্রকরণ। প্রভেদটা শুধু এই যে উচ্ছ্বাসের উপলক্ষ্য সমুদ্রের বদলে জনতা, মৃতা পত্নীর বদলে লক্ষ-লক্ষ দুর্গত মানুষ। 'শুধু' বললাম, কিন্তু প্রভেদটা এদিক থেকে গুরুতর যে নিতান্ত ব্যক্তিগত বিষয়ে ভাবালুতা শুধু কু-সাহিত্য প্রসব ক'রেই ক্ষান্ত হয়, তার বেশি ক্ষতি করে না ; কিন্তু বিষয় যেখানে দেশব্যাপী ক্ষুধা, বিশ্বব্যাপী হত্যা, সেখানে ভাবালুতায় মানুষের প্রতি যে-অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায়, সেটা মনুষ্যত্বেরই পরিপন্থী।

প্রতিদিনের সংবাদ-জ্ঞাপন, বিবিধ তথ্যপ্রচার, বিক্ষোভ, অভিযোগ ও সদিচ্ছার বিচ্ছুরণ—এর প্রয়োজন আছে আমাদের সামাজিক-সাংসারিক

জীবনে, সে-প্রয়োজন ক্রমবর্ধমান নৈপুণ্যে পূরণ করুক সংবাদপত্র আর সাংবাদিক পত্রিকা ও পুস্তিকাবলী। সাহিত্য আর সাংবাদিকতা যে ভিন্ন, ভিন্ন জগতের, জীবনের বিভিন্ন মহলের অধিবাসী, এ-কথার সক্রিয় স্বীকৃতির সময় এসেছে এখন, সময় এসেছে নিজের ভিতরে ফিরে তাকাবার। বলা বাহুল্য, ঘরের দরজা নি-খিল ক'রে দিলেই নিখিলমিলন ঘটে না, কেননা বিশ্বকে উপলব্ধি করতে হয় নিজের ঘরেই, অর্থাৎ নিজের মনেরই মধ্যে। ঠিক ততটুকুই আমরা উচ্চারণের অধিকারী, যতটুকু আমাদের উপলব্ধি, আর অধিকার অতিক্রম করবার প্রলোভন ত্যাগ করতে-করতেই উপলব্ধির পরিধি বাড়ে। সমসাময়িককে অবলম্বন ক'রে তাকে অতিক্রম করাই শিল্প-কলার লক্ষ্য, কিন্তু চলতি ঘটনার উত্তেজনাকে তখন-তখন প্রকাশ ক'রে ফেলে হাতে-হাতে নগদ বিদায় নিতে গেলে সেটি সম্ভব হয় না। উপলব্ধির জন্য অপেক্ষা করতে হয়, তথ্যকে, ঘটনাকে কোনো-এক সমগ্রের অংশরূপে দেখতে হয়—তবে যদি জেগে ওঠে সেই সুর, যাতে আজকের কথাই চিরকালের কথা হ'য়ে ওঠে। যা-কিছু ঘ'টে যাচ্ছে শিল্পের ক্ষেত্রে তার কোনো মূল্যই নেই যতক্ষণ-না শিল্পীর মন সেটাকে উপার্জন করেছে, সেই মানস-রসায়নের প্রক্রিয়াতেই সত্য ক'রে পাওয়া হয় তাকে, সত্য ক'রে প্রকাশ করা হয়। অপেক্ষার ধৈর্য যাঁর নেই, উপলব্ধির পরিশ্রমে যিনি বিমুখ, যাঁর ক্রিয়াকর্ম পর্যবসিত শুধু ইতিহাসের উপকরণ সঞ্চয়ে, তিনি মূল্যবান সমাজ-সেবক হ'তে পারেন, কিন্তু তিনি যে সাহিত্য-শিল্পী নন, বাংলাদেশে এই সত্যকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিলো যে-আত্মকরুণায় আসক্তি, তার অবসান হোক, চিন্তা মুক্ত হোক, আমাদের সাহিত্য আজ সাবালক হোক।

১৯৪৭

শিল্পীর স্বাধীনতা

আমি শিল্পীর স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। এই কথাটা বলতে আজকের দিনে কিঞ্চিৎ সাহসের প্রয়োজন হয়, কেননা এই বিশ্বাস যাঁরা বিসর্জন দিয়েছেন, দেশে-দেশে তাঁদের সংখ্যা বিবর্ধমান। আমি জানি, 'স্বাধীনতা' কথাটা উচ্চারিত হওয়ামাত্র আপত্তি উঠবে; যে-সব যুক্তি, তর্ক, তথ্য সারে-সারে দাঁড়িয়ে যাবে তাদের সঙ্গেও পরিচয় আছে আমার। সেই যুক্তিগুলোকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথমত, কেউ-কেউ বলবেন যে স্বাধীনতা বস্তুটা পরম নয়, আপেক্ষিক, কোনো-এক অর্থে তার অস্তিত্ব নেই ব'লেই ধরা যায়, কেননা আমরা সকলেই আমাদের শরীরের সীমায় বন্দী, আমাদের সামাজিক অবস্থার মধ্যে আবদ্ধ। দ্বিতীয়ত, এই যান্ত্রিক সমীকরণের যুগে, যখন মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকেও সেপাই-কোর্তার অবিশেষ ছাঁচে ঢালাই ক'রে দেবার চেষ্টা চলছে, যখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে ব্যক্তিবাদ আখ্যা দিয়ে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেবার প্রস্তাব উঠছে প্রবল হ'য়ে, তখন এমন কথা বলবার লোকেরও অভাব হবে না যে স্বাধীনতা—বাঞ্ছনীয় হওয়া দূরে থাক, রীতিমতো ক্ষতিকর, বাধাস্বরূপ; সেটা দমিত হলেই সমগ্রভাবে সমাজের পক্ষে মঙ্গল। আর তৃতীয়ত—যাঁরা এত দূর কবুল করতে রাজি হবেন না, যাঁদের মতে স্বাধীনতা কাম্য, এমনকি সম্ভবপর, তাঁরাও অনেকে বলবেন যে সেটাকে সম্ভব করার জন্যই সাময়িকভাবে বর্জন করতে হবে, অর্থাৎ, তাকে ধ্বংস করার জন্য দিকে-দিকে যে-সব শক্তি আজ উদ্ধত হ'য়ে উঠেছে, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে হবে শিল্পীকেও—তাতে তখনকার মতো তাঁর স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হ'লেও উপায় নেই।

এ-সব মত খণ্ডন করা আমার উদ্দেশ্য নয়; আমার পক্ষে সেটা অপচেষ্টা হবে। আমি সাহিত্যিক, শিল্পকলা শুধু তত্ত্ব নয় আমার কাছে, জীবনের অংশ। সাহিত্যিক হিশেবে আমি যা অনুভব করেছি, বুঝেছি, দিনে-দিনে হাতে-কলমে যেটুকু শিখেছি, সেই অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর ক'রেই দু-চার কথা বলতে চাই। শিল্পীর স্বাধীনতা বলতে আমি কী বুঝি, সেই কথাটাকে প্রথমে স্পষ্ট করা যাক।

বলা বাহুল্য, শিল্পীও মানুষ, এবং অন্যান্য মানুষের মতোই দেহের সীমায়, দেশ-কালের পরিবেশে আবদ্ধ। এ-কথাও সত্য যে তাঁর সমাজের জীবন থেকে, সমসাময়িক ইতিহাস থেকেই তাঁর অভিজ্ঞতার অধিকাংশ তিনি আহরণ ক'রে থাকেন। অর্থাৎ, যেখানে তিনি সকলের সঙ্গে অভিন্ন, সেখানেই তাঁর উপাদানের ভাণ্ডার। কিন্তু তাঁর হাতে প'ড়ে সেই উপাদান যা হ'য়ে ওঠে, তাঁর শিল্পরচনায় যে-অভিজ্ঞতাটি প্রকাশিত হয়, সংক্রমিত হয়, সেটা বিশেষ, সেটা অনন্য, সেটা তাঁরই ব্যক্তিত্ব থেকে সঞ্জাত। তার মানে সেটা 'ব্যক্তিগত' নয়, 'প্রাইভেট' নয়,—তাহ'লে কোনো প্রকাশ হ'তো না, কোনো সংক্রাম সম্ভব হ'তো না অন্যদের মনে।

এই যেগুলো সর্বসাধারণের অভিজ্ঞতা, এগুলো যে হঠাৎ এক জায়গায় এসে বিশেষ হ'য়ে ওঠে, যেন তুলনাহীন, এইটেই শিল্পপ্রক্রিয়ার মূল রহস্য। জীবনের অতি সাধারণ তথ্যের রূপান্তর ঘটে সেখানে, তারা অর্থ পায়, দ্যোতনা পায়, দূরস্পর্শী ইঙ্গিতে আলোকিত হ'য়ে ওঠে। আমরা যখন সাহিত্য পড়ি, তখন আমাদের দৈনন্দিন অস্তিত্বের তথ্যগুলিকেই চিনতে পারি সেখানে—কিন্তু ঠিক সেগুলোকেও নয়। সেই সব তথ্য, যা বাস্তব জীবনে অস্পষ্ট, এলোমেলো, যোগসূত্রহীন, কিংবা অভ্যাসে পরিজীর্ণ, সেগুলোকে যেখানে সুসংবদ্ধ রূপে দেখতে পাই, স্বচ্ছ এবং সম্পূর্ণ ক'রে উপলব্ধি করি, তাকেই আমরা বলি আর্ট, বলি শিল্পকর্ম। এমন প্রবল তার সংঘাত, এমন নিবিড় তার প্রভাব আমাদের মনের উপর, যে হাজার বার জানা কথাটাও নতুন লাগে সেখানে, মনে হয় যেন এ-রকম আর-কিছুই হয়নি, যেন এই প্রথম এটাকে দেখতে পেলাম, চিনতে পারলাম। অর্থাৎ, শিল্পীর যেটা নিজস্ব এবং বিশেষ দৃষ্টি, তার অংশীদার হ'য়ে তবেই আমরা সাধারণকে চিনতে পারি। এই অর্থেই শিল্পী তাঁর স্বজাতির কিংবা বিশ্বমানবের মুখপাত্র।

কিন্তু তথ্যের অভিজ্ঞতা আর উপলব্ধি যুগপৎ সম্ভব নয়, ঘটনাকে সার্থকভাবে প্রকাশ করতে হ'লে ঘটনা থেকে স'রে যেতে হয়। এই মানসিক অপসরণের জন্য শিল্পীর চাই অনাসক্ত দৃষ্টি; মানুষ হিশেবে সাধারণ সুখদুঃখ সকলের সঙ্গে সমানভাবেই তিনি ভোগ করবেন, কিন্তু তিনি যখন

শিল্পী, তখন ঐ মানব-ভাগ্যের অন্তর্গত হ'য়েও তাঁকে দেখতে হবে যেন বাইরে থেকে, বলতে হবে এমনভাবে যেন তিনি অংশভাগী নন, দর্শক, এবং দর্শয়িতা বা সূত্রধর। ঘটনার উতরোল বিশৃঙ্খলায় বিহ্বল হ'লে তাঁর চলবে না; অর্থ বোঝার জন্য, অন্বয়সাধনের জন্য তাঁকে তখনকার মতো হ'তে হবে মনের দিক থেকে আত্মস্থ, আত্ম-সম্পূর্ণ। আর এই স'রে যাবার, স'রে দাঁড়াবার প্রয়োজন থেকেই তাঁর স্বাধীনতার উদ্ভব—শিল্পীর পক্ষে স্বতঃসিদ্ধ সেই স্বরাজ; যতক্ষণ এবং যতটুকু তিনি শিল্পী, ততক্ষণ এবং ততটুকুই স্বতঃসিদ্ধ। তাঁর জীবনের অনেকটা অংশই আকস্মিক; যে-দেশে, যে-সময়ে তিনি জন্মান, যে-সব ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্য দিয়ে তাঁকে যেতে হয়, তার কিছুই বেছে নিতে পারেন না তিনি; অনেক সময় তাঁর জীবিকার উপায় বা জীবনযাপনের রীতির উপরেও তাঁর হাত থাকে না। কিন্তু এই পুঞ্জ-পুঞ্জ অভিজ্ঞতাকে কেমন ক'রে তিনি ব্যবহার করবেন, কতটুকু তার রাখবেন, কতটা ফেলে দেবেন, সেই অসংলগ্ন ভগ্নাংশরাশিকে কোন চিন্তা-সূত্রে গ্রথিত করবেন, কী-রকম আকৃতি, অবয়ব দেবেন তাকে, কী অর্থ তাঁর পাত্রটুকুতে ধরাবেন—এ-সব বিষয়ে তিনিই তাঁর নিজের নিয়ন্তা, তাঁর উপরে কথা বলার কেউ নেই, তাঁর শিল্পের যে-সব শাসনে স্বেচ্ছায় তিনি নিজেকে বাঁধেন, তা ছাড়া আর কোনো শর্তেরই তিনি অধীন নন। মানুষ হিশেবে তাঁর অবস্থা তাঁর আজ্ঞাবহ নয়, ঘটনাচক্র তাঁর ইচ্ছা মেনে চলে না, কিন্তু শিল্পী হিশেবে তাঁর অধিকার অনাহত; তাঁর রচনার রূপ, বিষয়, বক্তব্য, এ-সব বিষয়ে মুক্ত ইচ্ছার প্রয়োগে কোনো বাধা নেই তাঁর, থাকতেই পারে না—যদি তার জন্য সমসাময়িক সমাজের হাতে তাঁকে উপেক্ষিত বা নিপীড়িত হ'তেও হয়, তবু এখানে তাঁর আপন প্রবৃত্তির পরামর্শই চরম। যখন ঐতিহাসিক ঘটনাবলী দুর্দম বেগে ব'য়ে চলে, তখন তাকে যে-কোনোভাবে শাসন করা শিল্পীর পক্ষে অসাধ্য হ'তে পারে; অসংখ্য সাধারণ মানুষের মতো, তিনিও অসহায়ভাবে বন্যার মুখে ভেসে যেতে পারেন। এমনও হ'তে পারে যে অবস্থার চাপ সইতে না-পেরে হেরে গেলেন তিনি, শিল্পকর্মে ইস্তফা দিলেন। কিন্তু তাতে এ-কথা প্রমাণ হ'লো না যে শিল্প যথেষ্ট শক্তিমান নয়; তাতে

বোঝা গেল যে শিল্পীরও মানবিক দুর্বলতা আছে। কথাটা এই যে শিল্পী যতক্ষণ তাঁর নিজের বৃত্তি পালন করেন, ততক্ষণ, যে-কোনো অবস্থায়, তিনিই কর্তা ; তাঁর কর্মের উপাদান এবং রূপায়ণ আদ্যন্ত তাঁর বশবর্তী। অর্থাৎ, শিল্পী হিশেবে তিনি যা-কিছু করেন সেখানে তিনি স্বভাবতই স্বাধীন ; বাইরের দিক থেকে যত কঠোর আবদ্ধতাই থাক, এর কখনো ব্যতিক্রম হ'তে পারে না, কেননা এই স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হওয়া মানেই তাঁর শিল্পী-সত্তার অবসান।

জর্মন কবি রাইনের মারিয়া রিলকের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। শিল্পী যে স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ, এই কথাটাই রিলকে তাঁর 'তরুণ কবিকে লেখা পত্রাবলী'তে বলেছেন, বলেছেন ঠিক সেটুকু অতিরঞ্জন ক'রে, মনের মধ্যে গেঁথে দেবার জন্য অনেক সময়ই যার প্রয়োজন হয়। 'মনে করো তুমি কারাগারে আছো, যার দেয়াল পেরিয়ে পৃথিবীর কোনো শব্দই তোমার চেতনায় পৌঁছয় না—তবু, তবুও কি নিয়ত তোমার শৈশব তোমার সম্পদ হ'য়ে নেই, সেই মূল্যবান, রাজকীয় ঐশ্বর্য, স্মৃতির সেই রত্নভাণ্ডার ?···আর সেই অন্তর্গামিতা, অন্তর্মুখিতা থেকে যদি কোনো কবিতা আসে, তাহ'লে এ-কং. কাউকে জিজ্ঞাসা করার চিন্তা কোরো না সেগুলো ভালো হয়েছে কিনা।···সেই শিল্পকর্ম ই ভালো, যার জন্ম হয়েছে প্রয়োজন থেকে।'

এ-রকম উক্তির আক্ষরিক অর্থ ক'রে একে অসার ব'লে উড়িয়ে দেয়া সহজ। কিন্তু এই ধীর, গম্ভীর কথাগুলির মধ্যে সত্যের যে-কঠিন শাঁসটুকু অ ', তা উপলব্ধি করবেন তাঁরাই, যাঁরা জীবনের যে-কোনো সময়ে নিজের ভিতর থেকে বাইরে কিছু টেনে আনতে চেয়েছেন, চেয়েছেন অঙ্কুরিত হ'তে, সৃষ্টি করতে। যাকে রিলকে বলেছেন 'প্রয়োজন'—যা থেকে শিল্পকলার জন্ম—তার কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে হয় শিল্পীকে, কিছুই হাতে রাখলে চলে না। এই আত্মসমর্পণ সহজ নয়, তার জন্য নিজের মধ্যে স্তব্ধ হ'তে হয়, অতিশয় শান্ত হ'য়ে, ক্ষুদ্র হ'য়ে, প্রতীক্ষা করতে হয় তার। বলতেই হবে, তাই কথা বলেন শিল্পী ; সেটা তাঁর বাধ্যতা ; নিজের কাছে সেই দায়িত্ব এড়িয়ে যাবেন এমন সাধ্য তাঁর নেই। কিন্তু কী তিনি বলতে চান, কী সেই বাণী, যার বীজ জন্মের জন্য

উন্মুখ হ'য়ে আছে তাঁর মধ্যে—সেইটি বুঝতেও ভুল হয় অনেক সময়, নিজেকে জানতেও ভুল হয়। যা আকস্মিক, যা সময়োচিত, তা অনেক সময় উদ্‌ভ্রান্ত করে, কিংবা ঘটনার উত্থান-পতনের কলরোলে অন্তরের মৃদু গুঞ্জন ডুবে যায়। শিল্পীর প্রথম কর্তব্য তাই নিজেকে আবিষ্কার করা, আর তার জন্য নিজের মনের অনেক গভীরে নামতে হয় তাঁকে, পৌঁছতে হয় মাটি খুঁড়ে-খুঁড়ে সেই গহনে, যেখানে পাথর কাদা আবর্জনার স্তূপের ফাঁকে-ফাঁকে স্তরে-স্তরে সঞ্চিত আছে তাঁর সার্থক অভিজ্ঞতা, যেন মূল্যবান ধাতুর আদিম রূপ, অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন হ'য়ে প'ড়ে আছে হাতের স্পর্শে, হাতুড়ির আঘাতে রূপান্তরিত হবার প্রতীক্ষা নিয়ে। আর এই আত্ম-আবিষ্কার, আত্মপ্রকাশের সুদীর্ঘ প্রক্রিয়াটি যতক্ষণ চলতে থাকে—জীবন ভ'রেই চলা উচিত—ততক্ষণ বাইরের কোনো শাসন শিল্পীর উপর প্রযোজ্য নয়, এই কাজেরই যা অন্তর্গত নয় এমন কোনো দাবি তাঁর উপর করা চলবে না; এই দায়িত্ব একাই যথেষ্ট গুরুভার। এই ভাবে, তাঁর কর্মের বাধ্যতাই তাঁকে মুক্তি এনে দেয়, সৃষ্টিকর্মের সুকঠিন শর্ত থেকেই এর উদ্ভব। এই স্বাধীনতা বাইরে থেকে কেউ দান করছে না তাঁকে, বাইরে থেকে কেউ কেড়ে নিতেও পারে না—যদি না তিনি স্বেচ্ছায় সেটি ত্যাগ করতে রাজি হন।

এতক্ষণ যা বলা হ'লো তা থেকে আশা করি এমন কথা কেউ ভাববেন না যে শিল্পীকে তাঁর সাংসারিক কর্তব্য থেকেও ছুটি দিতে চাচ্ছি; চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর স্বারাজ্য বোঝানোই আমার উদ্দেশ্য। আমি বলতে চাই যে শিল্পী স্বভাবতই ব্রাত্য; কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ে ভর্তি হওয়া, কোনো সংঘবদ্ধ মতবাদ গ্রহণ ক'রে সেই মতেই নৈষ্ঠিকতা বাঁচিয়ে চলা—এটা তাঁর প্রকৃতির পক্ষে অনুকূল নয়। অন্য সমস্ত চিন্তার ধারা বর্জন ক'রে তিনি যদি একান্তভাবে একটিমাত্র মতবাদেই দীক্ষা নেন—সে-মতবাদের নিজস্ব মূল্য যা-ই হোক না—তাহ'লে তাঁর দৃষ্টি ব্যাহত হবার, ব্যক্তিত্ব সংকুচিত হবার আশঙ্কা থাকে। তাহ'লে, খুব সম্ভব, তাঁর অভিজ্ঞতাগুলোকে আপন প্রেরণায় সুস্থির এবং সুপক্ব হ'তে না-দিয়ে, তিনি তাদের কেটে-ছেঁটে শাস্ত্রের মাপে মিলিয়ে নিতে চাইবেন। ফলত, তাঁর

বাণীর লক্ষ্য হবে—সমগ্র মানবাত্মা নয়, নির্দিষ্ট একটি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়। শিল্পীর পক্ষে এর মানে বৈকল্য, বা বিকৃতি।

আজকের দিনে পশ্চিমি জগতে দীক্ষাগ্রহণের ,, পড়ে গেছে। সেখানকার অনেক লেখক, মনীষী—তাঁদের মধ্যে কেউ-কেউ অগ্রগণ্য—তাঁরা শিল্পীর জন্মগত অধিকারে আস্থা হারিয়ে কোনো-না-কোনো অনম্য মতবাদের পতাকা নিয়েছেন কাঁধে তুলে। তাঁরা প্রত্যেকেই বিশ্বাস করেন, প্রচার করেন, যে ঐ একটিমাত্র মতবাদ যদি জগৎসুদ্ধু সবাই মেনে নেয়, তাহ'লেই মানুষের ত্রাণ হ'তে পারে। এই যেটা এতকাল ছিলো ধর্মযাজকের মনোভাব, আজ সেটা সাহিত্যেও উগ্র হ'য়ে উঠেছে। সমসাময়িক পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের একটা লক্ষণ এই যে তার অনেকটা অংশই ধর্মযুদ্ধের ভেরীনির্ঘোষ; অর্থাৎ তার পরিচয় যেন নিজের মধ্যে বিধৃত হ'য়ে নেই, কোনো-কিছুর পক্ষ নিয়ে, বা অন্য কিছুর বিপক্ষে দাঁড়িয়ে, তবেই তা সম্ভব হ'তে পেরেছে। দেখা যাচ্ছে আটলান্টিকের দুই তটে ভিন্ন-ভিন্ন শিবির পড়েছে লেখকদের, কেউ-কেউ মার্ক্সবাদে প্রতিশ্রুত—কিংবা তার কোনো-না-কোনো প্রকরণে, সনাতন ক্যাথলিক ধর্মের শরণ নিয়েছেন কেউ-কেউ, আর কেউ হয়তো নতুনতর মার্কিন মন্ত্র জপাতে চাচ্ছেন ' টাকে। এঁরা পরস্পরের বিরোধী, কিন্তু এই বিরোধিতার মধ্যেই একটা জায়গায় সাদৃশ্য আছে এঁদের, যারা সহযাত্রী নয় তারা যে সকলেই পতিত, আর সেই পতিতদের দীক্ষা দিয়ে উদ্ধার করাই চাই, এই প্রত্যয় এঁদের সকলের মনেই দুর্মর। এতে কখনো-কখনো তীব্রতা আসে রচনায়, যেন সৈনিকের সঙিনের ধার, কিন্তু সেই সঙ্গে সীমাবদ্ধতাও দেখা দেয়, একটি বই রং ধরে না, প'ড়ে মনে হয়—অন্তত অদীক্ষিত পাঠকের মনে হয়—যে লেখকের মন একটিমাত্র সংকীর্ণ পথেই চলতে জানে, এই বিশাল বিচিত্র মানবজীবনের যে-কোনো প্রসঙ্গ, যে-কোনো সূত্রকে তাঁর মতবাদের চৌহদ্দির মধ্যে যে ক'রে হোক টেনে আনাই যেন তাঁর প্রতিজ্ঞা।

এই ভাবটা ভারতবর্ষীয় চিন্তাধারায় কখনো স্থান পায়নি। ভারতীয় কবির যেটা আবহমান বৃত্তি, সেখানে তিনি মুক্ত মনেরই প্রতিভূ; কোনো সাম্প্রদায়িক উপবীত তিনি ধারণ করেন না, কিছুই প্রত্যাখ্যান করেন না,

আবার কোনো-কিছুই চূড়ান্ত ব'লে গ্রহণ করেন না, মনের সবগুলো দরজা-জানলা খোলা রাখেন যে-কোনো দিক থেকে আলো আসার জন্য। এর ব্যতিক্রম নেই তা বলি না, কিন্তু ভারতীয় কবি বলতে যে-ছবিটা আমাদের মনে জাগে সেটা শুদ্ধাচারী মঠবাসীর নয়, খোলা হাওয়ায় ধুলোর পথে চলা পথিকের। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম, এবং আরো যে-সব লৌকিক ধারা এই দেশেরই মাটিতে জন্মেছিলো, তাদের পাশাপাশি মেলামেশির পরিচয় আমাদের পুরোনো সাহিত্যে গ্রথিত হ'য়ে আছে; আছেন, তাঁর সময়কার লক্ষণসম্পন্ন কবির, যিনি না-হিন্দু না-মুসলিম, কিংবা একাধারে দু-ই। আর আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথ, এই সমন্বয়ধর্মী ভারতীয় মনেরই ভাস্বর ব্যঞ্জনা তিনি। রাষ্ট্রে, ধর্মে, সমাজে, তাঁর জীবৎকালে যত আন্দোলন এ-দেশে জেগে উঠেছিলো, তার প্রায় প্রত্যেকটিতে সাড়া দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাকে ফলিয়ে তুলেছিলেন সাহিত্যে, কখনো-কখনো প্রত্যক্ষ-ভাবেও অংশ নিয়েছিলেন;—কিন্তু কদাচ কোনো সংঘভুক্ত হননি, কোনো পুরোহিতের আনুগত্য স্বীকার করেননি, তাঁকে বাঁধতে পারে এমন বাঁধন কারো হাতেই তৈরি হ'লো না। তাই তিনি হিন্দুয়ানির নিন্দাভাজন হয়েছেন, আবার গোঁড়া ব্রাহ্মেরও মনঃপূত হ'তে পারেননি, এবং কোনো রাষ্ট্রনেতার থলির মধ্যেও তাঁকে ধরানো গেলো না কোনোদিন। যে-কথাটা আজ পশ্চিমি দেশে প্রবল হ'য়ে উঠেছে, যে মানুষের সামনে একটি ভিন্ন দ্বিতীয় পথ নেই, এটা আমাদের কানে অদ্ভুত শোনায়, এটা আমাদের ইতিহ-চেতনার বহির্ভূত। এই অনন্যবাদ বিশেষভাবে পাশ্চাত্য, এবং পাশ্চাত্য জগতে নতুন কিছুও নয়, কেননা বহুযুগ ধ'রে এই ধারণা সেখানে বদ্ধমূল যে যীশু মানুষের এ ক মা ত্র ত্রাতা। কিন্তু ঐ 'একমাত্র' কথাটা ভারতীয় মন কখনো মানতে পারেনি; 'মামেকং শরণং ব্রজ' সত্ত্বেও হিন্দুর পক্ষে কোনো বিশ্বাসই আবশ্যিক নয়, ভগবানে বিশ্বাস পর্যন্ত না;—নানা নামে তিনি এক, এই হ'লো ভারতবর্ষীয় কথা;—'মুক্তি নানা মূর্তি ধরি দেখা দিতে আসে জনে-জনে, এক পন্থা নহে।'*

* আমরা অবাক হই, যখন আজকের দিনেও টি. এস. এলিয়টের মতো মনীষী

এই ঐতিহ্য, যাকে রবীন্দ্রনাথ আরো অনেক সমৃদ্ধ ক'রে রেখে গেছেন, তার শক্তি ইতিমধ্যেই ক্ষ'য়ে গেছে এমন কোনো প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি। তবে সম্প্রতি একে অস্বীকার করার উদ্যম চলেছে দেশের মধ্যে ; আমাদের দেশেও সংঘে যোগ দিচ্ছেন লেখকরা, সম্প্রদায়ের সংলগ্ন হচ্ছেন, আপ্তবাক্যের চশমা প'রে জগৎটার দিকে তাকিয়ে দেখছেন। এই শঙ্কিল, বিশৃঙ্খল সময়ে, যখন ক্রান্তিকালের ঝোড়ো হাওয়ায় জীবনের দড়িদড়া প্রায় ছিঁড়ে যাচ্ছে, তখন এই রকম কোনো মতবাদের দেয়াল-ঘেরা কেল্লার মধ্যে আশ্রয় পাওয়া যায় সে-কথা সত্য, হয়তো কোনো-এক রকমের নিশ্চিতি জোটে। কিন্তু সে-নিশ্চিতি কতটুকু পুষ্টি দিতে পারবে মানুষকে, যার জন্য মূল্য দিতে হয় তার চিন্তার স্বাধীনতা, তার চিত্তের স্বতঃস্ফূর্তি ? বিশেষত, জীবনের মূল্যবোধ যখন বিপর্যস্ত, তখন তাকে বাঁচিয়ে রাখা, জাগিয়ে তোলাই তো শিল্পীর কর্তব্য—সেই সব বড়ো-বড়ো পুরোনো মূল্য, যা মানবসভ্যতার সমবয়সী ব'লেই কোনোদিন পুরোনো হয় না, মানুষের সকল শুভকর্মের যা উৎপত্তিস্থল। শিল্পী যদি একান্তভাবে গোষ্ঠিগত হ'য়ে পড়েন, যদি তাঁর নিজেরই দৃষ্টি খণ্ডিত হয়, তাহ'লে জীবনের অবিকল চেতনা কেমন ক'রে আশা করবো তাঁর কাছে ? যাকে শিল্পী বলি, তাঁর বুদ্ধি পূর্ণজাগ্রত, সংবেদনশীলতা চরম ; জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে অবিরলভাবে বেড়ে ওঠেন তিনি, কোনো-একটা জায়গায় এসে আটকে যান না। তাঁর জিজ্ঞাসা সর্বগ, তাঁর এষণা স্বাধীনভাবে ধাবিত হয় সকল

অখৃস্টানদের 'হীদেন' আখ্যা দিয়ে তাদের জন্য করুণা প্রকাশ করেন, কিংবা কোটি-কোটি 'পতিত' মানুষে অধিবাসিত বিশাল এশিয়ার দিকে তাকিয়ে পল ক্লোদেলের নৈষ্ঠিক হৃদয়ে পবিত্র রোষাগ্নি জ্ব'লে ওঠে। আমরা অবাক হই, বিব্রত বোধ করি। পক্ষান্তরে গীতার উপদেশ অনন্যবাদের ঘোষণারূপে গ্রাহ্য নয় ; 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ, এ-কথা বলাও যা আর স্বধর্ম রক্ষা ক'রে মামেকং শরণং ব্রজ এ-কথা বলাও' তা-ই, প্রমথ চৌধুরীর এই ব্যাখ্যায় ভারতীয় ঐতিহ্যের সমর্থন আছে। 'পাঠান-বৈষ্ণব রাজকুমার বিজুলি খাঁ' প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী দেখিয়েছেন যে ভারতীয় মধ্যযুগে 'ভগবদ্‌ভক্ত ও বৈষ্ণব এ-দুটি পর্যায়-শব্দ ছিল, সুতরাং ব্রাহ্মণের মত পাঠানও স্বধর্ম রক্ষা ক'রেও পরমবৈষ্ণব অর্থাৎ পরম-ভাগবত হ'তে পারত।' ঐ স্বধর্মরক্ষার কথাটা শিল্পীর পক্ষে পরম উপদেশ।

ক্ষেত্রে, আপন প্রকৃতির দাবি অনুসারে চারদিক থেকে তিনি শোষণ ক'রে নেন যেটুকু তাঁর বিকাশের পক্ষে প্রয়োজন। শিল্পীর মন বহুরূপী, তার গতিবিধি অনির্ণেয়, তার ক্রিয়াকর্ম বিষয়ে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। এই মনের উদাহরণ আছেন রবীন্দ্রনাথ, কিংবা গ্যেটে—যাঁকে বলা হয়েছে একাধারে ক্যাথলিক আর প্রটেস্টান্ট, জর্মন এবং লাটিন চরিত্রের প্রতিনিধি, একাধারে রেনেসাঁসের সন্তান এবং মার্টিন লুথরের উত্তরসাধক। এই রকম মন সব বিরোধ ভঞ্জন করে, সব বিপরীতকে মিলিয়ে নেয় নিজের মধ্যে; সেটাই তার পূর্ণতালাভের প্রক্রিয়া। বলা বাহুল্য, এই আদর্শে পৌঁছনো দুরূহ, কিন্তু দুরূহ ব'লেই এটা অনুসরণযোগ্য, সাধনযোগ্য। আদর্শের সঙ্গে সাধ্যের ব্যবধান থেকেই কঠিনতর প্রচেষ্টার প্রেরণা আসে, কিন্তু আদর্শটাকেই নামিয়ে দিলে সিদ্ধির কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

১৯৫২